মানুষের ইতিহাস

নূরুন নাহার বেগম
আবদুল হালিম

মধ্য যুগ

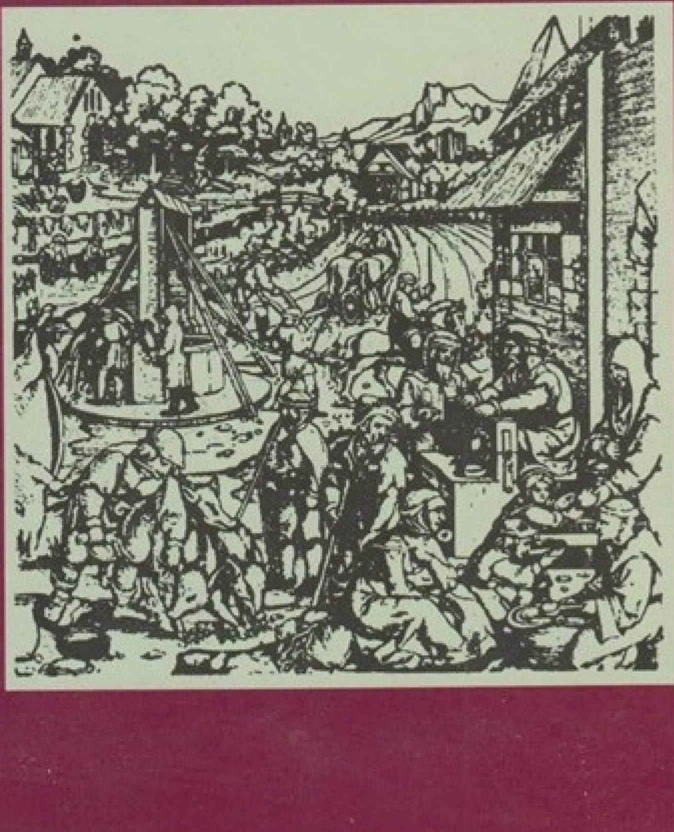

মানুষের ইতিহাস: মধ্য যুগ গ্রন্থে ইউরোপে বর্বরদের অভিযান, জার্মানদের ধর্ম, পরিবার, রাজনৈতিক সংগঠন, সমাজ ও অর্থনীতি, জার্মান জাতির মহাঅভিযান ও প্রাথমিক ফলাফল আলোচিত হবার পাশাপাশি জার্মানদের রাজ্য স্থাপন, গথ জাতির ইতিহাস, ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। খৃস্টধর্মের আবির্ভাব, পোপতন্ত্রের উৎপত্তি, সন্যাস বা মঠতন্ত্র, ফ্রাঙ্কদের পরবর্তী ইতিহাস, জার্মান জাতির অবদান, নর্ম্যান জাতির অবদানও আলোচিত হয়েছে। সামন্ত প্রথার উৎপত্তির কারণ, সামন্ত যুগে কৃষকদের অবস্থা, সামন্ত অর্থনীতির রূপ ও সামন্ত প্রথায় চার্চের ভূমিকা বিষয়ও আলোচিত। সম্রাট ও পোপের সংঘর্ষ ও পরিণত সামন্ততন্ত্রের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ক্রুসেড ও সামন্ততন্ত্রের অবস্থায় : ইউরোপে কৃষক বিদ্রোহ, রাজশক্তির উদ্ভব, শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের কথাও সামন্ত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকও সমানভাবে আলোচিত।
মধ্যযুগের সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা, বাণিজ্য : হেনসিয়াটিক লীগ, বাণিজ্যপথ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। বাইজেন্টাইন সভ্যতা বিকাশের কারণ, অবদান ও স্লাভ জাতির ইতিহাস এবং মধ্যযুগের রাশিয়ার ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে। মধ্যযুগের চীনের ইতিহাস : বিভিন্ন রাজবংশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, মঙ্গোল ও ইসলামের ইতিহাস সুনিপুণ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্বে গুপ্ত, হুন, সৌরাষ্ট্র, মৌখরী মালব, বাকাটক ও মন্দাশোর বংশ ও রাজ্যসমূহের চিত্র, বাংলার গৌড় রাজ্য, ধনেশ্বর রাজ্য : হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য এবং বাংলার পাল সাম্রাজ্য বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।
বাংলাদেশের সেন-রাজাদের শাসন, দাক্ষিনাত্যের ইতিহাস, সুদূর দাক্ষিনাত্যের তামিল রাজ্যসমূহের ইতিহাসও আলোচিত। ভারতে মুসলিম শাসন, মুসলমানদের ভারত জয়, তুর্কো আফগান সুলতানদের শাসনব্যবস্থাও আলোচিত। তৈমুর লং এর ভারত আক্রমণ, ভারতবর্ষে মোগল শাসন, অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন এবং মধ্যযুগের অবসান কিভাবে হলো সে-বিষয়ে অনুপুঙ্ক আলোচনা বিধৃত।

ISBN 984 401 451 4

www.pathagar.com

মানুষের ইতিহাস

মধ্যযুগ

[৪৭৬-১৪৫৩]

নূরুন নাহার বেগম
আবদুল হালিম

আগামী প্রকাশনী

www.pathagar.com

ষষ্ঠ সংস্করণ আষাঢ় ১৪২০ জুলাই ২০১৩

প্রথম অখণ্ড সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯৮ এপ্রিল ১৯৯১
দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০৫ আগস্ট ১৯৯৮
তৃতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০৯ আগস্ট ২০০২
চতুর্থ সংস্করণ কার্তিক ১৪১২ নভেম্বর ২০০৫
পঞ্চম সংস্করণ আষাঢ় জুলাই ২০০৭

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ আবদুল মুকতাদির

মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

MANUSHER ITIHAS: Madhya Joog: (A History of Manking: Medieval Period) by Nurun Nahar Begum & abdul Halim.

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Phone: 711-1332, 711-0021
e-mail: info@agameeprakashani-bd.com

Sixth Edition: July 2013

Price: Taka 200.00 only.

ISBN 978 984 401 451 0

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আজীবন সত্যের সন্ধানী,
বহু ভাষাবিদ ও জ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক,
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ,
মানব ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধানী,
প্রখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'ক্রুসেড ও জেহাদ'-এর প্রণেতা
মরহুম মৌলবী দীন মহম্মদ (১৮৫৩—১৯১৬ খৃঃ)-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

www.pathagar.com

প্রচ্ছদ-চিত্র পরিচিতি

প্রচ্ছদে ছাপা চিত্রটিতে মধ্যযুগের ইউরোপের গ্রামীণ জীবনের ছবি দেখানো হয়েছে। ছবিতে হালচাষ, গম ভাঙানো প্রভৃতি কাজের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, নিচে ডান দিকে দু'জন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী দরিদ্রের মধ্যে রুটি ও ঝোল বিতরণ করছেন। এ চিত্রটি মধ্যযুগের একজন ইউরোপীয় শিল্পীর আঁকা ছবির প্রতিকৃতি। শিল্পী এখানে একটি ছবির মধ্যেই গ্রামীণ জীবনের সমগ্র কার্যকলাপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। এ-ধরনের সমসাময়িক চিত্র থেকে ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগের ইউরোপের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন।

লেখক-লেখিকার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ

১। মানুষের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ—আবদুল হালিম ও নূরুন নাহার বেগম।

২। মানুষের ইতিহাস : মধ্যযুগ—নূরুন নাহার বেগম ও আবদুল হালিম

৩। মানুষের ইতিহাস : আধুনিক যুগ (১৭৮৯-১৯১৯)—নূরুন নাহার বেগম

৪। ইতিহাসের রূপরেখা—আবদুল হালিম

৫। পৃথিবীর ইতিহাস—আবদুল হালিম

৬। মায়া আজটেক ইনকা সভ্যতা—আবদুল হালিম

৭। মেসোপটেমীয় সভ্যতা—নূরুন নাহার বেগম

৮। Ancient Indian History in a New Light—আবদুল হালিম

৯। Introducing a New Theory of History—আবদুল হালিম

১০। নতুন দৃষ্টিতে ইতিহাস—আবদুল হালিম

www.pathagar.com

মধ্যযুগের একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী বই দেখে হাতে লিখে নকল করছেন। এভাবে সন্ন্যাসীরা অনেক মূল্যবান বই নকল করে মধ্যযুগে প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারকে রক্ষা করেছেন।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের ইউরোপে জমিদারদের জন্য পশুপাখি শিকার ও মাছ ধরার দৃশ্য।

তীর ধনুক, বল্লম ও তলোয়ার সজ্জিত নাইটদের যুদ্ধ যাত্রার দৃশ্য। এঁরা যাচ্ছেন ক্রুসেডে যোগ দিতে।

www.pathagar.com

বর্ধিত নতুন সংস্করণের ভূমিকা

'মানুষের ইতিহাস : মধ্যযুগ (প্রথম অংশ)' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে শুধুমাত্র ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস বিবৃত হয়েছিল। আশা ছিল, দ্বিতীয় অংশে মধ্যযুগের এশিয়ার ইতিহাস প্রদত্ত হবে। পরিবর্ধিত পরিকল্পনা অনুসারে নতুন সংস্করণে মধ্যযুগের সামগ্রিক ইতিহাস একখণ্ডে প্রকাশিত হল।

বর্তমান পরিবর্ধিত সংস্করণে মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসের পাশাপাশি এশিয়ার মধ্যযুগের ইতিহাসও লেখা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে এশিয়ার ইতিহাস অংশে ভারতবর্ষ, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের মধ্যযুগের ইতিহাস, মঙ্গোল জাতি, সেলজুক তুর্কি ও অটোমান তুর্কিদের ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাস সংযোজিত হয়েছে।

মানুষের ইতিহাসের মধ্যযুগের প্রথম অংশের একক রচয়িতা ছিলেন নূরুন নাহার বেগম। বর্তমান পরিবর্ধিত ও অখণ্ড গ্রন্থটির প্রণেতা দুইজন। বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত 'ইউরোপীয় অংশের ইতিহাস সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ, অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন' এবং 'মধ্যযুগের অবসান' শীর্ষক অধ্যায়গুলো লিখেছেন নূরুন নাহার বেগম। আর স্লাভ জাতির ইতিহাস, রাশিয়ার ইতিহাস, চীনের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও মঙ্গোল জতির ইতিহাস সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো লিখেছেন আবদুল হালিম।

'মানুষের ইতিহাস : মধ্যযুগ : প্রথম অংশ' গ্রন্থটিকে উৎসর্গ করা হয়েছিল ঐ গ্রন্থের লেখিকা নূরুন নাহার বেগমের পিতামহ এবং প্রখ্যাত মানব হিতৈষী ও লেখক মরহুম মৌলবী দীন মহম্মদ-এর স্মৃতির উদ্দেশে। বর্তমান অখণ্ড গ্রন্থটিও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশেই উৎসর্গ হল।

এপ্রিল ১৯৯১

আবদুল হালিম
নূরুন নাহার বেগম

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মানুষের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ) প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ছয় বছর আগে। নানা কারণে এ-গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ড প্রকাশে বিলম্ব ঘটল। পরিকল্পনা ছিল দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যযুগের পৃথিবীর ইতিহাস বিবৃত করা হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশরূপে শুধুমাত্র মধ্যযুগের ইউরোপের ধারাবাহিক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরা হল। ইউরোপ ব্যতীত অবশিষ্ট পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যযুগের ইতিহাস 'মানুষের ইতিহাস'-এর পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশিত হবে। 'মানুষের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডের রচনায় বর্তমান লেখিকার সাথে অধ্যাপক আবদুল হালিমও যুগ্ম লেখক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান খণ্ডটি শুধুমাত্র আমার রচনা হলেও এটি প্রথম খণ্ডেরই অনুসৃতি।

'মানুষের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ' গ্রন্থে ইউরোপে রোমান সভ্যতার অবসানকাল পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে। রোমান সভ্যতার অবসানের সাথে সাথে প্রাচীন দাসভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থারও অবসান ঘটে। তার স্থলে উদিত হল স্বতন্ত্র আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা। এ নতুন ব্যবস্থার নাম সামন্ত ব্যবস্থা। প্রাচীন যুগের সমাপ্তিতে যে যুগের সূচনা হল আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরা তার নামকরণ করেছেন 'মধ্যযুগ'। মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক যুগের শুরু। ইতিহাসের এই যুগ বিভাজন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। কখন প্রাচীন যুগের অবসান ঘটল এবং মধ্যযুগের সূচনা হল, আবার কোথায় এবং কোন সময় থেকে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে আধুনিক যুগের যাত্রাপথ তৈরি হল, এ নিয়ে বিতর্কের মীমাংসা এখনও হয় নি। আমরা সেই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের সাথে একমত হয়ে ৪৭৬ সালকেই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কাল হিসেবে ধরে নিয়েছি। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে পুরো পশ্চিম ইউরোপ বর্বর জার্মান জাতিদের দ্বারা অধিকৃত হল। শুধুমাত্র রোমের সিংহাসনে একজন সম্রাট তখনও টিকে রইলেন। ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে বর্বরদেরই এক শাখা ভ্যান্ডালদের নেতা অডোএকার রোমের শেষ সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টাসকে সরিয়ে দিয়ে রোমের সিংহাসন দখল করে নিল। রোম সাম্রাজ্যের অবসান প্রকৃতপক্ষে আগেই ঘটেছিল, এখন শেষ চিহ্নটুকুও অবলুপ্ত হল। শুধুমাত্র পূর্বদিকে কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে টিকে রইল পূর্বরোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নামে রোমান সাম্রাজ্য হলেও প্রকৃত পক্ষে গ্রিক সভ্যতার সর্বশেষ ঐতিহ্যটুকু ধারণ করেই এ সাম্রাজ্য ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

www.pathagar.com

এদিকে বর্বরদের দ্বারা অধিকৃত পশ্চিম ইউরোপ নিমজ্জিত হল গাঢ় অন্ধকারে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ যুগের নাম দিয়েছেন 'তমসার যুগ' বা 'অন্ধকার যুগ'। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। বর্বরদের আক্রমণে রোমানদের সৃষ্ট নগরসমূহ এবং সেই সাথে রোমান কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। গ্রিক ও রোমান ঐতিহ্যের সকল চিহ্ন অবলুপ্ত হল। বর্বররা প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তারা যাতায়াত ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে সভ্যতার সকল চিহ্ন প্রায় মুছে ফেলে। বর্বরদের এই ধ্বংসলীলা মানুষের জন্য ডেকে আনে চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তা। সর্বত্র ধ্বংসের চিহ্ন পরিস্ফুট। কয়েক শতাব্দীব্যাপী চলল এ অবক্ষয়।

কিন্তু মধ্যযুগের এটা একপৃষ্ঠের দৃশ্য। অন্যপৃষ্ঠটা কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার নয়। রোমানদের সভ্যতার পচন অনেক পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল। সে সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে বর্বর জার্মানরা বরং প্রগতির পথকেই প্রশস্ত করেছিল। ঘুণে ধরা ক্রীতদাস ব্যবস্থা বর্বরদের আক্রমণেই ভেঙে পড়ে। অগণিত মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে এক অর্থে মানবতার অবমাননার অবসান ঘটানো হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে দাসভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তে যে নতুন সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল তা লৌহযুগের অবরুদ্ধ কলাকৌশলের সফল প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করেছিল। সামন্তপ্রভুদের দুর্গগুলিই শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছিল।

মধ্যযুগের শিল্প ও স্থাপত্য নতুন আঙ্গিকের রূপ নেয়। ইউরোপে মধ্যযুগের ভাবাদর্শ তৈরি করেছিল খ্রিস্টধর্ম। ধর্মগুরু পোপের বিশাল ছত্রছায়াতেই সমগ্র ইউরোপ এক শান্তির পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। মধ্যযুগে পারস্য, ভারতবর্ষ ও চীনে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ যুগে পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলামী সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকাতেও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ সকল সভ্যতার পরিচয় 'মানুষের ইতিহাসে'র মধ্যযুগের দ্বিতীয় অংশে প্রদত্ত হবে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, ভারতবর্ষ, চীন ও ইসলামিক দেশগুলি থেকে বাণিজ্যিক পণ্য ছাড়াও সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা উপকরণ ও ভাবধারা সংগ্রহ এবং আত্মস্থ করে মধ্যযুগের ইউরোপের সভ্যতা পরিপুষ্ট হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে নতুন করে গড়ে ওঠে পশ্চিম ইউরোপের নগরসমূহ। এগুলিকে কেন্দ্র করে পুনরুজ্জীবিত হয় ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সৃষ্টি করে বার্গার শ্রেণীর। নতুন যুগের বার্তাবহনকারী এ বার্গার শ্রেণীই শেষপর্যন্ত মানুষের সভ্যতাকে মধ্যযুগের গণ্ডি অতিক্রম করে আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। মধ্যযুগের সামন্ত অর্থনীতির পরিবর্তে এই আধুনিক যুগে উদিত হয় পুঁজিবাদী আর্থ-সমাজ ব্যবস্থা। মানুষের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে (আধুনিক যুগ) পনের শতকের পরবর্তীকালের ইতিহাস বর্ণিত হবে।

ডিসেম্বর ১৯৮৩ নূরুন নাহার বেগম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইউরোপের মধ্যযুগের কারিগরদের কাজের দৃশ্য

দর্জি, জুতা নির্মাতা, রুটি নির্মাতা এবং তাঁতীদের পেশাগত কাজে নিয়োজিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এ-ছবিগুলি থেকে মধ্যযুগের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি.

www.pathagar.com

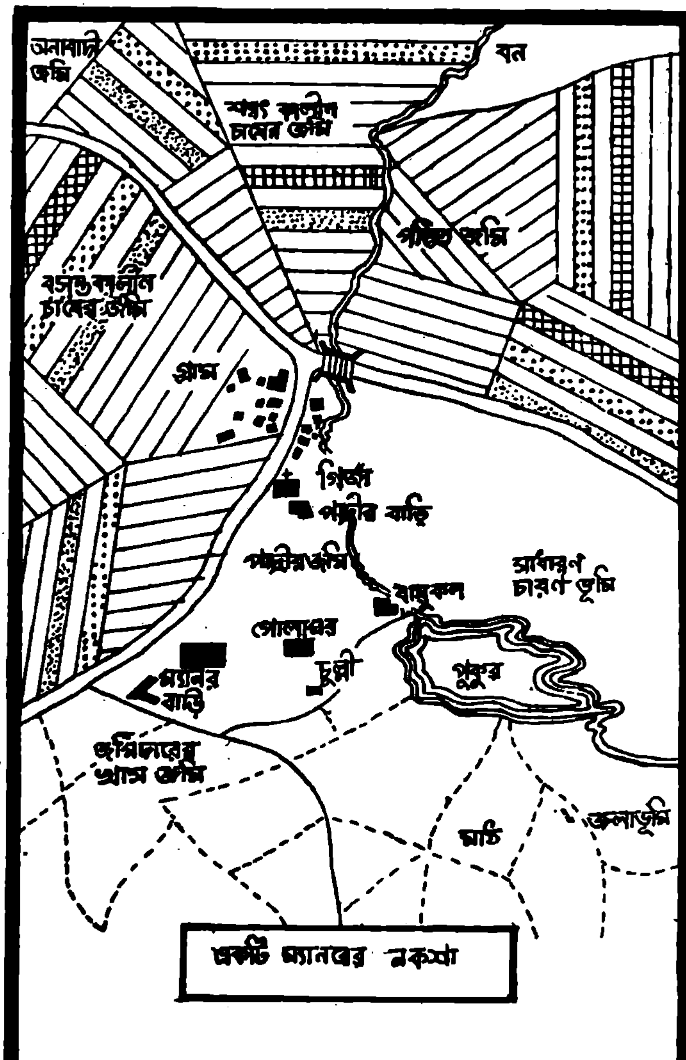

মধ্যযুগে ইউরোপের একটি ম্যানরের নকশা

ম্যানরের (Manor) মধ্যে থাকত চাষীদের গ্রাম, চাষের জমি, জমিদারদের দুর্গ ও খাসজমি, গির্জা, পানিকল বা বায়ুকল, গম ভাঙানোর কল, কাঠচেরাই-এর কল প্রভৃতি।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ইউরোপে বর্বরদের অভিযান ১৭
জার্মানদের পরিচিতি ॥ ধর্ম ॥ পরিবার ॥ রাজনৈতিক সংগঠন ॥ সমাজ ও অর্থনীতি ॥
জার্মান জাতির মহাঅভিযান ॥ জার্মান অভিযানের প্রাথমিক ফলাফল।

জার্মানদের রাজ্য স্থাপন ২৫
গথ জাতির ইতিহাস ॥ ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাস ॥

খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব ২৯
পোপতন্ত্রের উৎপত্তি ॥

সন্ন্যাস বা মঠতন্ত্র ২৯

ফ্রাঙ্কদের পরবর্তী ইতিহাস ৩৭

জার্মান জাতির অবদান ৪১

নর্ম্যান জাতির আক্রমণ ৪৩

সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ৪৬
সামন্ততন্ত্রের পরিচয় ॥ সামন্তপ্রথার উৎপত্তির কারণ ॥ সামন্তযুগে কৃষকদের অবস্থা ॥
সামন্তপ্রভুদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি ॥ সামন্ত অর্থনীতির রূপ ॥

সামন্তপ্রথায় চার্চের ভূমিকা ৫৬
সম্রাট ও পোপের সংঘর্ষ

পরিণত সামন্ততন্ত্র ৫৯
শহরসমূহের উৎপত্তি ॥ গিল্ড প্রথা ॥ বার্গার শ্রেণী॥

ক্রুসেড ৬৩

সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ৬৭
ইউরোপে কৃষক বিদ্রোহ ॥

ইউরোপে রাজশক্তির উদ্ভব ৭২
বভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ॥
ফ্রান্সের জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ॥ শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। ইংল্যান্ডে রাজশক্তির অভ্যুদয়॥
ইতালি ও জার্মানির রাজনৈতিক অনৈক্য ॥ জার্মানির রাজনৈতিক অনৈক্য ॥

সামন্তসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ৮৪
সামন্তপ্রভুদের আচরণবিধি : শিভালরি॥ মধ্যযুগের চিন্তা

মধ্যযুগের সাহিত্য ৯০

www.pathagar.com

মধ্যযুগের শিল্পকলা ৯৩
রোমানেস্ক স্থাপত্য ॥ গথিক স্থাপত্য ॥ রঙিন কাচের জানালা ॥ চিত্রকলা ॥ সঙ্গীত ॥
মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা ৯৪
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উৎপত্তি ও বিকাশ ॥
মধ্যযুগের বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা ৯৭
বিজ্ঞান ॥ কারিগরিবিদ্যা
মধ্যযুগের বাণিজ্য ৯৯
হেনসিয়াটিক লীগ ॥ বাণিজ্যমেলা ॥ বাণিজ্যপথ ॥ ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ ॥
ইউরোপের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথ ॥
বাইজেন্টাইন সভ্যতা ১০৮
বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বৈভব ॥
বাইজেন্টাইন সভ্যতার অবদান ১১৪
বাইজেন্টাইন সভ্যতার বিকাশের কারণ ॥ বাইজেন্টাইন সভ্যতার অবসান ॥
স্লাভ জাতির ইতিহাস ১১৯
মধ্যযুগের রাশিয়ার ইতিহাস ১২৩
তৃতীয় আইভান ॥ তৃতীয় বাসিল ॥ চতুর্থ আইভান বা ভয়ঙ্কর আইভান ॥
পরবর্তী সম্রাটগণ ॥ অশান্তি ও অরাজকতার কাল ॥
মধ্যযুগের চীনের ইতিহাস ১২৮
চীনে মধ্যযুগ ॥ সুই রাজবংশ ॥ তাং আমল ॥ তাই সুং ॥
তাং আমলের প্রশাসন ব্যবস্থা ॥ কর সংগ্রহ ব্যবস্থা ॥
তাং আমলের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ॥ নাটক ও সাহিত্য ॥ শিল্পকলা ॥
মুদ্রণ কৌশলের আবিষ্কার ॥ পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজবংশ ॥ সুং রাজবংশ ॥
সুং যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ॥ দর্শন ॥ চিত্রকলা ॥ দার্শনিক ওয়াং আন-শি ॥
ইউয়ান বা মঙ্গোল রাজবংশ ॥ মঙ্গোল রাজবংশের অবসান ॥ মিং রাজবংশ ॥
মিং আমলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ॥
মঙ্গোলদের ইতিহাস ১৩৬
ইসলামের ইতিহাস ১৩৯
প্রথম চার খলিফা ॥ উমাইয়া বংশ ॥ আব্বাসীয় বংশ ॥ বুয়াহিদ বংশ ॥
গজনীদ বংশ॥ সেলজুক তুর্কি বংশ ॥ মিশরের ফাতেমীয় বংশ ॥ মিশরের আইয়ুবী বংশ ॥
মিশরের মামলুক বংশ ॥ স্পেনে মুসলিম রাজ্য ॥ ইসলামী সভ্যতার পরিচয় ॥
মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৪৫
গুপ্তযুগের পরবর্তীকালের ইতিহাস ॥ হুনরাজ্য ॥ সৌরাষ্ট্রের মৈত্রক বংশ ॥
মৌখরী বংশ ॥ মালবের গুপ্ত বংশ ॥ বাকাটক বংশ ॥ মন্দাশোর রাজ্য : যশোধর্মন ॥

www.pathagar.com

বাংলার গৌড় রাজ্য ১৪৮

থানেশ্বর রাজ্য : হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ১৪৯

হর্ষবর্ধনের পরের যুগের ইতিহাস ১৫১

গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য ॥

বাংলার পাল সাম্রাজ্য ১৫২

গোপাল ॥ ধর্মপাল ॥ দেবপাল ॥

বাংলাদেশের সেন রাজাদের শাসন ১৫৫

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস ১৫৫

বাদামির চালুক্য বংশের ইতিহাস ॥ পল্লবদের ইতিহাস ॥

কল্যাণীর চালুক্য বংশ ॥ রাষ্ট্রকুট বংশের ইতিহাস ॥

সুদূর দাক্ষিণাত্যের তামিল রাজ্যসমূহের ইতিহাস ১৫৯

চোল রাজ্য ॥ পাণ্ড্য রাজাদের ইতিহাস ॥ চের রাজ্যের ইতিহাস ॥

ভারতে মুসলিম শাসন ১৬১

গজনীর সুলতানদের ভারত আক্রমণ ॥ সুলতান মাহমুদ ॥

মুসলমানদের ভারত জয় ১৬২

তুর্কো আফগান সুলতানদের যুগ ১৬৪

দাস বংশ ॥ কুতুবউদ্দিন ॥ ইলতুৎমিস ॥ সুলতানা রাজিয়া ॥

মুইজউদ্দিন বাহরাম ॥ আলাউদ্দিন মাহমুদ শাহ ॥ নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ॥

গিয়াসউদ্দিন বলবন ॥ কায়কোবাদ ॥ খলজী বংশ ॥ তুঘলক বংশ ॥

মোহাম্মদ বিন তুঘলক ॥

তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণ ১৭০

সৈয়দ বংশ ॥ লোদী বংশ ॥ ইব্রাহিম লোদী ॥

ভারতবর্ষে মোগল শাসন ১৭২

বাবর ॥ হুমায়ুন ॥ আকবর ॥ জাহাঙ্গীর ॥ শাহ্জাহান ॥ আওরঙ্গজেব ॥

ব্রিটিশদের আগমন ও মোগল শাসনের অবসান ॥

অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ১৭৪

মধ্যযুগের অবসান ১৭৬

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

G. B. Adams. *Civilization During the Middle Ages*. New York.
Thompson. J. W. *History of the Middle Ages. 300-1500*. London.
H. W. C. Davis. *Medieval Europe*. London
Edward Mc Nall Burns and Philip Lee Ralph. *World Civilization. Vol-1*, New York.
Oliver J. Thatcher and Ferdinand Schwill. *A General History of Europe*, London.
Oman Charles. *The Dark Ages, London.*
T. F. Tout. *The Empyre and The Papacy 918-1273*. London.
James Bryce. *The Holy Roman Empire*. New York.
E. C. Lodge. *The End of the Middle Ages*. London.
Abdul Momin Chowdhury. *Dynastic History of Bengal*. Dhaka
Sidney Painter. *A History of the Middle Ages : 284-1500*
আবদুল হালিম, *ইতিহাসের রূপরেখা,* ঢাকা
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড : মধ্যযুগ*, কলকাতা
দীনেশ চন্দ্র সরকার, *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত*, কলকাতা ১৯৮২

www.pathagar.com

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস

ইউরোপে বর্বরদের অভিযান

জার্মানদের পরিচিতি

জার্মান বর্বর জাতিদের আক্রমণে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের নগরভিত্তিক সভ্যতার ধ্বংসের পর ইউরোপে মধ্যযুগের ইতিহাসের সূচনা হয়। মধ্যযুগে ইউরোপে রোমান জনসাধারণ ও জার্মান বর্বরদের সংমিশ্রণে ক্রমশ গ্রামভিত্তিক সামন্ত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

বর্বররা রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে দানিয়ুব নদীর অপর পারে বাস করত। এরা বিভিন্নভাগে বিভক্ত ছিল। রোমানদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিল পশ্চিম ইউরোপের কেল্টিক ও মধ্য ইউরোপের জার্মানরা। কালক্রমে কেল্টিকরা জার্মানদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং জার্মানদের মধ্যেই মিশে যায়। কেল্টিকদের বংশধরদের মধ্য থেকেই পরবর্তীকালে আইরিশ, স্কট, ওয়েলিসি ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রিটন প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হয়।

জার্মানগণ প্রথমত রাইন ও ওডার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। তাদের পূর্বদিকে ছিল লিথুয়ানিয়ান, ফিন ও বিভিন্ন প্রকার স্লাভ জাতির বাসভূমি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এরা মিলিতভাবে জার্মানদের পশ্চিম দিকে ক্রমশ চাপ দিতে থাকে। এদের ক্রমবর্ধমান চাপের ফলেই জার্মানরা ক্রমশ রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে।

জার্মান জাতির আদি ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের প্রধানত দুটি প্রামাণ্য দলিলের উপর নির্ভর করতে হয় : একটি, রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের দিনপঞ্জি 'কমেন্টারিজ' (Commentaries)–এবং অন্যটি বিখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ 'জার্মানিয়া' (germania)।

জুলিয়াস সিজারের বিবরণ অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে জার্মানদের প্রধান পেশা ছিল মাছধরা, পশু শিকার ও পশু পালন এবং সিজারের মতে কৃষিকার্যের দিকে তাদের তেমন কোনো নজর ছিল না। তাদের জীবনযাত্রার মান রোমানদের অপেক্ষা অনেক নিচু ছিল। স্বভাবের দিক দিয়ে তারা ছিল দুর্ধর্ষ এবং দস্যুবৃত্তি ও পররাজ্য আক্রমণ তাদের পেশারই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ধর্ম

জার্মানরা ছিল প্রকৃতির উপাসক। তাদের দেবদেবীরা ছিলেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির রূপধারক। জার্মানদের দেবতা ওডেন (Woden) ছিলেন আকাশ দেবতা। সূর্যদেবী ছিলেন সুন্না (Sunna)। তেমনি চন্দ্রের দেবতা ছিলেন মানি (Mani)। হার্থা (Heartha) ছিলেন

www.pathagar.com

পৃথিবীর দেবী। বজ্রের দেবতা ছিলেন থর (Thor)। বসন্তের দেবী ছিলেন ফ্রেয়া (Freya)। জার্মানদের কোনো বিশেষ মন্দির বা পবিত্র স্থান ছিল না। তেমনি জার্মান পুরোহিতদের সমাজে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত করা হত না।

জার্মানিতে শীতকালের রাত্রি দীর্ঘায়িত হওয়ার দরুনই সম্ভবত তারা প্রতিটি দিনের পরিবর্তে প্রতিটি রাত্রির ভিত্তিতে সময়ের হিসাব করত। জার্মানদের কাছে তিনটি ঋতু ছিল প্রধান,–বসন্ত. শরৎ এবং শীত। তাদের কাছে চন্দ্র ছিল পুরুষত্বের প্রতীক এবং সূর্য ছিল নারীত্বের প্রতীক।

পরিবার

জার্মান পরিবার ছিল পিতৃপ্রধান : স্ত্রী-পুত্রের বাঁচা-মরার উপর তার অধিকার ছিল, যদিও এই অধিকার খুব কমই প্রয়োগ করা হত। গ্রামের প্রতিটি পরিবারই কোনো না কোনো আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিল। এই আত্মীয়তার বন্ধন গোষ্ঠী বন্ধনের সূত্রপাত করত। আবার এর ফলেই তারা একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করত, দলে দলে দেশ ত্যাগ করে নতুন অধিকৃত দেশে বসবাস শুরু করত।

আদি জার্মানদের মধ্যে আদিম সমাজের দোষগুণ উভয়ই বিদ্যমান ছিল। তারা ছিল সাহসী কিন্তু নিষ্ঠুর, অতিথিপরায়ণ কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। তারা ছিল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, স্বাধীনচেতা এবং প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। জার্মানরা ছিল পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত, এক স্ত্রীর প্রতি অনুগত এবং সেই সাথে দ্বিচারিণী নারীর প্রতি ক্ষমাহীন।

যে-কোনো আদিম সমাজের তুলনায় জার্মান রমণীগণ সমাজে অধিকতর সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। কয়েকজন মহিলাকে পুরোহিতের আসনে এবং কয়েকজনকে যোদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হতেও দেখা গেছে।

রাজনৈতিক সংগঠন

জার্মানদের আবাসিক এলাকার চতুষ্পার্শ পতিতজমি দ্বারা বেষ্টিত ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ভাবে আবাসিক এলাকাকে পতিতজমি দিয়ে ঘিরে রাখা হত। প্রতিটি গ্রাম এক-একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক একক (unit) হিসেবে চিহ্নিত হত। প্রতিটি গ্রামকে বলা হত মার্ক (mark)। প্রতিটি গ্রামের একটি প্রতিনিধি পরিষদ ছিল। একে বলা হত মুট (moot)। গ্রামের প্রতিটি স্বাধীন অধিবাসীর দ্বারা এই গ্রামপরিষদ গঠিত হত। প্রতিটি মার্ক বা গ্রামের উচ্চস্তরের রাজনৈতিক একক হান্ড্রেড (Hundred) নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত মধ্য ইউরোপে জার্মানদের বসতি স্থাপনের কালে একশত বা হান্ড্রেড যোদ্ধা একত্রে একটি যোদ্ধাদল গঠন করত এবং বিজিত এলাকায় বসতি স্থাপন করত। কয়েকটি হান্ড্রেড নিয়ে গঠিত হত একটি কাউন্টি বা গাউ (gau)। কয়েকটি কাউন্টি নিয়ে গঠিত হত এক গোষ্ঠী শাসিত এলাকা। পরবর্তীকালে রাজতন্ত্র প্রচলিত হলে জার্মানগোষ্ঠী শাসিত এলাকা রাজ্য বা রাইখ (Reich) নামে পরিচিত হয়। প্রতিটি স্তরের একক-এর স্বতন্ত্র গণ পরিষদ ছিল।

সমাজ ও অর্থনীতি

জার্মানদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল গোষ্ঠীভিত্তিক। ভূমির মালিকানা ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর হাতে। গোষ্ঠীর সদস্যগণ একত্রে জমি চাষ করত এবং সমানভাবে ফসলের ভাগ পেত। পরবর্তী দেড়শ বছরে কৃষিকার্যই জার্মানদের প্রধান জীবিকায় পরিণত হয়।

www.pathagar.com

আবাদী জমি ক্রমশ বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তিন পুরুষ পর্যন্ত এক-একটি পরিবারের মাপকাঠি ধরা হত। পরিবারের সদস্যগণ একত্রে জঙ্গলাকীর্ণ জমি পরিষ্কার করে সেখানে চাষাবাদ করত, যদিও পশুচারণভূমি ছিল সাধারণের সম্পত্তি। প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই জমির উর্বরতা শক্তি কমে যেত, ফলে তারা সে জমি পরিত্যাগ করে অন্যত্র নূতন ভূমির সন্ধানে গমন করত। এভাবে যাযাবরের মত নতুন আবাদযোগ্য ভূমির সন্ধানে তারা রোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়। রোমানদের সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং তাদের উন্নততর সভ্যতা জার্মানদের বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে।

জার্মানদের সভ্যতা ছিল গ্রামভিত্তিক। জীর্ণকুটিরে অত্যন্ত দীনহীনভাবে তারা জীবনযাপন করত। নতুন পাথর যুগের সমাজ ব্যবস্থার উর্ধ্বে তারা অগ্রসর হতে পারে নি। গ্রামগুলি গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন কমিউনের লোকদের বাসভূমি হিসেবে। কমিউনের লোকজন যদিও প্রথম দিকে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, পরবর্তীকালে এদের মধ্যে শ্রেণীবিভেদ দেখা দেয়। গোষ্ঠীপতি ও সামরিক নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ চাষের জমির মালিক হয় এবং গবাদিপশু ও ক্রীতদাসদের একটি বিরাট অংশ এদের হাতে আসে। জার্মানদের মধ্যে দাসপ্রথার প্রচলন থাকলেও তাদের অর্থনীতি দাসভিত্তিক ছিল না। ক্রীতদাসরা প্রভুর সাথেই থাকত, তার কাজকর্মে সহায়তা করত এবং রোমান ক্রীতদাসদের অপেক্ষা ভালো ব্যবহার পেত। জার্মানরা তাদের ক্রীতদাসদের চাষের জমি ও থাকার জন্য বাসগৃহ দিত, বিনিময়ে দাসদের কাছ থেকে ফসলের অংশ পেত। এককথায়, ক্রীতদাসদের অবস্থা ছিল রোমের 'কলোনি'দের মতো।

জার্মান কমিউনগুলি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হত। প্রতিনিধিরা গণপরিষদ গঠন করত এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। অনেক ক্ষেত্রে গণপরিষদ বিচার বিভাগের কার্যও পরিচালনা করত। জার্মানদের মধ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না এবং তাদের কোনো রাজাও ছিল না। গোষ্ঠীর স্বাধীন নাগরিকরা তাদের নেতা নির্বাচিত করত কিন্তু তার অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের অস্ত্র বহন করার অধিকার ছিল এবং যুদ্ধে যোগদান করা আবশ্যিক ছিল। অপেক্ষাকৃত ধনী ও ভূস্বামীরা নিজস্ব সৈন্য মোতায়েন করত এবং তাদের সাহায্যে প্রতিবেশী গোত্রগুলির উপর অবিরাম আক্রমণ চালাত। জার্মানদের সর্বোচ্চ গণপরিষদ সম্পূর্ণভাবে যোদ্ধাদের দ্বারাই গঠিত ছিল এবং যুদ্ধের সময়ে অথবা দেশত্যাগ করার সময়ই কেবল তাদের অধিবেশন ডাকা হত।

কাউন্টি বা হান্ড্রেড-এর প্রতিনিধি সভাগুলো বসত শান্তির সময়ে এবং বেসামরিক বিষয় নিয়েই তারা আলোচনা করত। পরিষদের নেতাকে বলা হত প্রিন্সিপেস (Principes) কিন্তু তিনি রাজা বা জমিদার নন। তাঁকে নির্বাচিত করা হত সাহস ও অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে। তিনি ছিলেন পরিষদের নির্বাচিত নেতা। প্রধান পরিষদ নেতার অধীনে ছিলেন কাউন্টি বা হান্ড্রেডদের দ্বারা নির্বাচিত উপনেতাবৃন্দ।

সামরিক নেতাকে বলা হত হার্জগ (Herzog)। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা, যেহেতু যুদ্ধ প্রায় সর্বক্ষণই লেগে থাকত, ক্রমে তিনিই সর্বক্ষেত্রে পরাক্রমশালীরূপে বিবেচিত হতেন। যুদ্ধের সামরিক অধিনায়ক শান্তির সময়েও বেসামরিক অধিকর্তার (Magistrate) ভূমিকা পালন করতেন। সামরিক অধিনায়কের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র যদি যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন বলে বিবেচিত হতেন তবে তিনি একাধারে গোষ্ঠীনেতা ও সামরিক নেতার পদ অলঙ্কৃত করতেন। ক্রমশ এভাবেই উত্তরাধিকারী রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এ প্রথার উৎপত্তির কারণ হল

www.pathagar.com

জার্মানদের ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ, দেশত্যাগ এবং ভিন দেশে বসতি স্থাপন। তা সত্ত্বেও খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফ্রাঙ্করা এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে লম্বার্ডরা যখন রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে তখনও তাদের মধ্যে সামরিক যোদ্ধা নির্বাচনের প্রথা প্রচলিত ছিল।

আদি জার্মানদের মধ্যে জঙ্গী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জার্মানদের মধ্যে প্রচলিত কমিটেটাস (Comitatus) প্রথা, যা পরবর্তীকালে সামন্তপ্রথা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি মূল ভূমিকা পালন করেছিল, জার্মান সামরিক অধিনায়ক ও তাঁর অনুগত যোদ্ধার সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন জার্মান গাথাগুলি পাঠ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রভুর প্রতি এই ভক্তি সম্পূর্ণভাবে ছিল স্বতোৎসারিত, পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে গঠিত। জার্মানদের সামাজিক প্রবণতাই ছিল একটি সম্পত্তিবান সামরিক অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলার দিকে।

পরবর্তীকালে এ-সকল ভূস্বামী সৈন্য সংগ্রহের সময় তারা কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র নজর দিত না। এর থেকে মোটামুটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জার্মানদের আদিম গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ধীরে ধীরে অবসান ঘটছিল।

কখনও কখনও কোনো সামরিক নেতা তার অধীনে কয়েকটি গোত্রকে একত্রিত করে ব্যাপকভাবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর অভিযান পরিচালনা করত। খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানরা এ ধরনের সামরিক অভিযান প্রায়শই পরিচালনা করে। ইতিহাসে এ অভিযান জার্মান জাতির মহাঅভিযান নামে পরিচিত।

জার্মান জাতির মহাঅভিযান

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জার্মানগণ বিভিন্ন শাখায় যথা : স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, ভান্ডাল, গথ, ফ্রাঙ্ক, লম্বার্ড, আলেমানি, বার্গেন্ডিয়ান, ফ্রিজিয়ান, এ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ শতাব্দীতেই তাদের প্রথম অভিযান শুরু হয়। বন্যা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাদের নিজ দেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। স্বভাবতই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় উর্বর ও শস্যসমৃদ্ধ রোমান অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর। অতএব দলে দলে তারা পরিবার পরিজন নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। এরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম দল দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্বিতীয় দল বা গথরা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণ সাগরের তীরে বসতি স্থাপন করে। এদের মধ্যে প্রথম দল বা পশ্চিম জার্মানদের বিরুদ্ধে রোমান সেনাপতি মেরিয়াস, জুলিয়াস সিজার, ড্রেসাস, টাইবেরিয়াস ও জার্মানিকাস প্রমুখ যুদ্ধ করে এদের অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভ্যারাস-এর যুদ্ধে এদের হাতে রোমান সৈন্যবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর রোমানরা জার্মানদের বিরুদ্ধে জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করে সীমান্ত বরাবর মজবুত প্রাচীর তুলে বর্বর আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও জার্মানদের অভিযান ঠেকানো গেল না। এর পরবর্তী দু'শ বছরে তারা ক্রমে ক্রমে রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে অনুপ্রবেশ করে রোমানদের মধ্যে মিশে যায়। এদের শৌর্য ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে কোনো কোনো রোমান সম্রাট জার্মানদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন এবং তাদেরই সাহায্যে পরবর্তী জার্মানদের আক্রমণ প্রতিহত করেন।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই সত্যিকার অর্থে জার্মান আক্রমণ শুরু হয়। অভিযানকারীদের দ্বিতীয় দল অর্থাৎ গথরা এবার আক্রমণে অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করে। গথরা দুভাগে বিভক্ত ছিল—অস্ট্রগথ, যারা কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরে বাস করত এবং ভিসিগথ, যারা নিম্ন দানিয়ুবের

www.pathagar.com

উত্তরাঞ্চল অধিকার করেছিল। ভিসিগথরাই প্রথম সফলভাবে রোমান সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায়। তারা ডেসিয়া প্রদেশ দখল করে নেয়। রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস তাদের বাধা প্রদানে ব্যর্থ হয়ে ভিসিগথদের সেখানে বাস করার অনুমতি দেন এবং ডেসিয়া থেকে রোমান শাসন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেন।

এর পরবর্তী বছরগুলিতে রোমান ও জার্মানরা কখনও যুদ্ধরত অবস্থায় কখনও শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করতে থাকে। এ সময়েই গথরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু তারা আরিয়ান মতবাদ গ্রহণ করার ফলে পোপ ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভিসিগথদের উপর এক মহাদুর্যোগ নেমে আসে। মধ্যএশিয়া থেকে আগত দুর্ধর্ষ হুন জাতি পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের গথদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালনা করে। হুনরা অন্যান্য বর্বর জাতিদের তুলনায় অধিকতর হিংস্র ও শক্তিশালী ছিল। তারা শুধু বর্বরই নয়, সভ্যতার লেশমাত্র তাদের মধ্যে ছিল না।

অসভ্য, বন্য এই জাতির আক্রমণে গথরা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে অগ্রসর হয়। ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব রোমান সম্রাটের অনুমতিক্রমে ভিসিগথরা দানিয়ুব নদী অতিক্রম করে রোমান রাজ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করে। কিন্তু কালক্রমে রোমান অফিসারদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

রোমান অফিসাররা তাদের উপর শুধু অত্যাচারই করত না, তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করত। ৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে আদ্রিয়ানোপোলের যুদ্ধে ভিসিগথরা রোমানদের পরাজিত করে। বাইজেন্টাইন সম্রাট তখন তাদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং তাদের কিছু সংখ্যককে রোমান সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করেন। কিন্তু রোমান সেনাধ্যক্ষগণ ভিসিগথদের উপর অবিচার শুরু করেন। তাদের ঠিকমত মাহিনা দেয়া হত না। সর্বোপরি ভিসিগথরা চেয়েছিল একটি স্থায়ী বাসস্থান, সামরিক বাহিনীর চাকুরী তাদের কাম্য ছিল না। এসব কারণেই তারা পুনরায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এবার তাদের নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসেন প্রখ্যাত নেতা অ্যালারিক। তারই অধীনে ভিসিগথরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পুরো গ্রিস ভূখণ্ড তছনছ করে দেয় এবং রোমের দিকে অগ্রসর হয়। ৪১০ খ্রিস্টাব্দে অ্যালারিকের বাহিনী রোম শহর আক্রমণ করে এবং পুরো ছ'দিন ধরে লুণ্ঠন করে শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এরপর তারা সিসিলির দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পূর্বেই অ্যালারিকের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর ভিসিগথরা বাইজেন্টাইন সম্রাটের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং গ্যারোন নদী ও পিরেনিজ পর্বতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড বাসভূমি রূপে লাভ করে। তারপর তারা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে স্পেন পর্যন্ত অধিকার করে এবং সেখান থেকে ভ্যান্ডালদের তাড়িয়ে ৪১৯ খ্রিস্টাব্দে ভিসিগথদের রাজ্য স্থাপন করে।

ভিসিগথদের সাথে সাথেই শুরু হয় হুনদের অভিযান। তারা শুধু গথদের দমন করেই ক্ষান্ত হয় নাই। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হুনরা দুর্ধর্ষ এ্যাটিলার নেতৃত্বে নিস্টার নদী অতিক্রম করে পশ্চিমদিকে প্রবল আক্রমণ চালায়। সমগ্র বল্কান উপদ্বীপ অধিকার করে হুনবাহিনী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের উপর অভিযান পরিচালনা করে এবং বাইজেন্টাইন সম্রাটের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ আদায় করে ও তাঁকে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য করে। আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে এ্যাটিলার বাহিনী সম্মিলিত রোমান ও ভিসিগথ বাহিনীর হাতে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং ৪৫১ খ্রিস্টাব্দে কেলনস-এর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। পর বছর কেলনস-এর যুদ্ধে হুনবাহিনীর সমস্ত শক্তি

www.pathagar.com

বিধ্বস্ত হয়। যদিও এ্যাটিলা ও তার সৈন্যবাহিনী রোমের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিল, তথাপি রোম শহর আক্রমণ করতে তারা সাহসী হয় নি। ৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে এ্যাটিলার মৃত্যু হয় এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথে হুন সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

মধ্য ইউরোপে হুনদের অভিযান অন্যান্য জার্মান জাতিকেও নতুন ভূমির সন্ধানে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে। ভ্যান্ডালরা প্রথমে গলদেশে ও পরে স্পেনে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু ভিসিগথরা স্পেনে প্রবেশ করলে ভ্যান্ডালরা ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে উত্তর আফ্রিকায় ভ্যান্ডাল রাজ্য স্থাপন করে। ভ্যান্ডাল রাজা জেনসেরিক বিশাল নৌবহর তৈরি করে তার সাহায্যে ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে রোম আক্রমণ করেন। পুরো দু'সপ্তাহ ধরে রোমের সমস্ত সম্পদ লুট করা হল। রোম আরেকবার বর্বরদের আক্রমণের শিকার হল।

বারগেন্ডীয়রা রোন নদীর উপত্যকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তার করে।

পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে এ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, জুট ও থুরিঞ্জীয়রা ব্রিটেন আক্রমণ করে এবং সেখানকার কেল্টিক অধিবাসীদের পরাজিত করে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। এ্যাঙ্গলদের নাম অনুসারে পরবর্তীকালে এদেশের নাম হয় ইংল্যান্ড।

ফ্রাঙ্করা প্রথমে রাইন নদীর মোহনার নিকট বাস করত। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে তারা গলদেশের উত্তরাঞ্চল অধিকার করে নেয় এবং লয়ের নদী পর্যন্ত তাদের রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করে।

গথদের আরেক শাখা অস্ট্রগথরা তাদের নেতা থিওডরিকের নেতৃত্বে ইতালিতে রাজ্য স্থাপন করে। কিন্তু পরে বাইজেন্টাইন বাহিনীর দ্বারা পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জার্মানজাতির সর্বশেষ অভিযানকারী ছিল লম্বার্ডরা। তারা ইতালির উত্তরাঞ্চল অধিকার করে এবং পো নদী পর্যন্ত অঞ্চল দখল করে নেয়।

মোটামুটিভাবে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জার্মান বর্বর জাতিদের দখলে আসে।

এই শতাব্দীতেই অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে নিমজ্জিত জীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু রোমান সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে। যে দাসপ্রথার উপর ভিত্তি করে রোমান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেটা তার নিজস্ব অসঙ্গতির দরুনই ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দাসশ্রম উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রোমান সাম্রাজ্যের শেষপর্বে কৃষিবিজ্ঞান এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যখন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ কারিগরি জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছিল। এই কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ শুধুমাত্র সচেতন শ্রমের দ্বারাই সম্ভব ছিল। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিতে অনাগ্রহী দাসশ্রমের সাহায্যে কৃষিতে কোনোরকম কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগের বিন্দুমাত্র উপায় ছিল না। অতএব উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের প্রয়োজনেই উৎপাদন প্রথার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ক্রমাগত দাসবিদ্রোহ, কলোনি ও কারিগরদের বিক্ষোভ দাসভিত্তিক রোমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমাবনতি ঘটাচ্ছিল। কখনও কখনও এ সকল বিদ্রোহ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করছিল যে, পুরো শক্তি প্রয়োগ করেও রোমের রাজশক্তি এ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয় নি। এ অবস্থায় বহিঃশত্রু বর্বরদের আক্রমণে জরাজীর্ণ রোমান সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে।

৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মান নেতা অডোএকার সর্বশেষ রোমান সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টাসকে

www.pathagar.com

রোমের সিংহাসন থেকে অপসারণ করে নিজে সিংহাসন দখল করেন। এ তারিখকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সর্বশেষ তারিখ রূপে গণ্য করা হয়। সেই সঙ্গে অবসান ঘটে প্রাচীন যুগের।

রোমান সাম্রাজ্যকে অবলম্বন করেই যেহেতু অবক্ষয়িত দাসপ্রথা শেষপর্যন্ত টিকে ছিল, তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে রোম সাম্রাজ্যের অবসানকে দাসযুগের অবসানই বলা যায়।

জার্মান অভিযানের প্রাথমিক ফলাফল

জার্মান বর্বরদের আক্রমণ প্রাথমিক পর্যায়ে সমগ্র ইউরোপে এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করে। তারা ঘর-বাড়ি, শহর, নগর, বন্দর, গ্রাম, সুউচ্চ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর ইমারত সবকিছুই ভেঙেচুরে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তাদের আক্রমণের ফলে কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। চাষবাসের কাজ যদিও কিছুদিন পরে আবার শুরু হয় কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতির ফলে এবং বন্দরগুলো একেবারে অকেজো হওয়ার দরুন বহু শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরায় চালু হয় নি।

জার্মানরা কেবলমাত্র গ্রামীণ অর্থনীতির সাথেই পরিচিত ছিল। কাজেই রোমানদের অনুরূপ নগরভিত্তিক সভ্যতা তারা গড়ে তুলতে পারে নি। রোমানদের উচ্চতর সাংস্কৃতিক মানকে অনুধাবন করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। জার্মানরা রোমানদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি অধিকার করে নেয়। তা সত্ত্বেও রোমানদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে তারা সক্ষম হয়নি। উভয়ে একত্রে অবস্থান করার দরুন রোমান ও জার্মান—এ দু'জাতির সংমিশ্রণে দীর্ঘকাল ধরে একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বিশেষত সংখ্যায় জার্মানরা অল্প হওয়ার ফলে এবং তাদের সাংস্কৃতিক মান রোমানদের তুলনায় নিকৃষ্ট হওয়ার দরুন কোথাও কোথাও তারা রোমান সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। কোনো কোনো জার্মান রাজা সম্পূর্ণরূপে রোমানদের শাসনপদ্ধতি অপরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করে। যদিও রাজনৈতিকভাবে তারা ছিল রোমানদের শত্রু তথাপি রোমানদের সাংস্কৃতিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে তারা এমনভাবে গ্রহণ করেছিল যা পরবর্তীকালে সেটা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

কিন্তু একথা মনে করা ভুল যে, জার্মানদের সকল কার্যকলাপই পশ্চিম ইউরোপের জনগণের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। রোমান সম্রাটদের সীমাহীন বিলাসিতা, প্রজাদের উপর বিপুল করভার, দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্মচারী ও সামরিক অফিসারদের অত্যাচার এবং সর্বোপরি স্থানীয় ভূস্বামীদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ, সবকিছুই জনগণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে জার্মানদের আক্রমণকে তারা বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপই মনে করেছে। ক্রীতদাস ও কলোনিরা জার্মানদের পক্ষ নিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, জার্মান সৈন্যবাহিনীতে তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং জার্মান বাহিনীকে নগরতোরণ উন্মুক্ত করে স্বাগত জানিয়েছে। জার্মানদের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ধনী রোমান ভূস্বামী ও দাস মালিকরা। এদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে ধনসম্পত্তি অধিকার করে জার্মানরা লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দিয়েছিল। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপের মাটিতে রাজ্য স্থাপন কালে জার্মানরা স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেছিল।

নতুন ভূমিতে জার্মানরা তাদের আচার, ব্যবহার, ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করল। অবশ্য দীর্ঘকাল রোমানদের পাশাপাশি বাস করার ফলে রোমানদের সভ্যতার প্রভাবও

www.pathagar.com

তাদের উপর পড়েছিল প্রচুর পরিমাণে। বিশেষ করে উন্নততর চাষাবাদ পদ্ধতি ও কৃষিকার্যে উৎকৃষ্ট হাতিয়ারের ব্যবহার তারা রোমানদের কাছ থেকেই শিখেছিল। তবে উৎপাদনে স্বাধীন কৃষকদের নিযুক্তির ফলে তারা রোমান ক্রীতদাসদের চেয়ে বেশি পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল। উৎপাদনে স্বেচ্ছাশ্রমের প্রয়োগ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্কট দূর করতে সক্ষম হল।

জার্মানরা নিজ দেশের প্রথার অনুকরণে পশ্চিম ইউরোপেও প্রথমে ক্ল্যানভিত্তিক চাষাবাদ প্রথা চালু করে। উৎপাদিত ফসল সকলের ভোগেই লাগত। পরবর্তীকালে অবশ্য পরিবারভিত্তিক চাষের জমি বিতরণ করা হয় এবং বংশপরম্পরায় তারা এগুলো ভোগ করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এ জমি বিক্রি করা, অন্য কারও সাথে বদল করা বা কাউকে দান করার অধিকার তাদের ছিল না।

সামরিক অভিযানের ফলে একই গোষ্ঠীর লোকেরা অধিকাংশ সময়েই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নতুন জায়গায় তারা অন্য গোষ্ঠীর সাথে একত্রে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এভাবে অনেক গ্রামেই বহু গোষ্ঠীর লোক একসঙ্গে বসবাস করতে থাকে। এসব গ্রামের লোকদের বলা হত সদ্য 'প্রতিবেশী সমাজ'। স্বাধীন ক্রীতদাস ও রোমান কলোনিরাও এদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে শুরু করে। এর ফলে জার্মানদের গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের মূলভিত্তি ক্রমেই ধসে পড়তে থাকে। সামরিক অভিযান জার্মানদের মধ্যকার শ্রেণীবিভেদকেও তীব্রতর করে তোলে। অবশ্য আগে থেকেই জার্মানদের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। গোষ্ঠীপতি, সামরিক নেতা প্রভৃতিরা সমাজের অন্যদের চেয়ে অধিক সুযোগ-সুবিধা ও ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণের পর তাদের শ্রেণীবৈষম্য পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায়। দলপতি, সেনাধ্যক্ষ ও অন্যান্য নেতা রোমান দাসমালিক ও ভূস্বামীদের জমিজমা, ক্রীতদাস, কলোনি ও অন্যান্য সম্পত্তি দখল করে নেয়। ফলে দলের অন্যদের চেয়ে তারা বহুগুণ বেশি সম্পত্তির মালিক হয়। অবশ্য তারা রোমান ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেয় এবং তাদের প্রত্যেককে এক একটি ছোট ভূমিখণ্ড চাষাবাদের জন্য দিয়ে দেয়। এরা স্বাধীনভাবে সেগুলো আবাদ করার অনুমতি পায় এবং বিনিময়ে জার্মান ভূস্বামীকে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এভাবে জার্মান সমাজ ক্রমশ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ শ্রেণীবৈষম্য টিকিয়ে রাখার জন্য জার্মান অভিজাত সম্প্রদায় রোমানদের অনুরূপ একটি রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন অনুভব করে। জার্মানদের নিজেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এক্ষেত্রে অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয়। বিজয়ী জার্মান নেতৃবর্গ ও সামরিক নেতৃবৃন্দ বিজিত দেশের জনগণকে অধীনস্থ রাখার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী, প্রশাসনযন্ত্র, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা, কর আদায় ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তোলে। এভাবে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার। এ নতুন রাষ্ট্রের কাজ হল শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সংহতি বজায় রাখা। অবশ্য এ নতুন সমাজ দাস ও দাসমালিকের পরিবর্তে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসদের মধ্যকার বৈষম্যের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

জার্মানদের রাজ্য স্থাপন

গথ জতির ইতিহাস

পঞ্চম শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানদের ইতিহাসকে "অন্ধকারের যুগ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জার্মান জাতিসমূহ পশ্চিম ইউরোপে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পায়। কিন্তু গথ ও ফ্রাঙ্করা ব্যতীত আর প্রায় সকলেই অল্পদিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তার একটি প্রধান কারণ ছিল যে, তারা সংখ্যায় রোমানদের তুলনায় কম ছিল। উপরন্তু রোমানদের উচ্চতর সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে তারা ক্রমশই তাদের নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে।

একমাত্র গথরা কিছুকাল এবং ফ্রাঙ্করা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাদের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ভিসিগথরা ভান্ডালদের স্পেন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বর্বর জাতির ইতিহাসে ভিসিগথরাই সর্বপ্রথম একটি রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ভিসিগথদের রাজা প্রথম থিওডোরিক ৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের কাছ থেকে দক্ষিণ গলের কয়েকটি শহর দখল করতে সক্ষম হন। ৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে রোমান জেনারেল ইটিয়াসকে তুলোর কাছে পরাজিত করে তিনি তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় থিওডোরিক লয়ের নদীর তীর পর্যন্ত ভিসিগথদের রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা ইউরিক কর্তৃক নিহত হন। ইউরিককে ভিসিগথদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। তিনি স্পেন থেকে রোমান শাসনের সর্বশেষ চিহ্নটুকু অবলুপ্ত করেন। তিনি এন্টিকা (Antiqua) নামক জার্মান আইনের সর্বপ্রথম সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই ভসিগথ রাজ্যে দুর্যোগের সূচনা হয়। ভিসিগথ ও রোমান অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এছাড়া ভিসিগথ বা জার্মানদের মধ্যে রাজতন্ত্র প্রচলিত না থাকায় সিংহাসনের দখল নিয়েও প্রচণ্ড লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। এ অবস্থার সুযোগে মুসলিমরা তাদের সুযোগ্য সেনাপতি তারিকের নেতৃত্বে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন আক্রমণ করে। জেরেজ (Xerez)-এর যুদ্ধে ভিসিগথদের সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করে মুসলিমরা স্পেনে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠিত করে। শুধুমাত্র পিরেনিজ পর্বতের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভায় তাদের রাজধানী স্থাপন করে।

ভিসিগথদের পরে পশ্চিম ইউরোপে যারা রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয় তারা হল অস্ট্রোগথ জাতি। এদের অভিযানের কথা আগেই বলা হয়েছে। হুনদের আক্রমণে এরা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কেলোন্স-এর যুদ্ধে এ্যাটিলার পরাজয় সমগ্র হুন সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনে। অন্যদের সাথে অস্ট্রোগথরাও প্রায় সাতাত্তর বছর যাবৎ হুনদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। এমনকি কোলোনস-এর যুদ্ধে এ্যাটিলার বাহিনীর পক্ষ নিয়ে তারা অন্যান্য জার্মান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। হুন সাম্রাজ্যের পতনের পর অস্ট্রোগথগণ বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করে বটে কিন্তু তারা তখন দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত। দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী ভূখণ্ডে রোমান ও হুন সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চরম দারিদ্র ও হতাশার মধ্যে তারা জীবনযাপন করছিল। সমগ্র

www.pathagar.com

এলাকা তখন দুর্বৃত্ত ও সমাজ বিরোধীদের আস্তানা এবং প্রায়ই তারা পূর্ব রোমান সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের শিকারে পরিণত হত। শেষপর্যন্ত এই সামরিক বাহিনীতেই তারা চাকুরী গ্রহণে বাধ্য হয়। কিন্তু তাতেও অস্ট্রোগথদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হল না। পুনরায় তারা অত্যধিক পরিশ্রম, অল্প খাদ্য, অনিয়মিত বেতন—কর্মকর্তাদের এ ধরনের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হল।

এর ফলে আবার তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং অচিরেই সে বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হল। ভবিষ্যতে যাতে তারা আর বিদ্রোহ করার চেষ্টা করতে না পারে সেজন্য বাইজেন্টাইন বাহিনী অস্ট্রোগথদের নেতা থিওডোরিককে তাদের কাছে জামিনস্বরূপ কনস্টান্টিনোপলে আটক রাখে। কনস্টান্টিনোপলের রাজপ্রাসাদের প্রচণ্ড বিলাসিতায় থিওডোরিককে নিমগ্ন রাখা হল এবং সর্বোচ্চ পদে তাকে অধিষ্ঠিত করা হল। প্রথমে তাঁকে সিনেটের সদস্য, পরে রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং সবশেষে কন্সালের পদে নিয়োগ করা হল। এ সবই করা হল একটিমাত্র উদ্দেশ্যে—থিওডোরিক যেন তাঁর জাতিকে ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু বাইজেন্টাইন সম্রাটের এত প্রচেষ্টা সবটুকুই ব্যর্থ হল। এত আরাম, আয়েশ ও বিলাসিতার বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও থিওডোরিক কিছুতেই ভুলতে পারেন নি যে, তাঁর দলবল অনাহারে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে বিপর্যস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। শেষপর্যন্ত একদিন তিনি কনস্টান্টিনোপলের রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে তাঁর দলের সাথে মিলিত হলেন (৪৭৪ খৃঃ)।

কয়েক বছর ধরে থিওডোরিক ও তাঁর দলবল বলকান উপদ্বীপের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তাদের অভিযান চালিয়ে যায়। বাইজেন্টাইন বাহিনী তাদের বিপুল শক্তি সত্ত্বেও এদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট জেনো থিওডোরিকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইতালি দেশটি অস্ট্রোগথদের প্রদান করতে স্বীকৃত হলেন। অবশ্য এর আগেই অডোএকার ইতালি দখল করে নিয়েছিল। সম্ভবত সেটা পুনরুদ্ধারের আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না বলেই সম্রাট সেটা থিওডোরিককে প্রদান করেন।

৪৮৮ খ্রিস্টাব্দের শরৎকালে থিওডোরিকের নেতৃত্বে অস্ট্রোগথবাহিনী তাদের অগ্রাভিযান শুরু করে এবং পর বৎসর তারা এডিজ নদী অতিক্রম করে ইতালিতে উপস্থিত হয়। পর পর তিনটি যুদ্ধে তারা অডোএকারকে পরাজিত করে তাকে র‍্যাভনায় বিতাড়িত করে এবং সমগ্র ইতালি উপদ্বীপে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। কিছুদিন পরে অডোএকার আঁততায়ীর হাতে নিহত হন। আইনত থিওডোরিক বাইজেন্টাইন সম্রাটের প্রতিনিধি হলেও কার্যত তিনি ছিলেন সমগ্র অস্ট্রোগথ সাম্রাজ্যের স্বাধীন ও সার্বভৌম সম্রাট। ইতালি, সিসিলি, প্যানোনিয়া, ইলিরিয়া, ডালমাসিয়া এবং প্রভেন্সসহ বিরাট এলাকা জুড়ে এ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

থিওডোরিক প্রায় তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং জার্মান শাসকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই রোমকে মোটামুটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর শাসনকালে ইতালির হৃত গৌরব অনেকখানি উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। সমগ্র রাজ্যে তিনি কেবল সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, রাস্তাঘাটই নির্মাণ করেন নি, ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ও জনগণের মঙ্গলার্থে বহুবিধ কাজ তিনি করে গেছেন। সর্বোপরি দেশে তিনি একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন যা তাঁর পূর্ববর্তী রোমান শাসকগণও দিতে পারেননি। তথাপি অস্ট্রোগথদের রাজ্য ইতালিতে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ রোমান জনগণ ও আমলাতন্ত্র (যাদের অধিকাংশকেই বহাল রাখা হয়েছিল) সর্বদা অস্ট্রোগথদের বিরোধিতা করেছে। রোমান ভূস্বামীদের সম্পত্তিতে তিনি কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেননি। কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক ভূস্বামীবৃন্দ সর্বদাই থিওডোরিকের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

www.pathagar.com

সর্বোপরি থিওডোরিক খ্রিস্টধর্মের এরিয়ান মতবাদ গ্রহণ করার ফলে চার্চ ও পোপের সহযোগিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়েছিলেন। মধ্যযুগে ধর্মগুরুর সমর্থন ব্যতীত কারও পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। ফলত থিওডোরিকের মৃত্যুর পর ৫২৭ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সৈন্যবাহিনী ইতালি আক্রমণ করলে তথাকার রোমান জনগণ তাদের স্বাগত জানায় এবং অস্ট্রোগথ সৈন্যবাহিনীর সর্বাত্মক প্রতিরোধ সত্ত্বেও ইতালি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের করায়ত্ত্ব হয়।

ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাস

সমগ্র জার্মান জাতির মধ্যে একমাত্র ফ্র্যাঙ্করাই ইউরোপের পরবর্তী ইতিহাসে নিজেদের অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ফ্রাঙ্করা প্রথমে রাইন নদীর তীরে বাস করত। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে এরা দুভাগে বিভক্ত ছিল—স্যালিয়ান ফ্রাঙ্ক ও রাইপুরিয়ান ফ্রাঙ্ক। সর্বশ্রেষ্ঠ স্যালিয়ান রাজা ছিলেন ক্লভিস। তিনি রাইপুরিয়ান রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে সমগ্র ফ্রাঙ্ক জাতিকে একই জাতিতে পরিণত করেন এবং তাদেরকে নিজের অধীনে আনয়ন করেন। ক্লভিসের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম ছিল মেরোভিঞ্জিয়ান।

৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে ক্লভিস প্রথমে রোমান শাসক সায়াগ্রিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। লয়ের নদীর উত্তরাংশে তখনও পর্যন্ত রোমান শাসন বলবৎ ছিল। পরপর দুটি সামরিক অভিযানের মারফৎ সায়াগ্রিয়াসের অধীনস্থ অঞ্চলগুলি ক্লভিস দখল করে নেন। ক্লভিসের রাজ্যের দক্ষিণে আরও দুটি জার্মান রাজ্য ছিল। প্রথমটি ছিল বার্গান্ডিয়ানদের। বার্গান্ডিয়ান রাজা গান্ডোবাল্ড ক্লভিসের হাতে নিহত হন এবং ক্লভিস তার ভ্রাতুষ্পুত্রী ক্লুটিল্ডাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্বে তিনি তাঁর অনুচরবর্গসহ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন।

লয়ের নদীর দক্ষিণের অঞ্চল তখনও পর্যন্ত ভিসিগথদের হাতে ছিল। ক্লভিসের হাতে তারা পরাজিত হয় এবং স্পেনে পলায়ন করে। শুধুমাত্র দক্ষিণ-পূর্বের একটি অংশ অস্ট্রোগথ রাজা থিওডোরিককে ক্লভিস ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

এভাবে ক্লভিস তাঁর রাজ্য রাইন নদীর উভয় তীরে বিস্তৃত করেন এবং সমগ্র জার্মান জাতির মধ্যে একমাত্র ফ্রাঙ্কদের রাজ্যই নবম শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল।

যেখানে অন্য জার্মানরা অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রোমানদের মধ্যে মিশিয়ে দিল সেখানে ফ্রাঙ্ক জাতি যে এতকাল পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

প্রতিটি জার্মান জাতি, যেমন গথ, ভ্যান্ডাল, বার্গেন্ডিয়ান প্রভৃতিরা তাদের আদি বাসস্থান চিরকালের জন্য ত্যাগ করে বছরের পর বছর এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে ঘুরে শেষপর্যন্ত জার্মানি থেকে বহু দূরে সম্পূর্ণ রোমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। তাদের মাতৃভূমির সাথে চিরকালের জন্য সম্পর্কের ছেদ ঘটে। ক্রমে তারা তাদের জার্মান চরিত্র হারিয়ে রোমানদের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একমাত্র ফ্রাঙ্কদের ক্ষেত্রেই সেটা ঘটেনি।

অতি অল্পসংখ্যক ফ্রাঙ্ক সৈন্য নিয়ে ক্লভিস তাঁর সামরিক অভিযান শুরু করেন। এরা খুব সহজেই উন্নত রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারত যা অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। কিন্তু তা হয়নি প্রধানত কয়েকটি কারণে। প্রথমত, ফ্রাঙ্কদের সামরিক অভিযান শুধুমাত্র দেশত্যাগ ছিল না। তারা নূতন দেশ দখল করে

www.pathagar.com

সেখানে বসবাস শুরু করলেও তাদের মাতৃভূমির সাথে কখনই সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। সর্বদা নিজভূমির সাথে যোগাযোগ থাকার ফলেই তারা কখনই রোমানদের দ্বারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। দ্বিতীয়ত, রোমান রাজ্য দখলের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্করা অন্য জার্মানদের রাজ্যও দখল করেছে। ফলে একদিকে তারা যেমন রোমানদের সংস্পর্শে এসেছিল, অন্যদিকে বর্বরদের সান্নিধ্যও তারা লাভ করেছিল। ফলে রোমানদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে তারা মুক্ত ছিল।

তৃতীয় এবং সর্বপ্রধান কারণ হল যে, ক্লভিস ও সমগ্র ফ্রাঙ্ক জাতি গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। খ্রিস্টধর্মের গোঁড়া মতবাদ (আথানাসিয়াসের মতবাদ) পোপ কর্তৃক স্বীকৃত একমাত্র ধর্ম হিসাবে পরিচিত ছিল। ফলে ক্লভিস ও ফ্রাঙ্কজাতি পোপ ও তাঁর সহযোগীদের আশীর্বাদ লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। অস্ট্রোগথ রাজা থিডোরিক এ ধর্ম গ্রহণ না করায় পোপের রোষানলে পতিত হন। অন্যদিকে সমগ্র জার্মান জাতির নেতাদের মধ্যে ক্লভিসই একমাত্র ভাগ্যবান পুরুষ যিনি শুধুমাত্র পোপের সমর্থন ও সহযোগিতাই লাভ করেন নি, উপরন্তু সমগ্র খ্রিস্ট জগতের আশীর্বাদ তাঁর উপর বর্ষিত হয়। ফ্রাঙ্কদের টিকে থাকার মূল কারণ ছিল এটাই। ক্লভিস তাঁর বিজিত রাজ্যের ভূখণ্ড বিশ্বস্ত অনুচর ও সেনাপতিদের মধ্যে বিতরণ করেন। ফলে তারা এক একজন বৃহৎ ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হয়। যে-সকল রোমান ভূস্বামী ক্লভিসের আধিপত্য স্বীকার করে নেয়, তারা নিজ নিজ জমি নিজেদের দখলে রাখার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এরা ফ্রাঙ্কদের সাথে সহযোগিতা করে এবং গল্-এ ফ্রাঙ্কদের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

ফ্রাঙ্ক ভূস্বামীগণকে জমি বিতরণ করলেও ক্লভিস অধিকাংশ ভূখণ্ড নিজের হাতেই রেখে দেন। দিনে দিনে ক্লভিসের অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অধিকাংশ ফ্রাঙ্ক ভূস্বামী রাজার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। তা ছাড়া যে সব সামরিক নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে মারা যান তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যরা ক্লভিসের অধীনতা স্বীকার করে। এদের সাহায্যে ক্লভিস তাঁর রাজ্য সংহত ও সুদৃঢ় করেন।

রাজশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্লভিস ফ্রাঙ্কদের প্রচলিত শাসননীতির পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি গণপরিষদের সভা আহ্বান ক্রমশ পরিত্যাগ করেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময়ে ক্লভিস শুধুমাত্র বিশ্বস্ত ভূস্বামীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। অন্যদের কেবল রাজার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হত।

এতদিন পর্যন্ত গোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও অপরাধের শাস্তি বিধানের দায়িত্ব শুধুমাত্র গণপরিষদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এখন থেকে রাজাই প্রধান বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন। সাধারণ জনগণের যেহেতু রাজার কাছে পৌঁছবার ক্ষমতা ছিল না, সেহেতু স্থানীয় জমিদার ও ভূস্বামীরা ছিল তাদের বিচারকর্তা।

বৃহৎ ভূস্বামীরা তাদের জমি, গবাদিপশু ও অন্যান্য ধনসম্পদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাজার কাছে দাবি জানায়। ক্লভিস ফ্রাঙ্কদের পুরান আইন-কানুন ও রাজার জারিকৃত নতুন আইন ও আদেশনামা সঙ্কলন করার নির্দেশ দেন। এভাবে প্রথম ফ্রাঙ্করা তাদের নতুন সঙ্কলিত আইন লাভ করে।

এ আইন দ্বারা কোনো সম্পত্তি চুরি করলে বা বাসগৃহ, শস্যক্ষেত্র, শস্যের গোলা প্রভৃতিতে অগ্নি সংযোগ করলে বা কোনো স্বাধীন ফ্রাঙ্ক নাগরিক বা রাজকর্মচারীকে হত্যা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দানের নির্দেশ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু লিখিত নির্দেশই যথেষ্ট নয়। ফ্রাঙ্ক ভূস্বামীরা তাদের ধনসম্পত্তির স্থায়িত্ব রক্ষাকল্পে এমন একটি ভাবাদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যা জনগণকে অবদমিত রাখতে সহায়তা করবে। ফ্রাঙ্কদের নিজস্ব ধর্ম এ-ব্যাপারে সাহায্য না করায় তারা খ্রিস্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। খ্রিস্টধর্মে দারিদ্র্যের জয়গান গাওয়া হয়েছে, জাগতিক সর্ব বিষয়ের প্রতি, ধনসম্পত্তির প্রতি অনীহা প্রদর্শন করা হয়েছে, সর্বোপরি সব বিষয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের বিধান হিসাবে মেনে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ক্লভিস ও তাঁর অনুগামীদলসহ সমগ্র ফ্রাঙ্কজাতির খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পশ্চাতে এটাই ছিল কারণ।

খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব

অগাস্টাস সিজার যখন সাম্রাজ্যবাদী একনায়কতন্ত্রী রোমের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, ঠিক তখনই তাঁর সাম্রাজ্যে এক যুগান্তকারী মহানায়কের আবির্ভাব ঘটে। রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জেরুজালেম প্রদেশের বেথলেহেম নামক গ্রামের এক আস্তাবলে এই মহাপুরুষের জন্ম হয় খ্রিস্টীয় প্রথম অব্দে (আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ৪ অব্দে)। এই মহানায়ক যীশুখ্রিস্ট। রোমের মানবতাবিরোধী দাসতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে তার প্রচারিত খ্রিস্টধর্ম সারা রোমান সাম্রাজ্যে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। গ্রেকো রোমান যুগের মুদ্রাভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতির উপযুক্ত ভাবাদর্শ সৃষ্টির যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, দাসতন্ত্রের উপস্থিতির ফলে তা কখনও বাস্তবায়িত হতে পারে নি। সমাজের তিন-চতুর্থাংশ মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে, তাদের পশুর মত জীবন যাপনে বাধ্য করে দাসপ্রথা যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল—রোমান সাম্রাজ্য সে সঙ্কট থেকে আর পরিত্রাণ পায়নি।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি যে বিশ্বজনীন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছিল সে চাহিদা মেটাতেই আবির্ভূত হয়েছিল খ্রিস্টধর্ম।

যীশুখ্রিস্টের জীবনকাহিনী ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিবরণের মূল উৎস বাইবেলের নতুন টেস্টামেন্ট। যীশুর প্রধান সহচরদের লিখিত বিবরণ থেকেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

যীশুর জন্মস্থান জেরুজালেম ছিল প্রধানত ইহুদিদের বাসভূমি। বাল্যকাল থেকেই যীশু ইহুদি ধর্মযাজকদের সাথে ধর্মবিষয়ে নানারূপ তর্কে প্রবৃত্ত হতেন। কতক বিষয়ে তাদের সাথে যীশুর মতপার্থক্য দেখা দেয়—এবং সেই সাথে যীশুর নিজস্ব মতে আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক তাঁকে ধর্মপ্রচারক বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলে মেনে নেয়। এর ফলে ইহুদিরা তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে।

দিন দিন তাঁর অনুগতের সংখ্যা বেড়ে চলল এবং যীশুর মানবতার বাণী দলে দলে লোককে—বিশেষ করে ক্রীতদাস, নিঃস্ব মজুর, কৃষক ও দরিদ্রদের তাঁর ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের মানবতা এবং বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দাসতান্ত্রিক রোমান সাম্রাজ্যে কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। রোমান শাসকগণ স্বয়ং যীশুকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মনে করলেন। তাঁদের ধারণায় যীশু একটা পাল্টা সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এই

www.pathagar.com

অভিযোগে যীশুকে অভিযুক্ত করা হয় এবং জেরুজালেমের রোমান শাসক পন্টিয়াস পাইলেট তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

খ্রিস্টধর্মের জন্ম মরমীবাদী আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে। যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে এক স্বর্গরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, পৃথিবীর প্রতিটি নরনারী আদি পিতা ও মাতা আদম ও ইভের পাপের অংশ বহন করে জন্মেছে। এই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবন যাপন। মিথ্যাচরণ, হঠকারিতা ও প্রবঞ্চনার তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। ধন-দৌলত,পার্থিব সুখ-সম্পদ ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। যীশু ধন-বৈষম্য লোপ করার উপদেশ দিয়েছেন, কেননা সমস্ত ধন-সম্পত্তির মালিক স্বয়ং ঈশ্বর। সমাজসংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক আন্দোলন। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের আন্দোলন যদি শুধু এই নীতিবাক্য ও আদর্শবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তবে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত।

একে এক বিশ্বধর্মরূপে প্রচার করে সেন্টপল খ্রিস্টধর্মকে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠান, উপাসনা, জাদুবিদ্যা, প্রভৃতির পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হল; সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য এক জীবনাদর্শ ও দর্শন তৈরি করা হল। এ কাজ সম্পাদনের জন্য খ্রিস্টধর্ম মিথ্রাইজম, সেরাপিস-আইসিস ধর্ম, স্টোইক-দর্শন ও বিশেষ করে নিও-প্ল্যাটোনিজম থেকে মতবাদ গ্রহণ করল। খ্রিস্টধর্মের মূল উপদেশের সাথে যথাসম্ভব সঙ্গতি রেখে প্রয়োজন মতো বেছে বেছে এসব অনুষ্ঠান গ্রথিত করা হয়েছে।

ওরিগেন (১৮৫—২৫৪ খৃঃ) গ্রিক দর্শন থেকে নানা মত ও তথ্যের সমাবেশ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস সুপ্রাচীন দর্শন ও জ্ঞান থেকে উদ্ভূত। লোগোস বা বিশ্বাত্মার নিত্যতা, আত্মার পূর্বাপর অস্তিত্ব প্রভৃতি গ্রিক অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে তিনি প্রচার করলেন যে, ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল। খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা করে দেয়। সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০খৃঃ) এই দার্শনিক ভিত্তি আরও সুদৃঢ় রূপে রচনা করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে বিশেষত প্লেটোনিক দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি সমগ্র জ্ঞানের এক সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর চেষ্টায় খ্রিস্টধর্ম এক অধ্যাত্মদর্শনে পরিণত হয়। সেন্ট অগাস্টিন মরমীবাদেও বিশ্বাসী ছিলেন; ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তিনি মরমীবাদ ও জাদুবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। সেন্ট জেরোম, সেন্টগ্রেগরি প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ধর্মযাজকগণ অত্যাশ্চর্য ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ দেয়ার জন্যে জাদুবিদ্যারও আশ্রয় নেন।

যীশুখ্রিস্টের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান চারজন সহচর—সেন্ট পিটার, সেন্ট পল, সেন্ট মথি ও সেন্ট লিউক খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তাঁদেরই চেষ্টায় খ্রিস্টধর্মের ব্যাপক ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটে।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপব্যাপী যে প্রচণ্ড অবক্ষয় ও দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিল, তা সাধারণভাবে মানুষের মনে এক অনিশ্চয়তা ও হতাশার জন্ম দিয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে যীশুখ্রিস্টের মরমীবাণী মানুষকে বাঁচাবার প্রেরণা দেয় এবং তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। খ্রিস্টধর্মের বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানুষের প্রতি বিশ্বপিতার ভালোবাসা, তাদের দুর্গতি মোচনের জন্যে ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর সন্তানকে প্রেরণ এবং এ জীবনের দুঃখ ও কষ্টের সমাপ্তিতে পরকালে চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দলাভের আশ্বাস ইত্যাদি সে যুগের নির্যাতিত, দারিদ্রপীড়িত মানুষকে সকল

www.pathagar.com

দুঃখ-বেদনা সহ্য করার অপরিসীম প্রেরণা যোগায়। দিন দিন খ্রিস্টধর্মের অনুরক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

খ্রিস্টধর্মের এই ব্যাপক প্রচার রোমান সম্রাটদের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং খ্রিস্টানদের উপর নেমে আসে ব্যাপক নির্যাতন ও অত্যাচার। যখনই কোনো দুর্ভিক্ষ, মহাপ্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিত তখনই খ্রিস্টানদের এর জন্যে দায়ী করা হত। খ্রিস্টানদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হয়ে পড়ে যখন ইহুদিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে (৭০ খৃঃ) এবং জেরুজালেম নগরী ধ্বংস করে। নিরো, ডমিসিয়ান, মার্কাস আরলিয়াস, প্রভৃতি রোমান সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে খ্রিস্টান বিদ্বেষী ছিলেন বলে তাঁদের সময়ে খ্রিস্টানগণ সর্বাধিক নির্যাতন ভোগ করে। কিন্তু নির্যাতন যতই বৃদ্ধি পায় নব দীক্ষিত খ্রিস্টানদের সংখ্যা ততই বেড়ে যেতে থাকে। যেভাবে খ্রিস্টানগণ সকল নির্যাতন সহ্য করেছেন তা সকলের—এমনকি খ্রিস্টধর্মের শত্রুদেরও মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। এই কারণেই দিন দিন এধর্মের অনুরাগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শেষপর্যন্ত রোমান সম্রাটগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, খ্রিস্টধর্মকে আর কোনো কিছুর দ্বারাই দমন করা সম্ভব হবে না। ৩১১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব রোমান সম্রাট গ্যালিরিয়াস খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার আদেশ দেন। দু'বছর পরে সম্রাট কনস্টানটাইন মিলানের নির্দেশের (৩১৩ খৃঃ) মাধ্যমে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় অধিকার দান করেন। কনস্টানটাইনই প্রথম রোমান সম্রাট যিনি নিজ সন্তানদের খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন (যদিও তিনি নিজে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন নি)। ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস খ্রিস্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র স্বীকৃত ধর্ম বলে ঘোষণা করেন।

মাত্র অল্পাধিক তিনশ বছরের মধ্যে সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খ্রিস্টধর্ম একটি বিশ্বধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রোমানদের ধর্মমন্দিরগুলি ক্রমশ ভগ্নদশায় পতিত হয় এবং এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে রোমান ও অন্যান্য ধর্মের প্রচলন বলপূর্বক বন্ধ করা হয়।

পোপতন্ত্রের উৎপত্তি

প্রাথমিকভাবে খ্রিস্টধর্ম যেরূপ সরল ও আড়ম্বরহীন ছিল পরে তা আর রইল না। ধর্মানুষ্ঠান, উপাসনা, বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ-এর সাথে যুক্ত হয়ে একে জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলল।

শিশুকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাদান (Baptism), বিবাহ অনুষ্ঠান ও মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি ছাড়াও প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক বহু অনুষ্ঠানের কার্য পরিচালনার জন্য একজন পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। প্রথম দিকে একজন ধর্মযাজক গ্রামে গ্রামে লোককে ধর্মোপদেশ দান প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। কিন্তু ক্রমশ এইসব ধর্মীয় কাজ গ্রামের চার্চের সার্বক্ষণিক পুরোহিতের উপর অর্পিত হয়। কালক্রমে গ্রামীণ চার্চগুলি শহরের একটি চার্চের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। শহরের চার্চের অধিকর্তার নাম প্রেসবাইটার (presbyter)। তাঁরা আবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জেলা বা ডায়োসেস-এর বিশপ-এর নিকট দায়ী থাকতেন। এই বিশপই ছিলেন তাঁর ডায়োসেস-এর সকল গির্জাভুক্ত সম্পত্তির মালিক, অধীনস্থ ধর্মযাজকদের উপর তাঁর কর্তৃত্ব বহাল থাকত। কয়েকটি ডায়োসেস একটি প্রাদেশিক চার্চের অধীনে ছিল। প্রাদেশিক চার্চের কর্মকর্তাকে বলা হত আর্চবিশপ। প্রদেশগুলি একত্রে আবার একটি প্যাট্রিয়ার্কেট (Patriarchate) গঠন করত। রোমান সাম্রাজ্যে এরকম পাঁচটি প্যাট্রিয়ার্কেট ছিল যথা—রোম, কনস্টান্টিনোপল,

www.pathagar.com

আলেকজান্দ্রিয়া, জেরুজালেম ও অ্যান্টিওক। প্যাট্রিয়ার্কেট-এর অধিকর্তা ছিলেন প্যাট্রিয়ার্ক। এভাবে ধাপে ধাপে ক্রমশ নিচু থেকে উপর দিকে গড়ে উঠেছিল চার্চ বা গির্জা সংগঠন।

পাঁচটি প্যাট্রিয়ার্কেট-এর মধ্যে থেকে একটি চার্চকে সর্বোচ্চ সংস্থারূপে নির্বাচিত করা হয় এবং এর অধিকর্তাকে বলা হত পোপ। পোপ-এর কার্যসংস্থার নাম প্যাপাসি (Papacy)।

পোপ ছিলেন খ্রিস্ট জগতের ধর্মগুরু, সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। রোমান সম্রাটের মতো ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরই ক্ষমতা ছিল সর্বশক্তিসম্পন্ন। ধর্মীয় নীতি ব্যাখ্যা ও বিধান দেয়ার একমাত্র কর্তা ছিলেন তিনি।

রোমান সাম্রাজ্যের পাঁচটি প্যাট্রিয়ার্কেট একসময়ে সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিল। কালক্রমে রোমের গির্জাই সবার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং এর প্যাট্রিয়ার্ককে পোপ বলে স্বীকার করে নেয়া হয় (গ্রিক শব্দ 'পোপ'-এর অর্থ পিতা)। রোমের চার্চের প্রাধান্য অর্জনের পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল।

প্রথমত, রোম ছিল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কেন্দ্রস্থল, এবং একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। স্বভাবতই রোমের গির্জার একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। দ্বিতীয়ত, রোমের চার্চের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যীশুখ্রিস্টের প্রধান সহচর সেন্ট পিটার। তিনি ও তাঁর পরবর্তী রোমের বিশপগণ সকল নির্যাতন ও অত্যাচারের মুখে খ্রিস্টধর্মের পতাকা সমুন্নত রেখেছিলেন। তৃতীয়ত, রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জার বিশপ খ্রিস্টধর্ম প্রচার কার্যের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। দুর্ধর্ষ বর্বরদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে তাঁদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার সকল কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য।

দুর্ধর্ষ হুন নেতা এ্যাটিলাকে রোম আক্রমণ থেকে বিরত রাখার কৃতিত্ব পোপ প্রথম লিও'র প্রাপ্য। পোপ মহান গ্রেগরি লম্বার্ডদের রোম নগরী আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর সময়ে সেন্ট অগাস্টিন ইংল্যান্ডে অ্যাঙ্গলি ও স্যাক্সনদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেন। পোপ মহান গ্রেগরি রোমের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। মুদ্রা জারি করা, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত পরিচালনা, প্রাচীর নির্মাণ, স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপনের গুরু দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সাথে পালন করেন। রোমের চার্চ-প্রধানদের মিশনারি কার্যকলাপ তাঁদের মর্যাদাকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এছাড়া কনস্টান্টিনোপলে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রোমের সিংহাসন প্রায়ই শূন্য থাকত এবং সেক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া রাজনৈতিক বিষয়েও পোপই নির্দেশ দান করতেন। রোমের চরম সঙ্কট মুহূর্তে এবং বৈদেশিক আক্রমণের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে রোমের চার্চই ছিল সকলের আশ্রয়স্থল। এসকল কারণই তাঁকে খ্রিস্টজগতের ধর্মগুরুর পদে অধিষ্ঠিত করেছে। ৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় ভ্যালেন্টিনিয়ান রোমের গির্জা প্রধানের বিধান মেনে চলার জন্য সকল খ্রিস্টান জনগণকে নির্দেশ দেন। এর পর থেকেই রোমের পোপ ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সমগ্র খ্রিস্ট জগতের নেতৃত্বের ভারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু পোপের ক্ষমতা শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা কনস্টান্টিনোপলের চার্চের প্যাট্রিয়ার্ক পোপের আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকৃত হন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং এ দ্বন্দ্ব প্রায় খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপরেই রোম ও কনস্টান্টিনোপলের গির্জাদ্বয়ের মধ্যে চিরতরে বিভেদের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম ইউরোপের গির্জাগুলি (যা ক্যাথলিক গির্জা নামে পরিচিত) রোমের পোপের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। অপরপক্ষে গ্রিক অর্থোডক্স গির্জা নামে অভিহিত পূর্ব

www.pathagar.com

ইউরোপের গির্জাগুলি কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্কের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। গির্জার সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হওয়ার পর নীতি সংক্রান্ত বিরোধগুলির মীমাংসার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়। দুটি পরস্পরবিরোধী মতের একটির প্রবক্তা আলেকজান্দ্রিয়ার গির্জার ডিকন আরিয়াস-এর মতে যীশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের সমতুল্য নন। এর বিরোধী মতের অধিকারী একই গির্জার আর্চডিকন আথানাসিয়াস বলেন, পুত্র যীশু ও পিতা ঈশ্বর একই উপাদান থেকে উদ্ভূত ও সমমর্যাদাসম্পন্ন। এই বিতর্কের সমাধানের জন্যে সম্রাট কনস্টানটাইন নিকায়াতে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে এক ধর্ম কাউন্সিলের আহ্বান জানান। উক্ত কাউন্সিলে আরিয়ান মতবাদ বর্জন করা হয় এবং আথানাসিয়াস-এর মতবাদ গ্রহণ করা হয়। খ্রিস্ট জগতের প্রধান গির্জাগুলি বিশেষত রোমান ক্যাথলিক গির্জা এই মতবাদ গ্রহণ করে। পূর্ব ইউরোপের গির্জাগুলি আরিয়ান মতবাদে দীক্ষিত হয়।

সমগ্র মধ্যযুগে খ্রিস্টধর্ম ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দাসভিত্তিক সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবাদর্শরূপে যে খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব—সেই খ্রিস্টধর্ম আবার মধ্যযুগের শ্রেণীবিভক্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে টিকিয়ে রাখতে নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে।

সন্ন্যাস বা মঠতন্ত্র

খ্রিস্টীয় যাজকতন্ত্রের পাশাপাশি আরেক সংগঠন মধ্যযুগে ইউরোপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এটা ছিল সন্ন্যাসীদের সংঘ বা মঠ। গীর্জা ও মঠ—এ দুটি প্রতিষ্ঠান মধ্যযুগে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ও প্রচারে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল।

সন্ন্যাসীদের জীবনযাপন পদ্ধতিকে বলা হত সন্ন্যাসবাদ (Monaticism)। এটা একটা জীবন দর্শনও বটে। সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর যাবতীয় সুখ, সম্ভোগ ও ভোগবিলাসের জীবন পরিত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় বা নির্জন প্রান্তরে একাকী ঈশ্বরের চিন্তায় নিজেদের নিমগ্ন রাখত। সন্ন্যাসবাদের প্রচলন ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ, চীন ও মিশরে দেখা গেলেও ইউরোপে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে এর আবির্ভাব ঘটে নি।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের শেষপর্যায়ে সমগ্র ইউরোপব্যাপী যে প্রচণ্ড নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা হয় তাতে কিছু নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ধারণা হয়, বস্তুই সকল পাপের উৎস। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে রোমান সম্রাট থেকে আরম্ভ করে অমাত্য, সেনাধ্যক্ষ, দাসমালিক ও বৃহৎ ভূস্বামীগণ যে প্রচণ্ড ভোগবিলাস ও অর্থনৈতিক জীবনে লিপ্ত ছিলেন তাতে এ-ধরনের ধারণার উৎপত্তি কিছুমাত্র আকস্মিক ব্যাপার নয়। জনসাধারণের জীবনের উপর সকল দুর্ভোগের বোঝা চাপিয়ে এরা প্রচণ্ড বিলাসিতায় নিজেদের মগ্ন রেখেছিলেন তো বটেই, উপরন্তু বর্বরদের উপর্যুপরি আক্রমণের হাত থেকে নিরীহ জনগণকে রক্ষা করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা তাঁরা করেন নি। রোমান সম্রাটদের সীমাহীন অত্যাচার, নিপীড়ন ও তদুপরি বৈদেশিক আক্রমণের মুখে অসহায় জনগণের আত্মসমর্পণ প্রভৃতি মানুষের সম্মুখে এ ধারণা স্পষ্ট করে তোলে যে, মানুষের পাপের বোঝা পূর্ণ হয়েছে এবং এ পাপই পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্যভাবে ডেকে আনছে। অতএব এ পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে জাগতিক জীবনকে পরিত্যাগ করে, পারিবারিক জীবনকে পরিহার করে আত্মার মঙ্গলের জন্যে এবং পরকালে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের জন্যে ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া।

www.pathagar.com

যীশুখ্রিস্টের বাণীও সন্ন্যাসবাদের উৎপত্তিতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। খ্রিস্টধর্মে নিঃসঙ্গ জীবনকে গার্হস্থ্যজীবন অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে; আবার দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনবান ব্যক্তির তুলনায় ঈশ্বরের কাছে অধিকতর প্রিয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি গৃহী জীবনযাপন করে তার চেয়ে অবিবাহিত ও সঙ্গীহীন ব্যক্তি অধিকতর ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারে, কিংবা একটা উটের পক্ষে একটা সুচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু কোনো ধনবান ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়—এ ধরনের বাণী এক শ্রেণীর লোকের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কাজেই যা কিছু পার্থিব, যা কিছু বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কিত, সবকিছু বর্জন করে শুধুমাত্র ঈশ্বরের চিন্তায় মনোনিবেশ করা এবং সেই সাথে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করাই সর্বোত্তম পন্থারূপে বিবেচিত হয়েছিল।

প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানগণ সবাই প্রায় সন্ন্যাসীদের মতো জীবন যাপন করতেন। যীশুখ্রিস্ট ও তাঁর অনুসারীগণ যাবতীয় ভোগবিলাস ত্যাগ করে অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে গেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ দেহকে নির্যাতনের পদ্ধতির আশ্রয় নেন নি। কিন্তু সন্ন্যাসবাদের প্রাথমিক পর্বে আমরা যে-সব সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই তারা সবাই অত্যন্ত বর্বর পন্থায় নিতান্ত অমানুষিক উপায়ে নিজ দেহের উপর নির্যাতন চালিয়েছেন। এ-ধরনের সন্ন্যাসীদের বলা হত Hermit বা Anchorite (যোগীসন্ন্যাসী)। আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য এরা নানারকম অদ্ভুত পদ্ধতিতে নিজ দেহকে নির্যাতন করত। প্রচণ্ড সূর্যের নিচে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত। অথবা প্রচণ্ড শীতে পুকুর বা কোনো জলাশয়ে অনাবৃত দেহকে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখত। পশুর মতো তৃণভোজন করত, কণ্টকাকীর্ণ ঝোপের মধ্যে গড়াগড়ি দিত কিংবা বিষাক্ত সাপ ও অন্যান্য ভয়াবহ প্রাণীসঙ্কুল বনভূমিতে দিবারাত্র যাপন করত। বিখ্যাত সাধু সাইমন স্টাইলাইটিস পুরো গ্রীষ্মকালে একটি বাগানের মধ্যে গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর তিনি তাঁর বিখ্যাত স্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু করেন; এটি ষাট ফুট উঁচু পর্যন্ত নির্মিত হলে তিনি পরবর্তী ত্রিশ বছরের জীবনকাল এই স্তম্ভের উপর বসে কাটিয়ে দেন।

এ ধরনের দৈহিক নির্যাতন পদ্ধতির দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ কতখানি হত বলা কঠিন তবে প্রত্যক্ষ ফলাফল যে খুব শুভ হত না তা বলাই বাহুল্য। অধিকাংশই অচিরেই মৃত্যুবরণ করত এবং যারা বেঁচে থাকত তারাও শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে যেত।

এ ধরনের পরিণতিই শেষপর্যন্ত সন্ন্যাস জীবন সম্পর্কে ধারণা পাল্টে দিতে সক্ষম হয়। চরম দৈহিক নির্যাতনের ফল শেষপর্যন্ত যে শুভ হয় না, এ চেতনাই পরবর্তীকালে প্রকৃত সন্ন্যাসবাদের জন্ম দেয়। দেহকে অযথা কষ্ট না দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জীবনযাপন করাই শ্রেয়—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পরবর্তী সন্ন্যাসীগণ একটি সংঘবদ্ধ জীবনযাপনে প্রয়াসী হন। এসকল সন্ন্যাসীই ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসবাদের এবং মঠতন্ত্রের জন্মদাতা। এদের বলা হত Cenobite (সেনোবাইট) বা Monk (মঙ্ক)।

সন্ন্যাসীদের জন্য সর্বপ্রথম যিনি একটি সংঘবদ্ধ জীবনের উপযোগী রীতিনীতি প্রচলন করেন তিনি হলেন সাধু বেসিল নামক কাপ্পাডোসিয়ার একজন বিশপ।

সাধু বেসিলের নিয়ম কানুনের মধ্যে ছিল : একটি নিয়মসঙ্গত সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করা; দৈহিক পরিশ্রম করা; অযথা অনাহার বা অন্য কোনো নির্যাতনের দ্বারা দেহকে কষ্ট না দেওয়া; দারিদ্র্যকে বরণ করে নেওয়া এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রার্থনায় নিয়োজিত থাকা।

www.pathagar.com

কাপ্পাডোসিয়াতে তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মঠ তৈরি করেন। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং গ্রিসেও অনুরূপ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন্ট বেসিল এইসব মঠের জন্য যে নিয়মকানুন তৈরি করেন সেগুলি বেসিলীয় নিয়ম-নীতি (Basilian Rule) নামে পরিচিত হয়। এইসব নিয়ম সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে গ্রিক সন্ন্যাসী মঠগুলিতে প্রচলিত ছিল। এর অনেক নিয়ম গ্রিক গির্জাগুলিতে এখনও প্রচলিত। সেন্ট বেসিল আদর্শ ও বাস্তবতার এক অপূর্ব সমন্বয় গড়ে তোলেন। তিনি আত্মনিগ্রহ ও আত্মনির্যাতনের পরিবর্তে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলার ভিত্তিতে সন্ন্যাস জীবন যাপনের কতকগুলি রীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে সন্ন্যাসীদের নিজেদেরকে কতকগুলি বিশেষ কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। নিজেদের ভরণ-পোষণ ছাড়াও সন্ন্যাসীরা দরিদ্র ও দুস্থদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও গ্রহণ করবে। ধর্মীয় প্রার্থনার সাথে সাথে জাগতিক কাজেও সন্ন্যাসীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। আত্মনিমগ্নতার পাশাপাশি চলবে কায়িক শ্রম। কৃষিকাজ, বয়নশিল্প, চর্মশিল্প, কাঠের কাজ, পাথরকাটা, নির্মাণশিল্প প্রভৃতি সন্ন্যাসী মঠ শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সন্ন্যাসীদের জন্য নিজস্ব পরিধেয় বস্ত্র এবং জুতা ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তার খাদ্য হবে পুষ্টিকর, কিন্তু বাহুল্যবর্জিত। সরল, বিনয়ী এবং দরিদ্র জীবনযাপন করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে সন্ন্যাসীদের।

পূর্ব ইউরোপের বহু স্থানে সাধু বেসিলের নিয়মে সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পশ্চিম ইউরোপের সন্ন্যাসীদের জন্য নিয়মনীতি প্রচলন করেন নার্সিয়ার সাধু বেনেডিক্ট, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। দক্ষিণ ইতালির মন্টেক্যাসিনো নামক সন্ন্যাসীদের আশ্রমের তিনি ছিলেন প্রধান। তাঁর নিজ সংঘের জন্য তিনি যে-সব নিয়ম কানুনের প্রচলন করেন সেগুলি পরবর্তীকালে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের সংঘগুলিতে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করা হয়। সেন্ট বেনেডিক্ট-এর নিয়মগুলি ছিল মোটামুটি সাধু বেসিলের নিয়মনীতির অনুরূপ।

সন্ন্যাসীদের প্রাথমিকভাবে তিনটি প্রতিজ্ঞা নিতে হত। দারিদ্র্য পালন অর্থাৎ কেউ কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না; কৌমার্য ব্রত পালন অর্থাৎ বিবাহিত জীবনযাপন করতে পারবে না; এবং প্রার্থনা ও উপাসনা। যেহেতু সবাই সন্ন্যাসী জীবনের উপযুক্ত নয় সেহেতু সন্ন্যাসীদের দুবছরের জন্য প্রাথমিক নির্বাচনী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হত। যারা সসম্মানে এই প্রশিক্ষণ পর্ব সমাপ্ত করতে পারত শুধু তারাই এ-সংঘ জীবনে প্রবেশ করতে পারত। এ-সংঘ জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। সন্ন্যাসীদের দিনের অধিকাংশ সময় প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকতে হত। তাদের মঠের অধ্যক্ষের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হত। নিজেদের খাদ্য নিজেদের তৈরি করা, ঘরবাড়ি, বস্ত্রাদি পরিষ্কার করাসহ সর্ববিধ কাজ তাদের নিজের হাতে করতে হত। দৈহিক পরিশ্রমকে প্রার্থনার মতোই আবশ্যকীয় বিবেচনা করা হত। তাদের উপর জ্ঞানের অনুশীলন ও পঠন-পাঠনের নির্দেশ দেয়া ছিল। অতিথির সেবা, রোগীর পরিচর্যা ও দুস্থের সেবার কঠোর নিয়ম ছিল তাদের। সাধু বেনেডিক্ট প্রণীত এ নিয়মকানুনগুলি সন্ন্যাসীদের জন্য এতখানি উপযোগী ছিল যে, প্রায় সকল সংঘই শাসনতন্ত্রের মতো এ নিয়মগুলি গ্রহণ করেছিল।

প্রাথমিক যুগে সংঘ বা মঠগুলি অত্যন্ত অল্প পরিসরে গড়ে উঠলেও কালক্রমে এগুলি বিরাট বিরাট ভূখণ্ডের মালিক হয়ে পড়ে। বহু ধনী ব্যক্তি এবং পরবর্তীকালে রাজা, মহারাজা ও সামন্তপ্রভুরা পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে চার্চ ও মঠগুলিকে প্রচুর ভূমিদান করেন। মঠের সম্পত্তি বলে বিবেচিত এসব জমি থেকে লব্ধ সম্পদ মঠের সন্ন্যাসীরাই ভোগ করত। সন্ন্যাসীরা নিজের হাতে জমি চাষ করত, সেচের ব্যবস্থা করত, বীজ বুনত ও ফসল ফলাত। কীভাবে উৎকৃষ্টরূপে ভূমি

www.pathagar.com

চাষ করে উন্নত বীজ ও উন্নত সেচের সাহায্যে অধিক ফলন ফলানো যায়, প্রতিনিয়তই তারা সে প্রচেষ্টা চালাত। কাপড় ও উল বুনন, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ইত্যাদি বিষয়ে তারা শিক্ষালাভ করেছিল। ফলে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও ধাতব দ্রব্য তারা নির্মাণ করত। প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়ার ফলে সন্ন্যাসীদের জীবন আর পূর্বের মতো সরল অনাড়ম্বর রইল না। ক্রমশ ভোগবিলাস ও পার্থিব সম্পদে তারা লিপ্ত হয়ে পড়ল। তা সত্ত্বেও ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে এ মঠগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মধ্যযুগের অচল অর্থনৈতিক জীবনকে সবল রাখার অনেকখানি দায়িত্ব তারা বহন করেছিল। খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্য পরিবহন, বাজারজাতকরণ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ তারা নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও চালিয়ে গেছে। সন্ন্যাসীরা জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞানদানকে তাদের আবশ্যকীয় কর্তব্যরূপে পালন করত। তারা স্কুল ও বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেছে। কেবল ধর্মজ্ঞান হলেও, জ্ঞানের আলোকশিখা সে অন্ধকার যুগে একমাত্র মঠগুলিই প্রজ্বলিত রেখেছে। সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে প্রাচীন মূল্যবান দলিলপত্র ও গ্রন্থসমূহের অনুলিপি রচনা করেছে যদিও অনেক ক্ষেত্রেই এগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তারা একেবারেই অজ্ঞ ছিল। এ-সকল দলিল সংরক্ষিত না হলে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনাই সম্ভব হত না।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে গির্জার পাশাপাশি মঠগুলিও খ্রিস্টধর্মের প্রসার ও প্রচারে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। পোপের আনুকূল্য লাভের ফলে গির্জা সংগঠনগুলির সাথে তারা একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

সর্বোপরি অনাথকে আশ্রয়দান, অসহায়কে সাহায্যদান, দুস্থ, বৃদ্ধ ও রোগীর পরিচর্যা প্রভৃতি জনসেবামূলক কাজের জন্য মধ্যযুগের প্রথম দিকের চরম দুর্গতির দিনগুলিতে মঠগুলিই ছিল সাধারণ মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল।

কিন্তু একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এসকল গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও মধ্যযুগের মঠগুলি একেবারে ত্রুটিমুক্ত ছিল না।

প্রথমত, সন্ন্যাসীদের নিঃস্বার্থ কাজগুলি পুরোপুরি নিঃস্বার্থ ছিল না। তাদের সর্ববিধ কাজের পশ্চাতে একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল—পুণ্য অর্জন করা। কাজেই মানবতার জন্য তারা আত্মোৎসর্গ করত এ-কথা ভাবা নিতান্ত ভুল।

সন্ন্যাসীরা পরিশ্রম করত এই জন্য নয় যে, কায়িক শ্রমের দ্বারা অন্যেরা উপকৃত হবে, তারা পরিশ্রম করত শুধুমাত্র তাদের রিপু দমনের জন্য। পার্থিব জগতের লোভ লালসাকে দমন করা অসম্ভব জেনেও অনেক সময়ে সন্ন্যাসীরা এই জগৎকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতেন। অনেক ক্ষেত্রে সন্ন্যাসবাদ সমাজে ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেছে। ৩৬২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত গ্যাংগ্রেস-এর সাইনড্-এ এই অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, সন্ন্যাসবাদ অনেক পরিবারে ভাঙন এনেছে এবং অনেক পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। দোকান এবং হস্তশিল্পে নিয়োজিত লোকজন কমে যাওয়ার ফলে কতক ক্ষেত্রে সরকার সতর্ক হয়ে যায় এবং সামরিক বাহিনীতে যোগদান এড়ানোর জন্য সন্ন্যাসবাদে দীক্ষিত হওয়ার বিরুদ্ধে আইন পাস করে।

সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ছিল যে, সন্ন্যাসীরা ছিল প্রচণ্ড ধর্মোন্মাদ। খ্রিস্টধর্ম বিরোধী কোনোকিছুই তারা সহ্য করতে পারত না তো বটেই, উপরন্তু তা দমন করার জন্য সবচেয়ে নির্মম পদ্ধতির আশ্রয় নিত।

পৌত্তলিক গ্রিক ও রোমান সভ্যতার সাথে সংযুক্ত সবকিছুই তাদের কাছে ছিল অসহনীয়। যুক্তি ও বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসীরা গ্রেকো-রোমান সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সবকিছুকেই নির্মমভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে।

www.pathagar.com

এসব অসহিষ্ণু সন্ন্যাসী গ্রিক ও রোমান ধর্মমন্দিরগুলি ধ্বংস করছে, প্রাচীন শিল্পকলার অনুপম নিদর্শনগুলি বিনষ্ট করেছে, আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করেছে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিতাড়িত করেছে এবং চিরায়ত সাহিত্যগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এদের হাতেই আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত মহিলা গণিতবিদ হাইপেসিয়া নির্মমভাবে নিহত হন (৪১৫ খ্রিস্টাব্দ)।

ফ্রাঙ্কদের পরবর্তী ইতিহাস

ক্লভিসের মৃত্যুর পরে ফ্রাঙ্ক জাতির মেরোভিঞ্জিয়ান রাজবংশ আরও দেড়শ বছর রাজত্ব করে। কিন্তু তাদের রাজত্বকালের ইতিহাস শুধুমাত্র হত্যা, ষড়যন্ত্র আর বীভৎস অত্যাচারের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। রাজ্যময় এই অরাজকতার সুযোগে রাজার মন্ত্রীসভার সদস্য প্রাসাদের মেয়রগণ সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে এই মেয়রদেরই একজন চার্লস মার্টেল ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্পেনের মুসলিমগণ তাঁদের সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ফ্রান্সে প্রবেশ করে বোর্দো পর্যন্ত অধিকার করেন। মুসলিমদের অশ্বারোহী বাহিনীর মোকাবিলা করার মতো শক্তি পদাতিক ফ্রাঙ্ক সৈন্য বাহিনীর ছিল না। অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার মতো অর্থশক্তিও ফ্রাঙ্ক রাজাদের ছিল না। কারণ অকর্মণ্য ও বিলাসী রাজন্যবর্গ রাজকোষ প্রায় শূন্য করে ফেলেছিল। চার্লস মার্টেল তখনও চার্চ সংলগ্ন বিশাল ভূমিখণ্ডগুলি রাজার নির্দেশবলে বাজেয়াপ্ত করে নেন। এই সকল ভূখণ্ড বিশ্বস্ত অনুচর ও ধনী প্রজাবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়, বিনিময়ে তারা রাজাকে অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে সাহায্য করে। এই নবগঠিত সৈন্যদল নিয়ে চার্লস মার্টেল তুরের (Tours) যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম সুলতানের সম্মুখীন হন। যুদ্ধে সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমান নিহত হন এবং মুসলিম বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। ইতিমধ্যে স্পেনে মুসলিমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। বিপর্যস্ত মুসলিম বাহিনীর হাত থেকে চার্লস ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করেন। তুরের যুদ্ধ শুধুমাত্র ফ্রাঙ্কদের সামরিক কৌশলই উন্নত করেনি। ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। অশ্বারোহী বাহিনী সংগ্রহ ও মোতায়েন রাখা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল বলে যাঁরাই রাজার কাছ থেকে জমি পেতেন, তাদের প্রাথমিক কর্তব্য ছিল, ইউরোপের নতুন রাজাকে প্রয়োজনের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা। সামন্তপ্রথার সামরিক ভিত্তি চার্লস মার্টেলই রচনা করেছিলেন। রাজার কাছ থেকে প্রাপ্ত ভূস্বামীগণ বংশ পরম্পরায় ভোগ দখল করার অধিকার লাভ করেন।

ফ্রাঙ্ক রাজাদের অনুকরণে অধীনস্থ ভূস্বামীগণও নিজস্ব অনুগামী সম্প্রদায় গড়ে তুলতে শুরু করল। ভূস্বামীগণ অনুচরদের মধ্যে জমি বিতরণ করত। বিনিময়ে এ অনুচররা ভূস্বামীকে সামরিক সাহায্য প্রদান করত। এভাবে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হল। অনুচরদের মধ্যে জমি বিতরণের উদ্দেশ্যে ফ্রাঙ্ক ভূস্বামীগণ স্বাধীন কৃষকদের জমি দখল করে নিত।

গায়ের জোরে জমি দখল ছাড়াও কৃষককে তার ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অনেক পন্থা এদের জানা ছিল। তারা যে-কোনো উপায়ে দরিদ্র কৃষককে বিপদে ফেলত বা তাদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দিত অথবা ঋণের জালে গেঁথে ফেলত। কৃষক তার জমিটুকু জমিদারদের হাতে অর্পণ না করা

www.pathagar.com

পর্যন্ত জমিদার তাকে রেহাই দিত না। এভাবে সমগ্র দেশের জমি গুটিকতক ভূস্বামীর হাতে সঞ্চিত হল। আর দেশের অগণিত দরিদ্র কৃষক ভূমিহীন প্রজায় পরিণত হল। জমিদার আবার জমিগুলি কৃষকদের মধ্যে চাষাবাদের জন্য বিলি করত, কিন্তু জমির মালিক তখন জমিদার, কৃষকরা নয়। এভাবে নিজেদের জমি কৃষকরা চাষ করার অনুমতি পেল, কিন্তু অগণিত শর্তের জালে তারা বাঁধা পড়ল।

চার্লস মার্টেলের পুত্র পিপিনের সময়ই এই জমি দখল পর্বটি অধিক মাত্রায় সংঘটিত হয়। তাঁর রাজত্বকালেই এই সংঘবদ্ধ জমিদার তথা সামরিক শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের সাহায্যেই পিপিন দি শর্ট অযোগ্য মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাকে অপসারিত করে ফ্রাঙ্ক রাজ্যের সিংহাসন দখল করেন (৭৫১ খৃঃ)। এই নূতন রাজবংশ ইতিহাসে ক্যারোলিঞ্জিয়ান বংশ নামে পরিচিত। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ক্যারোলাস ম্যাগনাস বা শার্লামেন (Charles magne)-এর নাম থেকে ক্যারোলিঞ্জিয়ান নামের উৎপত্তি হয়েছে।

সিংহাসন দখল করার কাজে পিপিন পোপের আশীর্বাদ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ ইতিপূর্বে লম্বার্ড রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পোপ যখন নিজে সিংহাসনচ্যুত হন তখন পিপিনই লম্বার্ড রাজাকে পরাজিত করে পোপের রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেন। পিপিনের পুত্র শার্লামেন ৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে তিনি পঞ্চাশটির অধিক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ফ্রাঙ্ক রাজ্যের পরিধি বর্ধিত করা এবং সাথে সাথে অধিক ভূখণ্ড দখল করাই ছিল তাঁর সামরিক অভিযানের লক্ষ্য।

প্রায় প্রতি বৎসরই শার্লামেন যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করেন। তাঁর বিশাল সামরিক বাহিনী দু'বার আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে ইতালি আক্রমণ করে এবং লম্বার্ড রাজ্যসহ উত্তর ইতালির বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করে।

তিনি জার্মানির ব্যাভারিয়া জয় করেন এবং বোহেমিয়ানদের কর দিতে বাধ্য করেন। কিন্তু স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে শার্লামেনের অভিযান ছিল সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও নিষ্ঠুরতম। স্যাক্সনরা রাইন ও এল্‌ব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। সমগ্র বর্বর জাতির মধ্যে একমাত্র এরাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেনি। খ্রিস্টধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শার্লামেনের কাছে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছুই ছিল না।

স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে সর্বমোট আটটি সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়। শার্লামেন শুধু স্যাক্সনদের পরাজিত করেন নি, তাদের উপাসনালয় বিগ্রহ মূর্তি প্রভৃতি নির্মমভাবে ধ্বংস করেন। এই বিশাল সামরিক বাহিনীর হাতে পরাজিত ও বিধ্বস্ত স্যাক্সনরা শার্লামেনের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হল। কিন্তু ফ্রাঙ্ক সৈন্যরা দেশে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। স্যাক্সনরা ফ্রাঙ্কদের নির্মিত দুর্গগুলি ভেঙে ফেলল এবং খ্রিস্টান পুরোহিতদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শার্লামেন স্যাক্সনদের নির্মমভাবে দমন করেন। তাঁর নির্দেশে একদিন সাড়ে চার হাজার বন্দীকে হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয়, দশ হাজার বন্দী পরিবারকে ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের দূর দূরান্তে নির্বাসিত করা হয়। সমগ্র স্যাক্সন রাজ্যে ফ্রাঙ্কদের বসতি স্থাপন করা হল। নিষ্ঠুর আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে-কোনো রকমের বিদ্রোহের সম্ভাবনা রহিত করা হয়। একার্যে শার্লামেন ফ্রাঙ্ক ভূস্বামী ব্যতীত খ্রিস্টান পুরোহিতদেরও সাহায্য লাভ করেন। পুরোহিতগণ

www.pathagar.com

স্যাক্সনদের ব্যাপকভাবে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং সমগ্র স্যাক্সন রাজ্যে অসংখ্য চার্চ ও মঠ গড়ে তোলেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে কেউ বিন্দুমাত্র আপত্তি প্রদর্শন করলে তাকে সাথে সাথেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হত।

শার্লামেন পিরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে স্পেনের মুসলমানদের বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করেন কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সফলকাম হতে পারেন নি। তিনি শুধুমাত্র পিরেনিজ পর্বতের দক্ষিণের ক্ষুদ্র একটি ভূভাগ জয় করতে সক্ষম হন। শার্লামেন তাঁর রাজত্বকালে ডেনিসদের আক্রমণও প্রতিহত করেন। শুধুমাত্র ইংরেজ ব্যতীত ইউরোপে এমন কোনো জাতি ছিল না যাদের বিরুদ্ধে শার্লামেন যুদ্ধ করেন নি। তাঁর মৃত্যুকালে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য এতদূর বিস্তার লাভ করেছিল যে, তার পরিসীমার মধ্যে বর্তমান ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, স্পেনের একাংশ এবং ইতালির রোম পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮০০ খ্রিস্টাব্দে শার্লামেন বড়দিনের উৎসবে যোগদানের জন্য রোমে গমন করেন। ইতিপূর্বে তিনি রোমের বিক্ষুব্ধ জনগণ কর্তৃক বিতাড়িত পোপকে নিজ পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বড়দিনে রোমের সেন্ট পিটার্স চার্চে প্রার্থনা সমাপনান্তে যখন শার্লামেন মস্তক উত্তোলন করেন ঠিক তখনই পোপ তাঁর মস্তকে রোমান সম্রাটের স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দেন। উপস্থিত জনতা তাঁকে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে মহান ও শান্তিপ্রিয় রোমান সম্রাট নামে অভিনন্দিত করে। মধ্যযুগের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞের নায়ককে শান্তিপ্রিয় ও মহান সম্রাট নামে বরণ করা হল। শার্লামেন যদিও পোপের দ্বারা রোমান সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হওয়া পছন্দ করেননি, তথাপি, সম্রাট হওয়ার পুরোপুরি বাসনা তাঁর অন্তরে ছিল। যদিও রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান আর কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না, তথাপি রোমের জনগণের মনে রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবের স্মৃতি এতখানি জাগরূক ছিল যে, শার্লামেন কর্তৃক স্থাপিত সাম্রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্য নামে অভিহিত করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। পূর্বতন পৌত্তলিক রোমান সাম্রাজ্যের সাথে এর পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য এ-সাম্রাজ্যকে পরবর্তীকালে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নামে আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য পরবর্তীকালের জার্মান সম্রাট অটো দি গ্রেট ছিলেন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সত্যিকার প্রতিষ্ঠাতা।

শার্লামেনের সাম্রাজ্য যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বর্বর জাতির মধ্যে কিছুকালের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

শুধুমাত্র রাজ্য জয়েই শার্লামেনের কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি একটি উৎকৃষ্ট এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এ শাসন ব্যবস্থায় সম্রাটের হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। পুরাতন বর্বর গোষ্ঠীপতিদের হাতে যে শাসন ক্ষমতা ছিল, শার্লামেন তা পুরোপুরি বাতিল করে সর্বত্র তিনি নিজে উপর থেকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। জেলা বা কাউন্টির শাসনকর্তাদের নাম ছিল কাউন্ট। কয়েকটি কাউন্টি নিয়ে গঠিত ছিল ডাচি (Dutchi), এবং এর শাসনকর্তার নাম ছিল ডিউক। কাউন্ট ও ডিউকগণ সরাসরি সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত হতেন এবং যে-কোনো সময়ে সম্রাট তাঁদের অপসারণ করতে পারতেন। সীমান্ত রক্ষাকার্যে নিযুক্ত অফিসারদের বলা হত মারগ্রেভ (Margrave)। এ-ছাড়া একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী ছিল তাদের বলা হত মিসি ডমিনিসি (Missi Dominici)। এরা রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করে সর্ববিধ অবস্থা সম্রাটকে জানাত। এরা গুপ্তচরের মতো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকত এবং দেশের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক অবস্থা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, শাসনকর্তাদের কার্যাবলির বিবরণ এমন কি রাজস্ব আদায়ের পুরোপুরি বিবরণ শার্লামেনের নিকট পেশ করত। বিশ্বস্ত কর্মচারীদের শুধু এ-কাজে নিযুক্ত করা হত এবং এদের সাহায্যেই শার্লামেন এতবড় বিশাল ভূখণ্ডে নিজের পুরোপুরি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ ছাড়া যাজকশ্রেণীর উপর তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি প্রায়শই ধর্মসভা আহ্বান করতেন এবং তাতে চার্চ সম্বন্ধীয় যাবতীয় নিয়ম-কানুন নিজে নির্ধারণ করতেন। নিজে অশিক্ষিত হলেও শার্লামেন শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ স্কুলে অ্যালকুইন অব ইয়র্ক-এর মতো পণ্ডিতবর্গ অধ্যাপনা করতেন।

কিন্তু শার্লামেনের সকল কৃতিত্ব তাঁর মৃত্যুর পরপরই অস্তমিত হয়। যখন বিকেন্দ্রীভূত সামন্তব্যবস্থা তার পুরোপুরি রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে সময়ে এতবড় সাম্রাজ্যে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র শার্লামেনের অপরিসীম ব্যক্তিত্বের দরুনই টিকে ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সামন্তপ্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। স্থানীয় কাউন্ট ও ডিউকগণ নিজেরাই নিজস্ব এলাকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন এবং শার্লামেনের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে ক্ষমতা ভোগ করতে থাকেন।

এভাবে ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে।

এছাড়া ফ্রাঙ্কদের অদ্ভুত উত্তরাধিকারী প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক পুত্রেরই সিংহাসনে সমান অংশ ছিল। শার্লামেনের একমাত্র পুত্র ছিলেন 'ধার্মিক লুই'। 'ধার্মিক লুই'-এর মৃত্যুর পর বিশাল ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্য তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। টাক মাথা চার্লস (Charles the Bald) পেলেন পশ্চিমের অংশ অর্থাৎ পুরো ফ্রান্স ও স্পেনের কিয়দংশ', অপর পুত্র লুই পেলেন পূর্ব অংশ অর্থাৎ পুরো জার্মানি এবং জ্যেষ্ঠপুত্র লথেয়ার পেলেন বার্গান্ডির রাজ্যগুলি, উত্তর ইতালির রাষ্ট্রসমূহ, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম ও হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ। সম্রাট উপাধিও লথেয়ারই পেলেন। ভার্দুনের চুক্তি অনুযায়ী এ বিভক্তিকরণ সম্পন্ন হয়। এ চুক্তির শর্তাবলী দুটি ভাষায় প্রকাশিত হয় : ফরাসি ও জার্মান; এবং এ দুটি দেশের মধ্যেকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য এখান থেকেই শুরু হয়।

পরবর্তী ক্যারোলিঞ্জিয়ান রাজাদের সময়ে এ অংশগুলি আরও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে এবং প্রতিটি রাজ্য এক একটি সামন্ত রাষ্ট্রেরই রূপ নেয়।

ঠিক এ সময়েই শুরু হয় নর্ম্যানদের আক্রমণ। ইউরোপের উত্তর থেকে আগত এই নতুন জাতির আক্রমণে ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের বাকি অংশটুকুও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে।

www.pathagar.com

জার্মান জাতির অবদান

এ পর্যন্ত আমরা বর্বর জার্মান জাতির পশ্চিম ইউরোপে সামরিক অভিযান ও রাজ্য স্থাপনের ইতিহাস আলোচনা করেছি। আপাতদৃষ্টিতে তাদের দ্বারা রোমান সাম্রাজ্য দখলের কাহিনী যতই নিষ্ঠুর মনে হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঘুণে ধরা, অবক্ষয়িত রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে জার্মানরা সভ্যতার অগ্রগতির পথই প্রশস্ত করেছে। সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের বিচারে রোমানদের সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে উঁচুমানের ছিল, তাদের বাহ্যিক রূপ ছিল চাকচিক্যময়, কিন্তু এর আভ্যন্তরীণ রূপ ছিল অতি কদর্য ও পঙ্কিল। সাম্রাজ্যের জনগণের বিরাট অংশকে ক্রীতদাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রোমানগণ আপাতদৃষ্টিতে যে বৈভবময় ও ঐশ্বর্যপূর্ণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তা শেষ পর্যন্ত তার নিজেরই পতন ডেকে এনেছিল। বর্বরদের আক্রমণ সে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল মাত্র। কাজেই জার্মান জাতির অভিযানে একদিকে যেমন প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে এ ধ্বংসের আড়ালে অতি ধীরে ধীরে চলছিল ভবিষ্যৎ সভ্যতার প্রস্তুতিপর্ব। এ সভ্যতা মধ্যযুগের সামন্ত-সভ্যতা—আধুনিক মাপকাঠিতে নিকৃষ্ট বলে মনে হলেও প্রাচীন দাসভিত্তিক সমাজের মানদণ্ডের বিচারে নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটি উঁচুদরের সভ্যতা। প্রাচীন গ্রেকো রোমান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও মধ্যযুগীয় সভ্যতায় সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল বর্বর জার্মান জাতির।

জার্মানরা তাদের নিজস্ব ভাবধারা, রীতিনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। এর অনেকগুলিই তারা প্রবর্তিত করেছিল বিজিত দেশে তাদের রাজ্য গড়ে তোলার সময়ে। এর বহুলাংশ ইউরোপ গ্রহণ করেছিল যেমন সে এককালে গ্রহণ করেছিল বহিরাগত এট্রুস্কান, গ্রিক ও অন্যদের কলাকৌশল।

মধ্যযুগের সভ্যতার ক্ষেত্রে জার্মানদের সবচেয়ে বড় অবদান তারা নিজেরাই। একটি নব্য শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের অধিকারী বিজেতা জাতি হিসাবে ইউরোপে তাদের আগমন নিঃসন্দেহে অচল ও নিরুদ্ধগতি ইউরোপীয় সমাজকে সক্রিয় ও সচল করে তুলেছিল। জার্মানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা রোমানদের তুলনায় ছিল উদার ও গণতান্ত্রিক।

গোষ্ঠীভিত্তিক জার্মান সমাজে দলপতির প্রভাব থাকলেও সর্বসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত স্থানীয় ও সাধারণ পরিষদই ছিল প্রকৃত ক্ষমতার উৎস। গোষ্ঠীনেতা, এমন কি রাজাদেরও নির্বাচিত করত এই পরিষদ। রোমানদের মতো নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র জার্মানদের ছিল না। সর্ববিধ আইন প্রণয়ন এমন কি বিচার বিভাগের কাজও ছিল সাধারণ পরিষদের উপর অর্পিত। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডস্ ও হাউস অব কমন্স কর্তৃক যুগ্মভাবে সময়ে সময়ে বিচার কার্য পরিচালনার যে দৃষ্টান্ত আমরা ইতিহাসে পাই তা সম্ভবত জার্মানদের প্রথার অনুকরণেই হয়েছিল। নির্বাচিত রাজতন্ত্রের প্রথাও পরবর্তী যুগে জার্মানির রাজা ও পবিত্র রোমান সম্রাটের নির্বাচন পদ্ধতির সূচনা করে। স্থানীয় পরিষদগুলিও স্থানীয়ভাবে বিচার কার্যের ভারপ্রাপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপের কোনো কোনো স্থানে বিশেষত ইংল্যান্ডে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, বিচার বিভাগ সম্বলিত শায়ার (Shire) গুলি গড়ে ওঠে জার্মানদের স্থানীয় পরিষদগুলির প্রভাব তাদের উপর প্রতিফলিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা জার্মানদের আরেকটি বিশেষ রাজনৈতিক অবদান। রোমানদের মধ্যে এ ধরনের প্রথা বিশেষভাবে অনুপস্থিত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যে একমাত্র রোম নগরে স্বাধীন

www.pathagar.com

নাগরিকরা সিনেট সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন করত। অন্য সব নগর বা প্রদেশের নাগরিকরা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আর ক্রীতদাসদের তো কোনোরকম ভোটাধিকারই ছিল না। কিন্তু সমগ্র জার্মান জাতির ভোটে তাদেরই মধ্য থেকে নির্বাচিত হত সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ। পরবর্তীকালে আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

জার্মানদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি তাদের আইন। প্রাথমিক যুগে জার্মানদের আইন ছিল বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ পদ্ধতির বিচারে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোমান আইনের তুলনায় একটিমাত্র কারণে হলেও সেগুলি উৎকৃষ্টতার দাবি রাখে —তা হল, জার্মান আইনগুলি কোনো সম্রাট বা রাজা কর্তৃক প্রণীত নয়। এগুলি প্রণীত হয়েছিল সাধারণ পরিষদের দ্বারা অর্থাৎ জনগণের দ্বারা। কারণ সাধারণ পরিষদ সর্বসাধারণের ভোটেই নির্বাচিত হত। জার্মান আইন জনগণের তৈরি এবং জনগণের প্রতিনিধিরা ছিলেন এর একমাত্র প্রয়োগকর্তা; জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক এগুলি প্রণীত বা কার্যকর করা হয়নি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জার্মান আইন শেষপর্যন্ত ইউরোপে টিকে থাকেনি। মধ্যযুগের শেষপর্যায়ে নতুনভাবে সঙ্কলিত এবং পরিশোধিত রোমান আইন এর স্থান দখল করে নেয়।

সামাজিক ক্ষেত্রে জার্মান বর্বরদের অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রোমানদের প্রচলিত ক্রীতদাস প্রথার সাথে জার্মানরা পরিচিত ছিল না। কাজেই, যে অবক্ষয়িত, ঘৃণিত, অপ্রয়োজনীয় ক্রীতদাস ব্যবস্থা রোমানরা পরিহার করতে পারেনি জার্মানরা তা সহজেই বর্জন করেছিল। তারা প্রবর্তন করেছিল একটি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা। উৎপাদনের যে সঙ্কট ক্রীতদাস প্রথা বলবৎ থাকার দরুন রোমানরা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, জার্মানরা ক্রীতদাস প্রথাকে পরিহার করে অতি সহজেই সে সঙ্কট অতিক্রম করতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে মধ্যযুগে যে সামন্ত প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল তার কিছুটা ভিত্তি রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে রচিত হলেও এ প্রথার উৎপত্তির পশ্চাতে বর্বরদের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল, সামন্ত প্রথার ইতিহাস বর্ণনাকালে আমরা সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করব।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও জার্মানদের অবদান অস্বীকার করার মতো নয়। এদের সবচেয়ে বেশি অবদান ভাষার ক্ষেত্রে। রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত ভাষা ছিল ল্যাটিন। প্রত্যেকটি জার্মান জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। এক এক অঞ্চলের জার্মানদের নিজস্ব ভাষার সাথে ল্যাটিন ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালের ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয় ভাষা—যেমন, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, স্পেনীয়, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষা। বিভিন্ন জার্মান জাতির নাম অনুসারে পশ্চিম ইউরোপের এক একটি দেশ বা অঞ্চলের নামও গড়ে উঠেছিল। অ্যাঙ্গলদের দেশ হল ইংল্যান্ড, ফ্রাঙ্কদের দেশ ফ্রান্স নামে (পূর্ব নাম গর) পরিচিত হল। লম্বার্ডদের নাম অনুযায়ী ইতালির একটি প্রদেশ হল লম্বার্ডি; ভ্যান্ডালদের নাম অনুসারে স্পেনের একটি অঞ্চল ভ্যান্ডালুসিয়া বা আন্দালুসিয়া নামে পরিচিত হল। খোদ জার্মানিতে স্যাক্সনদের নামে একটি অঞ্চলের নাম হল স্যাক্সনি।

গ্রেকো-রোমান তথা গ্রিসীয় ও রোমক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে মিশ্রিত হয়েছিল জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আরও পরে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নর্ম্যান নামক আরেকটি বর্বর জাতির ঐতিহ্য। এসবের মিলিত সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল মধ্যযুগের সংস্কৃতি এবং তা পরবর্তীকালে আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির পথ উন্মুক্ত করেছিল।

www.pathagar.com

নর্ম্যান জাতির আক্রমণ

খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপ আরেকবার বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হল। এবারের আক্রমণকারীরা ছিল উত্তর থেকে আগত নর্থম্যান বা নর্ম্যান জাতি। স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসমূহ অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসীকে মধ্যযুগে সাধারণভাবে নর্ম্যান বলা হত। ইতিহাসে এরা 'ভাইকিং' নামেও পরিচিত। জাতিগতভাবে তারা বর্বর টিউটন জাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তারা অন্য জার্মানদের থেকে পৃথক ছিল।

নর্ম্যানরা টিউটনদের আদিম রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধিকারী ছিল। অন্যান্য জার্মানরা যেখানে বহু শতাব্দী ধরে রোমান সভ্যতা ও খ্রিস্টান সভ্যতার কাছাকাছি বাস করে এসেছে, নর্ম্যানরা সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল থেকে বসবাস করে এসেছে। নবম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ ভূখণ্ড অপরাপর ইউরোপবাসীর কাছে পুরোপুরি অজ্ঞাত ছিল। অনুর্বর পার্বত্যভূমি বছরের অধিকাংশ সময়েই বরফে আচ্ছন্ন থাকত। অধিবাসীরা সাধারণত উপকূল অঞ্চলে বসবাস করত। উপকূলভাগ ভগ্ন হওয়ায় অভ্যন্তরভাগে বহুদূর পর্যন্ত খাঁড়ি প্রবেশ করত। ফলে এ অঞ্চল নৌ চলাচল এবং মাছ ধরার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। এখানকার অধিবাসীর প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুপালন ও মৎস্যশিকার। সামান্য কৃষিকার্য অবশ্য ছিল, কিন্তু তাতে ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির ভরণপোষণ সম্ভব ছিল না। ফলে দুর্ভিক্ষ ও অনাহার এ দেশগুলির জনগণের চিরসাথী ছিল। উপরন্তু সমুদ্র নিকটবর্তী হওয়ার ফলে প্রথম থেকেই তারা নৌকা বা ছোটখাট জাহাজ নিয়ে নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে আক্রমণ চালাত। পরবর্তীকালে দলে দলে তারা সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া রাজনৈতিক কারণও তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করে। নবম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত নর্ম্যানরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করত। নবম শতাব্দীতে তাদের মধ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কতকগুলি গোষ্ঠীকে একত্রিত করে। এভাবে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের তিনজন স্বতন্ত্র রাজার অধীনে তিনটি পৃথক রাজ্য স্থাপিত হল। কিন্তু কয়েকটি গোষ্ঠী এ ধরনের অধীনতা স্বীকার করতে রাজি না হওয়ায় তাদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য দেশত্যাগ করতে বাধ্য হল।

নর্ম্যানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সুইডেনবাসী বাল্টিক সাগর অতিক্রম করে পূর্বদিকে রাশিয়ার উপর দিয়ে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পৌঁছাল। ডেনমার্কবাসী জার্মানির নদীগুলির মোহনায় তাদের ঘাঁটি তৈরি করে এবং ক্রমশ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে ফ্রান্সের উত্তরে অবস্থিত ব্রিটানির উপকূল পর্যন্ত পৌঁছায়। সবশেষে নরওয়েবাসী আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে আইসল্যান্ড ও গ্রিনল্যান্ডের দিকে অগ্রসর হয়।

নর্ম্যানদের প্রধান কাজ ছিল প্রথমত দস্যুবৃত্তি। যেখানে তারা উপস্থিত হত সেখানেই তারা লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে ত্রাসের সৃষ্টি করত। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল মঠ ও চার্চসমূহ। কেননা এগুলিতে প্রচুর ধনরত্ন সঞ্চিত ছিল। প্রথমদিকে নর্ম্যানরা প্রধানত গ্রীষ্মকালে অভিযানে বের হত এবং শীতের শুরুতেই লুটের সামগ্রী নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেত। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে নর্ম্যানরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে শীতকালেও বসবাস করতে আরম্ভ করল। এ জন্য তারা সেখানে দুর্ভেদ্য ও শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি করতে শুরু করল। এ ঘাঁটিগুলো থেকেই তারা চতুর্দিকে তাদের আক্রমণ-অভিযান পরিচালনা করত। প্রথমদিকে তারা কেবলমাত্র উপকূলবর্তী স্থানেই তাদের ঘাঁটি তৈরি করত। কিন্তু ক্রমশ তাদের সামরিক শক্তির কাছে ইউরোপবাসী পরাজয় বরণ করতে শুরু করল। উপকূলভাগ বার বার

www.pathagar.com

নর্ম্যানদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে লোকজন প্রাণভয়ে ভূখণ্ডের অভ্যন্তরভাগে পালাতে শুরু করল। নর্ম্যানরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে শহর ও গ্রামগুলির উপর আক্রমণ চালাতে লাগল।

নর্ম্যানদের যে দল পূর্বদিকে অভিযান শুরু করেছিল তাদের একটি শাখা বাল্টিক সাগর অতিক্রম করে যে ভূখণ্ডে পৌছায় পরবর্তীকালে তা রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদের দলপতি 'রুবিক' সর্বপ্রথম ফিন, ল্যাপ, এস্কিমো, লেট প্রভৃতি জাতিকে একত্রিত করে একটি রাজ্য স্থাপন করে। রুরিকের বংশধর পরবর্তী সাতশ' বছর পর্যন্ত সে দেশে রাজত্ব করেছিল। কথিত আছে, নভ্‌গরোদের স্থানীয় রুশ অধিবাসী নিজেদের অভ্যন্তরীণ কলহ দূর করার জন্য রুবিক ও নর্ম্যানদের ডেকে এনেছিল। রুরিক ও তার দলবল রাশিয়ার আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ইলম্যান হ্রদের ধারে নভগরদ এবং নিগার নদীর তীরে কিয়েভ শহর স্থাপন করে। এগুলি পরবর্তীকালে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্ব ও দক্ষিণে অভিযানকালে নর্ম্যানরা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত উপনীত হয়। কিন্তু বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সামরিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় থাকার ফলে এর উপরে নর্ম্যানদের আক্রমণ ফলপ্রসূ হয়নি। তবে বাইজেন্টীয়দের সংস্পর্শে আসার ফলে নর্ম্যানরা খ্রিস্টধর্ম ও সভ্যতার আলোক লাভ করে।

দশম শতাব্দীতে একদল নর্ম্যান ভল্গা নদীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের এক অংশের উপর আক্রমণ চালায়। বাল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পথটিতে নর্ম্যানরা স্থানে স্থানে তাদের বসতি স্থাপন করে এবং এভাবে স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে কনস্টান্টিনোপল ও আরও পূর্বদিক পর্যন্ত একটি দীর্ঘভ্রমণ ও বাণিজ্য পথ তৈরি হয়। উত্তরের দেশগুলি থেকে আগত তীর্থযাত্রীগণ প্যালেস্টাইনে পৌছবার জন্য এ পথটিই ব্যবহার করত।

পশ্চিমদিকে নর্ম্যানদের অভিযান শুরু হয় ৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। তারা প্রথমে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের হেব্রাইডিস্ ওর্কনি ও শেটল্যান্ড দ্বীপে বসতি স্থাপন করে। সেখান থেকে তারা স্কটল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। একশত বছরের মধ্যে নর্ম্যানদের বসতি এসকল স্থান একত্রিত হয়ে একটি রাজ্যে পরিণত হয়। নবম শতাব্দীতে নর্ম্যানরা আইসল্যান্ড ও দশম শতাব্দীতে গ্রিনল্যান্ড দখল করে। খ্রিস্টীয় ১০০০ অব্দে তারা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে গিয়ে পৌছায়। সেখানে তারা উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

পশ্চিমে অভিযানকারী নর্ম্যানদের একটি শাখা ডেনিস্ বা দিনেমার (ডেনমার্কবাসী) নামে পরিচিত ছিল। ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে এরা প্রথম ইংল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে তাদের আক্রমণ চালায়। এদের আক্রমণ ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে দিনেমাররা ইংল্যান্ডের উপকূলে তাদের প্রথম বসতি স্থাপন করে। তারা প্রথমে নর্দামব্রিয়া দখল করে। পরে পূর্ব অ্যাঙ্গলিয়া ও ফেন আক্রমণ ও ধ্বংস করে। এখানকার বিখ্যাত মঠগুলি লুণ্ঠন করার পর তারা পূর্ব অ্যাঙ্গলিয়ার রাজা এডমান্ডকে হত্যা করে। ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মার্সিয়ার রাজা দিনেমারগণকে প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়ে ও তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিজের রাজ্যকে রক্ষা করেন বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দিনেমাররা টেম্‌স নদীর উত্তর দিকের সমস্ত ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব অ্যাঙ্গলিয়ার দিনেমার রাজা ওয়েসেক্স আক্রমণ করেন। ওয়েসেক্স-এর রাজা অ্যালফ্রেড দি গ্রেট যুদ্ধে দিনেমারদের পরাজিত করতে শেষপর্যন্ত সক্ষম হলেও টেম্‌স-এর উত্তরের অর্ধেক অংশ তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ওয়েডমোরের চুক্তি (৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) অনুযায়ী প্রদত্ত দিনেমারদের অধীনে এই ভূখণ্ডের নাম হল ডেন ল। দিনেমাররা এরপর খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয় এবং ক্রমশ ইংল্যান্ডবাসীর সঙ্গে মিশে যেতে শুরু করে।

ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের উপরে নর্ম্যানদের আক্রমণ শার্লামেনের রাজত্বের সময় থেকেই শুরু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে এই আক্রমণ প্রতি বছরই সংঘটিত হয়। ক্রমশ এদের আক্রমণ এত

www.pathagar.com

ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করে যে, শার্লামেনের দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ তা প্রতিহত করতে না পেরে তাদের অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন। ফল হল এই যে, প্রতিবছর আরও অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে এদের আগমন ঘটতে শুরু হল। অবশেষে দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে পশ্চিম ফ্রাঙ্ক (ফ্রান্স) রাজ্যের রাজা চার্লস দি সিম্পল নর্ম্যান নেতা রলোকে তার রাজ্যের একটি অংশ নর্ম্যানদের স্থায়ী বসবাসের জন্য দান করেন। নর্ম্যানদের বাসভূমি ফ্রান্সের উত্তরের এই ভূখণ্ড তাদের নামানুসারে নর্ম্যান্ডি নামে পরিচিত হয়। ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই নর্ম্যান্ডির ডিউক প্রথম উইলিয়াম ইংল্যান্ড আক্রমণ করে সমগ্র দেশটি অধিকার করে নেন।

একাদশ শতাব্দী থেকে ক্রমশ নর্ম্যানদের আক্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটতে থাকে। এর পিছনে দুটি কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে তাঁরা তাদের হিংস্র আক্রমণাত্মক ভাব পরিত্যাগ করে ক্রমশ সভ্য জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রথম দিকে যদিও খ্রিস্টান চার্চ, মঠ ও ধর্মযাজকদের প্রতি তাদের তীব্র বিদ্বেষ ছিল এবং এ সব ধ্বংস করেই তারা অতীব আনন্দ লাভ করত, তথাপি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে তাদের মধ্যে একটি পরিবর্তনের সূচনা হয়। দ্বিতীয়ত, সামন্তপ্রথার অভ্যুদয় নর্ম্যানদের আক্রমণের অবসান ঘটাতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। সামন্ত প্রভুদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি ও তাদের অশ্বারোহী বর্মসজ্জিত সৈন্যদল সফলভাবে নর্ম্যান আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে নর্ম্যানরা নিজেরাই সামন্তপ্রভুতে পরিণত হয় এবং অন্য রাজ্য আক্রমণ অপেক্ষা নিজ রাজ্যের কৃষকদের শোষণ করাকেই তারা অধিকতর লাভজনক মনে করে। এভাবে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপে নর্ম্যান আক্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইউরোপের ইতিহাসে নর্ম্যানদের আক্রমণের ফলাফল ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা সত্য যে নর্ম্যানদের আক্রমণ ইউরোপে আর একবার ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা করেছিল। নরহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে নর্ম্যানরা বর্বরদের আক্রমণের ক্ষতকে পুনরায় উজ্জীবিত করে তোলে। তবে সেটা একটি দিক মাত্র। মধ্যযুগে সামন্তপ্রথার আবির্ভাবের প্রাক্কালে সমগ্র পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে যে স্থবিরতার সৃষ্টি হয় নর্ম্যান আক্রমণ সে স্থবির অবস্থার, সে জড় ভাবের অবসান ঘটিয়ে ইউরোপের জনগণকে অনেকখানি সচল করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়, নতুন রক্তের ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নব নব জাতির উন্মেষের সূচনা করেছিল নর্ম্যানদের আগমন।

নর্ম্যানরাই ইউরোপকে আবিষ্কার করেছে, ইউরোপবাসীরা তাদের আবিষ্কার করে নি। সেক্ষেত্রে নতুন লোকের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা নর্ম্যানদের প্রচুর ছিল। একদিকে ইউরোপকে যেমন তারা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দান করেছে, অন্যদিকে ইউরোপবাসীর নিকট থেকে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করেছে। কিন্তু নর্ম্যানদের দানের ভাগই ছিল বেশি। সমুদ্র-অভিযানকারী নর্ম্যানরা তাদের নৌবিদ্যার কলাকৌশল শিখিয়েছে ইউরোপবাসীকে। সমুদ্রপথে নর্ম্যানদের অভিযান ইউরোপের বাণিজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে। প্রত্যেকটি গমনপথের দুধারে নর্ম্যানরা গড়ে তুলেছে বাণিজ্য বন্দর ও সুদৃশ্য নগরী। অন্যদিকে নর্ম্যানদের সাহিত্য বিশেষত তাদের পৌরাণিক উপাখ্যান বা সাগা (Saga) মধ্যযুগের ইউরোপের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়েও নর্ম্যানদের অবদান ছিল যথেষ্ট। ইংল্যান্ডে নর্ম্যান রাজা বিজয়ী উইলিয়ামের রাজত্বকালেই প্রথম ইংল্যান্ডে সামন্তপ্রথার প্রবর্তন করেন। রাশিয়াতেও প্রথম রাজ্য গড়ে তোলে নর্ম্যানরা। এবং সর্বশেষে ফ্রান্সে গলবাসী ও নর্ম্যানদের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে একটি উচ্চ সাংস্কৃতিক মানসম্পন্ন জাতি যারা মধ্যযুগের ইউরোপের সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল।

www.pathagar.com

সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব

সামন্ততন্ত্রের পরিচয়

সামন্তপ্রথার অভ্যুদয় মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সামন্ততন্ত্র শুধু ইউরোপেই গড়ে ওঠেনি, পৃথিবীর আরো অনেক দেশে দেশে ঠিক একই রূপ নিয়ে না হলেও কাছাকাছি রূপ নিয়ে সামন্তপ্রথার আবির্ভাব ঘটেছিল।

ইউরোপে সামন্তপ্রথার উৎপত্তি কাল খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত; এশিয়ার চীন দেশে ৩য় শতাব্দী, ভারতে ৪র্থ ও ৫ম শতক, এবং আরব দেশে ৯ম-১০ম শতাব্দী থেকে সামন্তপ্রথার উৎপত্তি শুরু হয়।

দশম শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বৃহৎ ভূস্বামীদের দখলে চলে যায়। কৃষিযোগ্য ভূমি, বনজঙ্গল, পতিত জমি, নদীনালা, খালবিল—ভূখণ্ডের সংলগ্ন এ সমস্ত কিছুর মালিক হয়ে পড়লেন সামন্তপ্রভুরা। এদের অধীনে অগণিত কৃষককুল যে সকল জমি চাষাবাদ করত, বিনিময়ে উৎপাদিত ফসলের বিরাট অংশ সামন্তপ্রভুদের দিতে হত। সামন্তপ্রভুর অধীনস্থ এ কৃষকদের জমির উপর কোনো স্বত্ব থাকত না।

প্রত্যেক সামন্তপ্রভুর অধীনস্থ ভূখণ্ডকে ফিউড (Feud) বলা হত। ফিউড বলতে সামন্ত পদও বোঝায়। এই ফিউড শব্দ থেকে ফিউডাল (সামন্ত) শব্দের উৎপত্তি। জমির মালিকানা কার হাতে তা থেকেই সামন্ত সম্পর্ক স্থির করা হত।

সামন্ত প্রথার তত্ত্ব অনুযায়ী রাজাই সমস্ত ভূখণ্ডের মালিক। তবে, রাজা জমির অধিকাংশ তার অধীনস্থ সামন্তপ্রভুদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন কতকগুলি শর্তের বিনিময়ে। রাজার কাছ থেকে জমি পেতেন ডিউক, কাউন্ট, আর্ল, মারগ্রেভ প্রভৃতিরা। তাদের বলা হত টেনান্ট্স্-ইন-চিফ। এঁরা আবার তাঁদের জমির অধিকাংশ বিতরণ করতেন ব্যারন, ভাইকাউন্ট প্রভৃতির কাছে। এ ভাবে ধাপে ধাপে ক্রমশ জমি বিতরণ কার্য সম্পন্ন হত। সর্বনিম্ন পর্যায়ে যিনি জমি পেতেন তাঁকে বলা হত নাইট। নাইটের জমি আর বিতরণ করা যেত না।

এই জমি বিতরণ কার্যে যিনি জমি দিতেন তিনি ছিলেন লর্ড ও যিনি জমি পেতেন তাঁকে বলা হত ভ্যাসাল। ভ্যাসালকে বাংলায় সামন্ত বলা চলে।

সামন্ত তত্ত্ব অনুযায়ী রাজা ব্যতীত সকল সামন্তপ্রভুই কারো না কারো ভ্যাসাল; এবং নাইট ছাড়া সকল সামন্তপ্রভুই কারো না কারো লর্ড। এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রমও সর্বদা পরিলক্ষিত হত। একই ভ্যাসাল এমন অনেক সামন্তপ্রভুর কাছ থেকে জমি নিতেন যাঁদের সবাই এক সামন্ত পদমর্যাদা ভুক্ত হতেন না। অনেকে হয়ত সেই ভ্যাসালেরই মত একই পদমর্যাদাসম্পন্ন। অনেক সামন্ত ভ্যাসাল আবার এমন প্রভুর কাছ থেকে জমি নিতেন যাঁদের কাছ থেকে তাঁর অন্যান্য সামন্তপ্রভুরাও জমি নিয়েছেন। আবার সামন্তপ্রথায় যদিও রাজা কারও ভ্যাসাল হতে পারতেন না, তথাপি ইংল্যান্ডের রাজা দীর্ঘদিন ফ্রান্সের রাজার ভ্যাসাল হয়েছিলেন।

সামন্তপ্রথার নিয়মগুলি ইউরোপের সব দেশে একইভাবে প্রচলিত ছিল না। একমাত্র ফ্রান্সেই এর সবদিকগুলি পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করেছিল।

লর্ড এবং ভ্যাসাল উভয়েরই উভয়ের প্রতি কর্তব্য ছিল। লর্ডের প্রধান কর্তব্য ছিল বহিঃশত্রু বা অন্যান্য লর্ডের আক্রমণ থেকে তার ভ্যাসালকে রক্ষা করা; ভ্যাসাল-এর মৃত্যু ঘটলে তার নাবালক সন্তানদের অভিভাবক হওয়া ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং ভ্যাসাল তার কর্তব্য

www.pathagar.com

পালন না করলে নিজস্ব আদালতে তার বিচার সম্পন্ন করে তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা বা অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ভ্যাসাল-এর সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল অস্ত্র ও বর্মসজ্জিত অশ্বারোহী সামরিক বাহিনী লর্ডকে সরবরাহ করা; যুদ্ধে লর্ডকে অনুসরণ করা ও লর্ড বন্দী হলে মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করা; এবং লর্ডের আদালতে তাঁকে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে সাহায্য করা। এছাড়া লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাইট উপাধিতে দীক্ষিত হওয়ার অনুষ্ঠানের এবং জ্যেষ্ঠ্যা কন্যার বিবাহের খরচের একটি প্রধান অংশ বহন করাও ভ্যাসাল-এর অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। জমির বিতরণ কার্যটি সম্পন্ন হত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তাকে বলা হত হোমেজ (Homage)। লর্ডের সামনে খালি মস্তকে নতজানু হয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ প্রভুর পায়ের দিকে হস্ত প্রসারিত করে ভ্যাসাল চিরদিন তাঁর অনুগত হয়ে থাকার প্রতিজ্ঞা করত। প্রভু তার মস্তক চুম্বন করে তাকে তার নিজ জমি দিয়ে দেয়ার কথা ঘোষণা করে তাকে চিরদিন নিরাপত্তা দেয়ার নিশ্চয়তা দিতেন। জমি পাওয়ার সাথে সাথে ভ্যাসাল তার প্রভুর কাছ থেকে কতকগুলি স্বাধীনতা লাভ করত; নিজের ভূখণ্ডে ভ্যাসাল ইচ্ছামত সৈন্য মোতায়েন রাখা, প্রজাদের উপর কর আরোপ করা ও জরিমানা ধার্য করা এবং নিজস্ব আদালত স্থাপন করে প্রজাদের বিচার করার স্বাধীনতা লাভ করত। এবং এ ধরনের কার্য সম্পাদনে লর্ড কখনই হস্তক্ষেপ করতেন না। লর্ডের কাছ থেকে প্রাপ্ত জমি ভ্যাসাল আমৃত্যু ভোগ করতে পারত। শুধুমাত্র সামন্তপ্রভুর কর্তব্য সম্পাদনে অবেহলা দেখালেই এ জমি থেকে ভ্যাসাল বঞ্চিত হতে পারত। ভ্যাসাল-এর মৃত্যুর পর জমি পুনরায় সমান্তপ্রভু ফিরে পেতেন এবং ইচ্ছা করলে সামন্তপ্রভুর সে জমি পূর্বতন ভ্যাসাল-এর ছেলেকে বা অন্য কাউকে দিতেন। সামন্ত ব্যবস্থায় রাজার ক্ষমতাই ছিল সবচেয়ে কম। রাজার নিজস্ব কোনো সৈন্য ছিল না। রাজার প্রত্যক্ষ ভ্যাসালগণই রাজাকে সৈন্য সরবরাহ করতেন। শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত ব্যাপারে একমাত্র প্রত্যক্ষ ভ্যাসাল ছাড়া আর কারও উপর রাজার কোনো ক্ষমতা ছিল না। এই ভ্যাসালগণ রাজাকে কর দিতেন। এ ছাড়া রাজ্যের অন্য প্রজাদের উপরও রাজার কর আরোপের ক্ষমতা ছিল না। মধ্যযুগের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে কোনো সাধারণ প্রজার পক্ষে রাজার কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। উপরন্তু শার্লামেনের মৃত্যুর পরে দুর্বল ফ্রাঙ্ক রাজাদের ক্ষমতা ছিল না সামন্তপ্রভুদের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করা। কাজেই সব ব্যাপারে সামন্তপ্রভুগণ ছিলেন স্বাধীন এবং এদের হাতের পুতুল হয়েই রাজাকে চলতে হত।

রাজা থেকে শুরু করে নাইট পর্যন্ত সকল সামন্তপ্রভুই একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ছিল। এরা ছিল শাসক ও শোষকশ্রেণী। এদের বিপরীত দিকে ছিল একদল বিত্তহীন কৃষককুল সামন্তপ্রভুর জমিতে চিরকালের জন্য বাঁধা। এদের বলা হত সার্ফ বা ভূমিদাস।

প্রত্যেক সামন্তপ্রভুর অধীনস্থ ভূখণ্ড কতগুলি ম্যানরে বিভক্ত থাকত। ম্যানরের কোনো নির্দিষ্ট আকার ছিল না। তবে কোনো ম্যানরই ৩০০ থেকে ৪০০ একরের কম হত না। প্রত্যেকটি ম্যানর ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কৃষিকার্য থেকে শুরু করে মানুষের জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য সকল প্রকার পণ্য উৎপাদন কার্য এখানে সম্পন্ন হত।

ম্যানরের একদিকে থাকত সামন্তপ্রভুর দুর্গ ও দুর্গসংলগ্ন আবাদযোগ্য সর্বোৎকৃষ্ট জমি; কিছু দূরে থাকত চার্চ ও চার্চসংলগ্ন আবাদ জমি, বনভূমি ও চারণভূমি (যার উপর জমিদারের দখলই ছিল সর্বাধিক); আর সম্মানজনক দূরত্বে থাকত কৃষকদের বাসগৃহ ও চাষের জমি।

সমগ্র আবাদযোগ্য ভূমিকে চাষাবাদের সুবিধার্থে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হত : (ক) বসন্তকালীন আবাদভূমি, (খ) শরৎকালীন আবাদভূমি ও (গ) পতিতভূমি। এই ভূমি খণ্ডগুলিকে

www.pathagar.com

প্রতি বৎসর অদল-বদল করে চাষ করা হত। যেমন, এক বছরের বসন্তকালীন আবাদভূমি পর বছর শরৎকালে চাষ করা হত, শরৎকালের আবাদভূমি পতিত রাখা হত উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ও পতিত ভূমিকে বসন্তকালে আবাদ করা হত। পর বছর আবার অন্যভাবে ভূমি আবাদ করা হত। এভাবে প্রতি বছর এক-এক ঋতুতে এক-এক ভাগ জমি চাষ করার ফলে জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেড়ে যেত। সামন্ত যুগের এ আবাদ পদ্ধতিকে বলা হত তিন ভাগের ব্যবস্থা।

সামন্তপ্রথায় উৎপাদনের কাজে সামন্তপ্রভুদের কোনো ভূমিকা ছিল না। উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত ছিল কেবল কৃষকগণ। আর জমির মালিক ছিল জমিদার এবং উৎপন্ন ফসলের বিরাট অংশ তারাই পেত।

জমিদার ও তাদের পরিবার ও আশ্রিতবর্গ, চার্চের যাজক সম্প্রদায়, ম্যানরের কর্মচারীবৃন্দ, মঠের সন্ন্যাসীদল, ক্ষুদ্র উৎপাদক ও হস্তশিল্পীবৃন্দ প্রভৃতিদের বাদ দিলে এই কৃষকদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। কৃষকদের মোটামুটি চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হত : ভিলেন, সার্ফ, ক্রফটার ও কটার।

প্রথমে অবশ্য ভিলেন ও সার্ফদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও পরবর্তীকালে এই পার্থক্য লোপ পায়। প্রথমদিকে ভিলেনরা ছিল ক্ষুদ্র কৃষক, যারা অবস্থার দুর্বিপাকে ভূমিখণ্ডটুকু অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকের হাতে সমর্পণ করে তার আজ্ঞাবহ কৃষকে পরিণত হয়। সার্ফদের পূর্বপুরুষরা পুরো গ্রাম সমেত কোন ধনী সামন্তপ্রভুর দখলে চলে যায়। ভিলেনরা ছিল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, জমির সাথে তারা চিরকাল বাঁধা ছিল না। কিন্তু এক-একটি ম্যানর প্রভুর হাত বদলের সাথে সাথে সার্ফরাও জমি সমেত নতুন প্রভুর হাতে গিয়ে পড়ত। জমি ছেড়ে তাদের চলে যাওয়ার কোন অধিকার ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ভিলেন ও সার্ফদের এই পার্থক্য দূরীভূত হয় এবং তারা মোটামুটি একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। তখন তারা বিভিন্ন প্রকার খাজনার বিনিময়ে জমির উপর সীমিত ধরনের মালিকানা স্বত্ব লাভ করে।

ক্রফটার ও বোর্ডার বা কটারগণের ছিল আরও হীনাবস্থা। তাদের নিজস্ব কোনো জমি ছিল না। ভূমিহীন এ সমস্ত কৃষক প্রভুর কাছ থেকে একখণ্ড জমি নিয়ে তার বিনিময়ে প্রভুর জমিতে বেগার খাটত।

এভাবে একশ্রেণীর লোক সামন্তপ্রভুর ভূমিদাসে পরিণত হয়ে প্রভুর সেবায় তার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করল। বিনিময়ে প্রভু তাকে এটুকু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি কৃষকদের সকল রকম বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং তাকে তার জমি থেকে কখনই বঞ্চিত করবেন না।

সামন্তপ্রথার উৎপত্তির কারণ

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপব্যাপী যে অরাজকতা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে প্রধান অভাব দেখা দিল নিরাপত্তার। রোমে কেন্দ্রীয় সরকার ভেঙে পড়ছিল। দাস মালিকদের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ দাসদের বিদ্রোহ, সরকারী কর্মচারীদের উৎপীড়নে নাগরিকদের পলায়ন এবং সর্বোপরি বর্বরদের আক্রমণ—এসবের প্রেক্ষিতে জনজীবনে যে ভীষণ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল তাতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। সে-ক্ষেত্রে জনগণ এমন কোনো ব্যক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করছিল যে তাকে অন্তত কিছুটা নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও স্বাধীন কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক সকলেরই আশ্রয় ছিল নিকটবর্তী কোনো বৃহৎ ভূস্বামীর নিকট— যে তার নিজস্ব শক্তির সাহায্যে তাকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম।

www.pathagar.com

অন্যদিকে সর্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তাতে প্রাচীন যুগের দাসপ্রথা অচল হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে বৃহদায়তন কৃষি কিংবা শহরে কারখানা, কোথাও দাসপ্রথা আর লাভজনক ছিল না। সাধারণভাবে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ব্যাপকহারে উৎপাদিত পণ্যের বাজারই লোপ পেয়েছিল।

এই আর্থিক অরাজকতার দিনে কৃষির পুনর্বিন্যাস ছাড়া ভূস্বামীদের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ার ফলে বড় বড় লাটিফান্ডিয়া বা কৃষিখামারে শস্য উৎপাদন আর লাভজনক থাকে না। এ অবস্থায় বিপুলসংখ্যক ক্রীতদাসের ভরণ-পোষণ ভূস্বামীদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ফলে লাটিফান্ডিয়াগুলো ভেঙে সেখানে ছোট ছোট জমিতে প্রজা বসানো শুরু হয়। করভার এড়াবার জন্য ভূস্বামীরা গ্রামে চলে গিয়ে সুবিধামতো দুর্গ বা ভিলা তৈরি করে সেখানে থেকে কৃষি পরিচালনা করতে থাকে। শোষণের ধরনও তখন পাল্টে যায়। সাধারণ দাস শ্রমে কৃষিকার্য না চালিয়ে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলে ভাগ বসানো তাদের কাছে অধিক লাভজনক মনে হয়।

এ সময়ে দুধরনের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। প্রথম ব্যবস্থায় স্বাধীন ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ নিজের ভূমিখণ্ডটুকু ভূস্বামীকে দিয়ে তার আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে এবং পরে ভূস্বামী তাকে সেই ভূখণ্ডটি চাষাবাদের জন্য ব্যবহার করতে দেয়। এ-ক্ষেত্রে জমিতে উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষক ভূস্বামীকে দিতে স্বীকৃত হয়। জমি ভোগ ও ব্যবহার করার অনুমতি পেলেও জমির মালিকানা থাকে ভূস্বামীর হাতে এবং ভূস্বামী ইচ্ছা করলে কৃষককে যে-কোনো সময়ে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। এ-ধরনের ভূমি ব্যবস্থাকে বলা হত প্রিকেরিয়াম (Precarium) প্রথা। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে এসব কৃষক ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন থাকলেও জমির সাথে আটকা পড়ে এবং এ অবস্থা তাদের বংশধরদের মধ্যে পর্যবসিত হয়। ক্রমে সমস্ত চাষীই এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ ধরনের চাষীরাই পরবর্তীকালে ভিলেন ও সার্ফ-এ পরিণত হয়।

দ্বিতীয় প্রথার নাম ছিল প্যাট্রোসিনিয়াম (Patrocinium) প্রথা। ভূমিহীন কৃষক, বেকার শ্রমিক, সদ্যমুক্ত বা পলাতক ক্রীতদাস হয়তো কোনো ভূস্বামীর নিকট আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। এ ক্ষেত্রে ভূস্বামী তাকে একখণ্ড ছোট বাগান বা এক টুকরো জমি চাষের জন্য দিয়ে দেয়। বিনিময়ে তাকে ভূস্বামীর জমিতে সপ্তাহের কয়েকদিন বেগার খাটতে হত। এ-ধরনের কৃষকগণই পরবর্তীকালে কটার বা বোর্ডারে পরিণত হয়।

এভাবে সকল কৃষকই স্বাধীনতা হারিয়ে জমিদারের ভূমিদাসে পরিণত হল বটে, কিন্তু তবু তারা এক ধরনের নিরাপত্তা লাভ করল যা রোমান ক্রীতদাসগণ কখনও পায় নি। ক্রীতদাসদের মতো ভূমিদাসদেরকে তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেত না এবং সর্বোপরি তাদের জমি থেকে বঞ্চিত করা যেত না। ক্রীতদাসদের থেকে ভূমিদাসদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটেছিল এই কারণে যে, তারা অন্তত তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারত এবং যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন একখণ্ড জমি ও একটি কুঁড়েঘর চাষ করা ও বাস করার জন্য লাভ করত।

উপরোক্ত ভিলাগুলিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে মৌজা বা ম্যানর গড়ে ওঠে; ম্যানরগুলি ক্রমে স্বনির্ভর অর্থনীতির দিকে মোড় নেয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই প্রতিটি ম্যানরে কামার, কুমার, তাঁতী, ছুতোর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারিগর প্রতিপালিত হতে থাকে। এভাবে মুদ্রা নির্ভর নগরভিত্তিক অর্থনীতি ধসে পড়ে এবং নতুন পাথরের যুগের মতো স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির উদয় হয়। আপাতদৃষ্টিতে এটা পশ্চাৎগতি মনে হলেও এছাড়া আর উপায় ছিল না। রোমান সভ্যতার

www.pathagar.com

পতনের ফলে দাস অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল কিন্তু নতুন উৎপাদন প্রথার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত গ্রামীণ জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু লোহার ব্যাপক ব্যবহার (যা দাসযুগেও হয়নি) ও উন্নত ধরনের কৃৎকৌশলের সাহায্যে গড়ে ওঠা এ সামন্ততান্ত্রিক গ্রামগুলি নিঃসন্দেহে নতুন পাথরের যুগের গ্রাম অপেক্ষা অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধশালী ছিল। জার্মানদের আগমন ইউরোপে সামন্তপ্রথার অভ্যুদয়ে একধাপ অগ্রগতি সাধন করে।

সমগ্র জার্মান জাতির মধ্যে একমাত্র ফ্রাঙ্করাই মোটামুটিভাবে একটি স্থায়ী রাজ্য গঠনে সক্ষম হয়। ফ্রাঙ্করা যখন পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করে তখন প্রিকেরিয়াম ও প্যাট্রোসিনিয়াম প্রথা প্রচলিত ছিল। ইচ্ছা করলে ফ্রাঙ্করা এ ধরনের বেআইনী প্রথার অবসান ঘটাতে পারত। কিন্তু তা না করে বরং তারা নিজেরাই এ প্রথা গ্রহণ করে। কারণ ফ্রাঙ্কদের মধ্যে একই ধরনের প্রথা বিদ্যমান ছিল। এ ধরনের একটি প্রথার নাম ছিল কমিটেটাস (Comitatus)। সেনাধ্যক্ষ ও তার অধীনস্থ সৈন্যদের মধ্যে যে ধরনের পারস্পরিক কর্তব্য ও আনুগত্যের সম্পর্ক থাকে কমিটেটাস সে ধরনের প্রথা; অতএব একই ধরনের প্রিকেরিয়াম ও প্যাট্রোসিনিয়াম পদ্ধতি গ্রহণে ফ্রাঙ্কদের কোনো অসুবিধা ছিল না। বিজিত রাজ্যে বিরাট বিরাট ভূখণ্ড দখল করে তারা নিজেরাই এ প্রথাগুলোর অনুসরণে বিপুল সংখ্যক কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করে।

ক্লভিসের মৃত্যুর পর যখন মেরোভিঞ্জিয়ান রাজ্য তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের হাতে গিয়ে পড়ে, তখনই সামন্তপ্রথার দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে। দুর্বল ও অকর্মণ্য মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাদের সাধ্য ছিল না একটি সক্ষম কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করার। সে-ক্ষেত্রে নিজ নিজ এলাকার সামন্তপ্রভুরাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। এমনকি চার্চগুলি পর্যন্ত এক-একটি বিরাট সামন্তপ্রভুতে পরিণত হয়। চার্চ ও মঠগুলির কর্মাধ্যক্ষগণ জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমি প্রাপ্ত হন আবার তাদেরকে সে জমিরই ভূমিদাসে পরিণত করেন। এভাবে প্রতিটি চার্চ ও মঠ বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়।

সামন্ত প্রথা এভাবে ক্রমশ চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। সাথে সাথে তার প্রকৃতিগত পরিবর্তনও চলতে থাকে। রোমান প্যাট্রোসিনিয়াম ও প্রিকেরিয়াম প্রথার সাথে জার্মান কমিটেটাস প্রথাও যুক্ত হয়। কমিটেটাস প্রথা থেকেই উৎপত্তি হয় সামন্তপ্রথার লর্ড ও ভ্যাসাল-এর সম্পর্ক। সামন্তপ্রথার যে 'হোমেজ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভ্যাসাল তার সামন্তপ্রভুর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে সে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিও কমিটেটাস প্রথা হতে উদ্ভূত।

শুধু সামরিক কর্তব্যের সম্পর্কই তখন গড়ে ওঠেনি। এটা গড়ে ওঠে যখন অষ্টম শতাব্দীতে স্যারাসিন বা মুসলিমরা ফ্রাঙ্ক রাজ্য আক্রমণ করে। স্পেনের মুসলমানরা তাদের সুলতান দ্বিতীয় আবদুর রহমানের নেতৃত্বে যখন পিরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে গলে (ফ্রান্সে) প্রবেশ করে তখন অশ্বারোহী মুসলিম সেনাবাহিনার মোকাবিলা করার মতো শক্তি পদাতিক ফ্রাঙ্ক সৈন্যদের ছিল না। অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার মতো অর্থও ফ্রাঙ্ক রাজাদের ছিল না। কারণ, দুর্নীতিপরায়ণ মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাদের হাতে রাজকোষ পূর্বেই শূন্য হয়ে যায়। তখন মেরোভিঞ্জিয়ান রাজ্যের প্যালেসের মেয়র চার্লস মার্টেল রাজার আদেশে চার্চসংলগ্ন বিরাট ভূখণ্ডগুলি বাজেয়াপ্ত করে নেন। এগুলি সঙ্গে সঙ্গে এমন সব অনুগত ভূস্বামীর মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হয় যারা রাজাকে অশ্বারোহী, অস্ত্র ও বর্মসজ্জিত সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। সামন্তপ্রভুদের দ্বারা সংগৃহীত এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে চার্লস মার্টেল মুসলিমদের ফ্রাঙ্ক রাজ্য থেকে সরিয়ে দেন। এর পর থেকেই লর্ডকে সৈন্য সাহায্য করা ভ্যাসাল-এর একটি কর্তব্যরূপে পরিগণিত হয় এবং সামরিক দায়িত্ব পালন সামন্তপ্রথার একটি বিশেষ অঙ্গরূপে গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

ক্যারোলিঞ্জিয়ানদের সময়ে সামন্তপ্রথা পরিপূর্ণরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও শার্লামেনের অসামান্য প্রভাব ও অপরিসীম ক্ষমতার বলে একটি কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য সমগ্র ইউরোপে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তা ভেঙে পড়ে। শার্লামেনের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে স্থানীয় ডিউক, কাউন্ট বা মারগ্রেভগণ (যাঁরা ছিলেন শার্লামেনের নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী) প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিন্দুমাত্র আনুগত্য প্রদর্শন না করে স্বাধীন সামন্তপ্রভুর ন্যায় আচরণ শুরু করেন। ঠিক এ সময়েই শুরু হয় ব্যাপক বৈদেশিক আক্রমণ। স্লাভ, অ্যাভার, হাঙ্গেরিয়ান, ম্যাগায়ার, সারাসিন ও সর্বোপরি নর্ম্যানদের আক্রমণের মুখে সামন্ত প্রথাই ইউরোপের একমাত্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থারূপে গড়ে ওঠে।

সামন্তযুগে কৃষকদের অবস্থা

সামন্তযুগের সকল কৃষকদের মোটামুটি একটি নামে অভিহিত করা চলে—সার্ফ বা ভূমিদাস। এরাই ছিল সমাজের মূল উৎপাদক শ্রেণী। অভিজাত সামন্ত আর যাজক-সম্প্রদায় টিকে ছিল এদের শোষণ করে। প্রথম দিকে প্রজাপালন এবং অপরাপর যে সকল জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব সামন্ত রাজারা পালন করতেন পরবর্তীকালে তা লোপ পায় এবং প্রজাপীড়ন অবিরতই বাড়তে থাকে। সামন্তযুগের শেষের দিকে এ অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। চাষীকে মনে করা হত লাভের উপকরণ পশুবিশেষ, তা সে যার প্রজাই হোক না কেন—রাজার বা সামন্তের অথবা যাজকের।

কৃষকদের উপর নানা ধরনের ট্যাক্স বা কর বসানো হত। প্রথম ধরনের ট্যাক্সের নাম ক্যাপিট্যাশিও (Capitatio)। সার্ফের পরিবারের প্রত্যেক লোকের উপর মাথাপিছু এই ট্যাক্স বসানো হত।

চাষীর জমির উৎপন্ন ফসলের একটি বিরাট অংশ জমিদারকে দিতে হয়। এর নাম টেইলি (Taille) বা মেটায়েজ (Matayage)। শুধু ফসলই নয় খামারের হাঁস-মুরগি, ডিম, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ ও মাংস প্রভৃতির অংশও ছিল জমিদারের প্রাপ্য।

কৃষকের জমিতে উৎপাদিত গম বা আঙ্গুর জমিদারের কলে পেশা হত, কারণ গম ভাঙার কল বা আঙ্গুর পেশার মেশিন জমিদারেরই ছিল। কাজেই এর একটা অংশ ছিল জমিদারের প্রাপ্য। ম্যানরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কোনো নদী বা খাল এবং রাস্তার উপর ছিল জমিদারেরই অধিকার; অতএব ফসল নিয়ে এগুলো পার হতে গেলে ফসলের কিছু অংশ জমিদারের পেয়াদা নিয়ে যেত। হাটে ফসল বিক্রি করতে গেলে সেখানেও জমিদারের পেয়াদাকে খাজনা দিতে হত। এ ধরনের ট্যাক্সকে বলা হত বেনালাইটিস (benalites)।

চাষীর ফসল ঘরে ওঠার সময়ে জমিদার তার দলবল নিয়ে এক ম্যানর থেকে আর এক ম্যানরে খাজনা আদায়ে বের হতেন। তখন কৃষকের বাড়িতে অবস্থান করার সময়ে জমিদার ও তার লোকজনকে জমিদারী কায়দায় আপ্যায়ন করার ভার থাকত কৃষকের উপর। জমিদারের ঘোড়া ও কুকুরদেরও আপ্যায়ন করতে হত। এ ধরনের ট্যাক্সকে বলা হত প্রেসটেশন (prestation)।

এছাড়া সপ্তাহে তিন অথবা চারদিন চাষীকে জমিদারের জমিতে বিনা মজুরিতে কাজ করতে হত। শুধু ক্ষেতের কাজই নয়; রাস্তা বানানো, পুল তৈরি বা মেরামত ইত্যাদি যে-কোনো কাজে জমিদার তলব করলেই চাষী বেগার খাটতে বাধ্য থাকত। এ ধরনের বেগার খাটাকে বলা হত কর্ভি (corvee)। জমিদারের ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে অধিকাংশ সময়েই চাষী নিজের ক্ষেতের কাজ ঠিকমতো করতে পারত না। বীজ বপনের সময়ে বা ফসল তোলার সময়ে কৃষকরা

www.pathagar.com

জমিদারের কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে অধিকাংশ সময়েই চাষীর নিজের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হত। কিন্তু ফসল ফলুক বা না ফলুক জমিদারের খাজনার হাত থেকে কৃষকের রেহাই নেই। জমিদার ছাড়া চার্চকেও এক প্রকার কর দিতে হত প্রজাদের। এর নাম ছিল টাইথ (tithe)। চার্চগুলিও প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক ছিল। চার্চের ধর্মযাজক ও জমিদার উভয়ে মিলেই কৃষককে শোষণ করত।

সামন্তপ্রভুর মেয়ের বিবাহে বা জ্যেষ্ঠপুত্রের নাইট উপাধিতে দীক্ষিত হওয়া উপলক্ষেও প্রজারা জমিদারকে খাজনা দিতে বাধ্য থাকত। জমিদারের অনুমতি ছাড়া কৃষক তার কন্যার বা পুত্রের বিবাহ দিতে পারত না। এ উপলক্ষে চাষীর পক্ষ থেকে জমিদারকে খাজনা দিতে হত। এ ছাড়া পথকর, যুদ্ধকর এবং অন্যান্য স্থানীয় ও রাজকীয় কর তাকে শুধতে হত। হিসাব করে দেখা গেছে জমিদারের অত্যাচার বাড়তে বাড়তে এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, কৃষককে তার রোজগারের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি খাজনা ও অন্যান্য আকারে সামন্তপ্রভুদের দিতে হত। প্রভুর খাজনা মিটিয়ে সে মরতেও পারত না। আবার মরলেও রেহাই নেই। বাড়ির সবচেয়ে ভালো গরু বা মহিষটা জমিদারকে দেয়ার পরই মৃতদেহ সৎকার করা যেত।

এ সকল কর ঠিকমতো প্রদান করতে না পারলে চুনের গুদামে চাষীকে কয়েদ করে রাখা, বেত্রাঘাত করা বা দরকার হলে গর্দান কেটে ফেলা ছিল সাধারণ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।

বিধি-বহির্ভূত অনেক কাজই চাষীকে করতে হত, যেমন জমিদারের জন্য কাঠ কাটা, খড় কুড়ানো, ফল পাড়া, শামুকের খোলা সংগ্রহ, ইত্যাদি। মাছ ধরা, শিকার করার অধিকার ছিল প্রভুর। শিকার ধাওয়া করে নিয়ে যেতে হত বেগারখাটা কৃষকদের। শিকারের সময়ে নিজেদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট হলেও কৃষককে মুখ বুজে থাকতে হত। কৃষকের জমিজমা ও সম্পত্তি ছাড়া স্ত্রী-কন্যার উপরও জমিদারের অধিকার ছিল। কৃষকের ঘরে সুন্দরী স্ত্রী বা কন্যার সন্ধান পেলেই জমিদারের লালসার হস্ত সেখানেও গিয়ে পৌঁছাত। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই কৃষকের ছিল না। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া এবং সেই অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। সামন্তযুগে ইউরোপে কৃষকের এই ছিল সাধারণ অবস্থা।

এ সকল অসহায় কৃষকদের সম্পর্কে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট-এর উক্তি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

"The serf serves; he is terrified with threats, weaned by corvees (fored services), afflicted with blows, despoiled of his possessions; for, if he possesses nought he is compelled to earn; and if he possesses anything he is compelled to have it not; the lord's fault is the serf's punishment; the serf's fault is the lord's excuse for preying on him......O extreme condition of bondage. Nature brought freemen to birth, but fortune hath made bondmen. The serf must needs suffer, and no man is sufferered to feel for him, he is compelled to mourn, and no man is permitted to mourn with him. He is not his own, but no man is his!"

"ভূমিদাস কেবল সেবা করে; তাকে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রস্ত রাখা হয়, জবরদস্তি শ্রম কর্ভিদ্বারা বিব্রত করা হয়; আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হয়, তার সম্পদ হরণ করা হয়; কারণ, যদি তার

www.pathagar.com

সম্পদ না থাকে তবে তা অর্জন করতে তাকে বাধ্য করা হয়; আর যদি তার কোনো সম্পদ থাকে তবে তা থেকে বঞ্চিত হতে তাকে বাধ্য করা হয়; জমিদারের দোষে ভূমিদাস শাস্তি পায়; ভূমিদাসের দোষ ঘটলে তা অত্যাচারের অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হায়, পরাধীনতা কি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে! প্রকৃতি সৃষ্টি করে স্বাধীন মানুষের কিন্তু ভাগ্যদোষে সে পরাধীন হয়। ভূমিদাস কষ্ট পেতে বাধ্য হয় কিন্তু তার জন্যে কেউ কষ্ট পায় না; ভূমিদাস দুঃখ পেতে বাধ্য হয় কিন্তু তার জন্যে কেউ দুঃখ করতে পারে না। তার আপন বলতে কেউ নেই, সে নিজেও তার আপন লোক নয়!"

সার্ফদের জীবনযাত্রা পদ্ধতিও ছিল অতি নিম্নস্তরের। ক্ষুদ্র কুঁড়েঘরে (অধিকাংশই কাঠের তৈরি) অন্ধকার নোংরা সেঁতসেঁতে, ধূম্রযুক্ত কক্ষে তারা অতি দীনহীনভাবে জীবনযাপন করত। ঘরগুলিতে জানালা বলতে কিছু ছিল না। ছাদের মধ্যে একটি ছোট চিমনির সাহায্যে ধোঁয়া নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও ঘর অধিকাংশ সময়েই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকত। তাছাড়া অনেকগুলি লোক একই ঘরে থাকার ফলে তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বাতাস সর্বদাই কলুষিত থাকত। আসবাবপত্রের মধ্যে দুএকটি কাঠের টুল ছাড়া আর কিছু ছিল না। অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থার দু-একজন কৃষকের বাড়িতে এক-আধখানা চৌকি বা তক্তপোষ থাকলেও অধিকাংশই ঠাণ্ডা মেঝেতে শুধু খড় বিছিয়ে রাত্রিযাপন করত।

শীতপ্রধান দেশ হলেও ইউরোপের অধিকাংশ চাষীরই গরম কাপড় জুটত না; শত তালি দেয়া একটি কোট, টুপি বা প্যান্ট জোগাড় হলেও জুতো সংগ্রহ করা বেশিরভাগ কৃষকের পক্ষেই অসম্ভব ছিল।

আহারের উপকরণও ছিল খুবই সামান্য। ফসল ঘরে ওঠার পর দু-তিন মাস পর্যন্ত কিছু আহার জুটলেও বছরের বাকি কটা মাস একটু শুকনো রুটি ও নুন অনেকেরই জুটত না। ফসল নষ্ট হলে তো অনাহার ও অর্ধাহারই ছিল নিত্যসাথী। এ ছাড়া ছিল ঝড়, বন্যা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ। এ সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও সামন্তযুগের কৃষকসমাজ অর্থনীতিকে চালু রেখেছে।

নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মভীরু, সমাজের উচ্চতলার বাসিন্দাদের দ্বারা শোষিত এবং তাদের কাছে হেয়, ঘৃণিত ও অবজ্ঞার পাত্র হয়েও এ-কৃষকরাই বছরের পর বছর ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছে, কাপড় ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি শুধু সামন্ত প্রভুই নয়, সবার ঘরে পৌঁছে দিয়েছে।

সামন্তপ্রভুদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি

সামন্তপ্রভুদের সমাজ ছিল অভিজাত। সামন্তপ্রভুর পুত্র বা পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কেউ এ সমাজে প্রবেশ করতে পারত না। একমাত্র রাজা কারও উপর সন্তুষ্ট হয়ে জমি বা পদ না দিলে কোনো সাধারণ লোকের পক্ষে এ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছিল অসম্ভব। প্রতিটি সামন্তপ্রভুর আভিজাত্য নির্ণীত হত তার পদমর্যাদা, ভূমির পরিমাণ, গবাদিপশু এবং সার্ফ ও সৈন্যের সংখ্যা দ্বারা। নিজের আভিজাত্যবোধ সম্বন্ধে প্রতিটি সামন্তপ্রভুই ছিল অত্যন্ত সচেতন এবং নিজের লর্ড ব্যতীত আর কারও কাছে কেউ আনুগত্য প্রদর্শন করত না, এমনকি রাজাকেও না। প্রতিটি সামন্তপ্রভুর লক্ষ্য ছিল নিজের জমির পরিমাণ ও সার্ফ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা, কারণ এতেই তার সম্পদ বৃদ্ধি হবে। ফলে পার্শ্ববর্তী বা নিকটস্থ সামন্তপ্রভুর কলহ এবং শেষপর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ছিল সাধারণ ঘটনা। প্রতিটি সামন্তপ্রভুই নিজ ধন ও সম্পত্তি রক্ষা ও বর্ধনে এত ব্যগ্র থাকত যে, অবশ্যম্ভাবীরূপে তারা পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ত। এই কলহ এত দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বব্যাপী হয়ে পড়ে যে, মধ্যযুগের ইউরোপে একদিনের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়নি। সামন্ত জমিদারগণের পরস্পরের মধ্যে সম্ভবত কখনই একতা স্থাপিত হয়নি, একমাত্র প্রজাপীড়ন ও কৃষক

www.pathagar.com

বিদ্রোহ দমনের কাজে ছাড়া। এমন কি বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখেও তারা কখনও একত্রিত হয়নি। শুধুমাত্র নিজ নিজ ভূখণ্ডটুকু রক্ষা করেই তারা নিশ্চিন্ত থাকত।

অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভুদের কোনো ভূমিকা ছিল না। অতএব তাদের ছিল অখণ্ড অবসর। এই অবসর সময়ে তারা আমোদ-প্রমোদ, শিকার এবং যুদ্ধের কাজেই ব্যস্ত থাকত। প্রথম দিকে তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে কোনোপ্রকার বিলাসদ্রব্যের আগমন ঘটেনি। কিন্তু ক্রুসেডের পরে প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের সম্পর্ক স্থাপনের ফলে বিলাস-সামগ্রীর আমদানির পরে প্রতিটি সামন্তপ্রভুর আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্রে অতিমাত্রায় বিলাসিতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে।

প্রতিটি সামন্তপ্রভুর বাসগৃহই ছিল এক-একটি দুর্গবিশেষ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রস্তরনির্মিত এ দুর্গগুলির অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে তৈরি করা হত। প্রথম দিকে এ দুর্গগুলিতে বাসগৃহের স্বাচ্ছন্দ্য বা সুযোগ-সুবিধা বিশেষ ছিল না। ঘরগুলো ছিল অন্ধকার, শীতল ও সেঁতসেঁতে। আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল কয়েকটি ভারী চেয়ার, টেবিল ও খাট। একাদশ শতাব্দীর পরেই শুধু এ-সকল কক্ষে কম্বল ও কার্পেটের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

সামন্তপ্রভুরা যদিও অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ছিল এবং দিনের অধিকাংশ সময়েই আহারে ব্যাপৃত থাকত, তবুও প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে মশলার আমদানি না হওয়া পর্যন্ত তাদের খাদ্যদ্রব্য বিশেষ সুস্বাদু ছিল না। পোশাক-পরিচ্ছদে ফ্যাসনের আবির্ভাব ঘটে শুধুমাত্র প্রাচ্যের বিলাসবস্তু আমদানির পরেই। তাছাড়া সুগন্ধী ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্যের সাথে তারা ক্রুসেডের পরেই পরিচিত হয়। এ সমস্ত বিলাসসামগ্রী কেনার প্রয়োজনে তারা কৃষকদের উপর খাজনার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয় এবং সামন্তপ্রভুদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে গিয়ে কৃষককুল আরও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

সামন্তপ্রভুদের অখণ্ড অবসর কাটত খেলাধুলা, শিকার ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদে। অসি চালনা তাদের একটি প্রিয় খেলা ছিল। অসি চালনা দুজনের মধ্যে সংঘটিত হলে বলা হত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা ডুয়েল এবং দুই দলের মধ্যে সংঘটিত হলে তাকে বলা হত টুর্নামেন্ট। এ দুই প্রকারের খেলাই এক এক সময়ে মারাত্মক সংঘর্ষে রূপান্তরিত হত। যদিও খেলার ছলেই এটা শুরু হত তথাপি অনেক সময়ে তা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত হত। কারণে অকারণে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সামন্তপ্রভুদের কাছে ছিল একটি বিলাসিতা। অস্ত্র ও লৌহবর্ম সজ্জিত অশ্বারোহী নাইটরা যেখানে সেখানে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকত। ফলে সারা ইউরোপে এত বেশি রক্তপাত ঘটে যে, শেষপর্যন্ত চার্চকে এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

দশম শতাব্দীতে পিস অব গড (Peace of god) নামক চার্চের নির্দেশ দ্বারা ধর্মস্থান, ধর্মযাজক বা গরিব লোকের প্রতি আক্রমণকে অভিসম্পাতের কারণ বলে গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালে ব্যবসায়ীদের উপর কোনো আক্রমণকেও চার্চ নিন্দা করে।

একাদশ শতাব্দীতে ট্রুস অব গড (Truce of god)-এর দ্বারা প্রতি সপ্তাহের বুধবার সূর্যাস্ত থেকে সোমবার সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং প্রতি বৎসরের বড়দিন (২৫শে ডিসেম্বর) থেকে এপিফ্যানির (৬ জানুয়ারি) উৎসব পর্যন্ত যুদ্ধকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া বসন্ত ঋতুর অধিকাংশ, গ্রীষ্মের শেষ ভাগ এবং শীতের প্রারম্ভেও যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বীজবপন ও ফসল তোলার সময়টুকুতে অন্তত কৃষককে রক্ষা করা। একাদশ শতাব্দীতে পোপ ক্রুসেডের ডাক দিলে সাময়িকভাবে সামন্তপ্রভুদের এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটে।

www.pathagar.com

সামন্ত অর্থনীতির রূপ

সামন্ত যুগের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক, গ্রামীণ ও স্বনির্ভর। প্রতিটি ম্যানরই স্থানীয়ভাবে যা প্রয়োজন সবকিছুই উৎপন্ন করত ও ব্যবহার করত। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্যে কামার, কুমার, ধোপা, তাঁতী ছিল। বাইরের থেকে দরকারি জিনিস আমদানি করার রেওয়াজ ছিল না, উপায়ও বিশেষ ছিল না। যা স্থানীয় ম্যানরে পাওয়া যেত না—যেমন, লোহা ও লবণ—শুধু তাই বাইরে থেকে আনতে হত।

আপাতদৃষ্টিতে ইউরোপের সামন্তসমাজ সংগঠন পূর্ববর্তী নতুন পাথরের যুগের গ্রাম সংগঠনের অনুরূপ। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, লোহার ব্যাপক ব্যবহার এবং উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৌশলের প্রয়োগের সাহায্যে যে অর্থনীতি ইউরোপে উদিত হয়েছিল তা ছিল নতুন পাথর যুগের তুলনায় সহস্রগুণ সমৃদ্ধ। দাস যুগে যে সকল যান্ত্রিক আবিষ্কার কেবল শহর অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থেকে মুষ্টিমেয় অবসরভোগী শ্রেণীর সুখ বৃদ্ধির উপকরণ মাত্র হয়েছিল, সামন্তযুগে তা সারাদেশ-গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে সকল অঞ্চলেই উদ্বৃত্ত ফলন ও সম্পদের সৃষ্টি করেছিল। ব্যবসাবাণিজ্য বর্জিত সামন্তযুগে যে বিপুল সংখ্যক পরাশ্রয়ী অভিজাতশ্রেণীকে প্রতিপালন করা সম্ভব হয়েছিল শুধু তার থেকেই এ উদ্বৃত্তের পরিমাণ বোঝা যাবে। উল্লেখযোগ্য যে সামন্ত অভিজাতশ্রেণী ও তাদের পোষ্যবর্গ সব মিলিয়ে ছিল সমগ্র জনসংখ্যার এক-দশমাংশ। বস্তুত সামন্ত অর্থনীতি ছিল এমন কি ধনী শাসিত রোমান সভ্যতার চাইতেও শক্ত বুনিয়াদের।

তথাপি এ-কথা অনস্বীকার্য যে, সামন্ত যুগে ইউরোপে কৃষির উৎপাদন ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের। প্রথমদিকে কর্ষণযোগ্য জমির অধিকাংশই অনাবাদী পড়ে থাকত। কারণ, জমিতে সার প্রদানের কোনো ভালো ব্যবস্থা ছিল না। উপরন্তু কয়েকবার চাষ করার পর জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে গেলে জমি ফেলে রাখা হত। এর ফলে মোট জমির প্রায় তিন-চতুর্থাংশই পতিত থাকত। তিন ভাগে চাষের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ার পর অবশ্য কিছু কিছু জমিতে আবার আবাদ শুরু হয়। একাদশ শতাব্দীতে নতুন ধরনের ঘোড়ার সাজ এবং লোহার ক্ষুর প্রবর্তিত হওয়ায় ঘোড়ার কার্যক্ষমতা আগের তুলনায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। এর আগে যে রাশ ব্যবহার করা হত তাতে ঘোড়ার বুকে টান পড়ার ফলে তার বোঝা টানার ক্ষমতা হ্রাস পেত। নতুন ধরনের লাগাম ব্যবহারের ফলে ষাঁড়ের বদলে ঘোড়ায় টানা লাঙলের প্রচলন সম্ভব হল এবং লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি চাষের নতুন পথ খুলে গেল।

সামন্তযুগের স্বনির্ভর অর্থনীতি এর অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ম্যানরে বিভক্ত সামন্ততন্ত্রের পক্ষে নিজ উদ্যোগে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন সম্ভব ছিল না এবং অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় সে শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রীয় ভবনের সুযোগও সামন্ততন্ত্রে ছিল না। নতুন পাথরের যুগের মতো সামন্তযুগেও তাই বিকাশের একমাত্র পথ ছিল নতুন নতুন আবাদ গড়ে তোলা এবং সামন্ততন্ত্রের শেষ কয়েকশ বছর ইউরোপের পতিত অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়া ছাড়া সামন্ত উৎপাদন প্রথায় আর কোনো উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি। বস্তুত এই ভূমিগত সম্প্রসারণই ছিল একমাত্র পথ যার মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য না হারিয়েও বিকাশ লাভ করতে পারত। এ প্রচেষ্টায় সামন্তপ্রভু এবং যাজক-ভূস্বামী সকলেই ব্রতী হয়েছিল। কারণ নিজেদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং জমিদারি বৃদ্ধিতে সকলেরই সমান উৎসাহ ছিল। নতুন আবাদে সুবিধাজনক শর্তে জমি আবাদ করার সম্ভাবনা থাকায় ভূমিদাসেরাও এ সম্প্রসারণে আগ্রহী হয়েছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এক ছটাক জমিও আর অনাবাদী রইল না। সামন্ততন্ত্রের প্রসারের পথও গেল রুদ্ধ হয়ে। এর ফলে যে অভ্যন্তরীণ সঙ্কট শুরু হল তার হাত থেকে সামন্ততন্ত্রের আত্মরক্ষা কোনোক্রমে সম্ভব হল না।

www.pathagar.com

সামন্তপ্রথায় চার্চের ভূমিকা

মধ্যযুগের অর্থনৈতিক রূপরেখার পরিচয় পাওয়া যায় সামন্তপ্রথার মাধ্যমে। এর দার্শনিক ও ভাবাদর্শের রূপ পরিস্ফুট হয়েছে চার্চের মধ্য দিয়ে। বস্তুত সামন্তপ্রথার ভাবাদর্শ প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিল চার্চ। অবশ্য চার্চ সামন্তপ্রথার বাইরে থেকে এ কাজ করেনি। চার্চ সামন্তপ্রথার মধ্যেই ঢুকে পড়েছিল। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি ছোটবড় চার্চই ছিল এক-একটি সামন্তপ্রভু। বহু জমি ছিল চার্চের অধীনে। মধ্যযুগের প্রথম দিকের নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন দিনগুলিতে লোকে আশ্রয়স্থল রূপে চার্চকেই জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তি দান করেছে। এছাড়া রাজা বা ধনী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় কাজ হিসাবে চার্চকে বহু জমি দান করেছেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে সমগ্র ক্যাথলিক জগতের এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিক ছিল চার্চ। এ সকল জমিতে ভূমিদাসদের বসিয়ে চার্চ তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে কর আদায় করত। সামন্ত প্রভুকে যে সকল কর ভূমিদাসরা দিত সেগুলো ছাড়াও টাইথ (tithe) নামক এক বিশেষ ধরনের কর চার্চ সকলের কাছ থেকে আদায় করত। কিন্তু প্রজাশোষণ বা সম্পত্তির আয় নিয়েই চার্চ তৃপ্ত ছিল না। সামন্তপ্রথা যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং এ প্রথার বিরোধী হওয়া যে ঈশ্বর বিরোধিতারই নামান্তর মাত্র—সেটা প্রচার করাই ছিল চার্চের দায়িত্ব। খ্রিস্টধর্ম প্রাথমিকভাবে দারিদ্র্যের ধর্মরূপে আবির্ভূত হলেও পরে অবশ্য ধনবানদের স্বার্থরক্ষাই এর প্রধান কাজে পরিণত হয়। প্যাপাসির (পোপতন্ত্রের) উৎপত্তি, চার্চ সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি, এর ক্রম-বর্ধমান প্রভাব ও প্রসার শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মকে ধনীর ধনরক্ষার হাতিয়ারেই পরিণত করে। দরিদ্রকে শোষণ ও সেই সঙ্গে শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে টিকিয়ে রাখার অপরিসীম প্রয়াসে তাকে লিপ্ত হতে দেখা যায়।

মানুষের প্রতি মধ্যযুগীয় চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল রোমান সাম্রাজ্যের পতনের তমসাচ্ছন্ন যুগে। ক্যাথলিক চার্চ মানুষকে বোঝাত যে পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের প্রস্তুতিমাত্র। ইহকালে দুঃখভোগ করলে, দুঃখ-কষ্ট নীরবে সয়ে গেলে পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভ ঘটবে নিশ্চয়। তা না হলে অদৃষ্টে আছে অনন্ত নরকভোগ। চার্চ এভাবে কৃচ্ছ্র সাধনার শিক্ষা দিয়ে, ধৈর্য ও তিতিক্ষার বাণী প্রচার করে চেষ্টা করেছে জনসাধারণকে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে বিরত করতে। বস্তুত সামন্তপ্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য চার্চের প্রয়াস ছিল অপরিসীম।

চার্চ সংগঠনও মোটামুটি সামন্ত সংগঠনের অনুরূপই ছিল। সম্রাট, রাজা, ব্যারন, কাউন্ট, ভাইকাউন্ট ইত্যাদির মতো পোপের নিচে ছিলেন আর্চবিশপ, তারপরে বিশপ ইত্যাদি। পৃথিবীর মতো স্বর্গলোকেও ছিলেন নয় স্তরের দেবতা : সেরাফিম, চেরাবিম, থোন, ডোমিনেশন, ভার্চু, পাওয়ার, প্রিন্সিপালিটি, আর্চ এঞ্জেল, এঞ্জেল। জগৎ পরিচালনায় এঁদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন।

চার্চের সুশৃঙ্খল কার্যধারা সামন্ত-রাজাদের উচ্ছৃঙ্খল ঝোঁক দূর করে সমগ্র খ্রিস্টীয় জগতে এক সর্বজনগ্রাহ্য কর্তৃত্বের সৃষ্টি করে। যাজকতন্ত্রের সাথে অবশ্য সামন্তপ্রভুদের মাঝে মাঝে বিবাদ দেখা দিত। কিন্তু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা অটুট রাখতে যে দুয়েরই প্রয়োজন আছে, সে সম্পর্কে উভয় পক্ষই সচেতন ছিল।

সম্রাট ও পোপের সংঘর্ষ

মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের ভাবাদর্শ প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিল চার্চ। শুধু তাই নয়, চার্চ নিজের সামন্তপ্রথার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টান চার্চ ও যাজক সম্প্রদায়ের হাতে সমগ্র ইউরোপের

www.pathagar.com

এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড চলে গিয়েছিল। চার্চ ছিল ইউরোপের সবচেয়ে বড় সামন্ত মালিক। চার্চের সংগঠনের রূপ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। চার্চের শ্রেণীবিন্যাস — পোপ, বিশপ, আর্চবিশপ প্রভৃতি ছিল সামন্ত শ্রেণীবিন্যাসের অনুরূপ। সামন্তপ্রথার সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে চার্চের উপর সামন্তপ্রভুদের আধিপত্য বহাল হয়। দশম-একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের সমগ্র চার্চ এমনকি রোমের চার্চের উপর পর্যন্ত হোলি রোমান এম্পায়ার, দেশীয় রাজা বা সামন্ত জমিদারদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমের পোপের নিযুক্তি হত কখনও কখনও ইতালির বড় বড় সামন্ত জমিদারদের দ্বারা; এঁরা খেয়াল খুশিমতো নিজেদের পছন্দসই লোককে পোপ নিযুক্ত করতেন। ম্যারোজিয়া নামে একজন রোমান মহিলা এতই প্রভাবশালী ছিলেন যে, ৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজের অবৈধ সন্তানকে রোমের পোপ নিযুক্ত করেন। এই মহিলার পৌত্র পোপ দ্বাদশ জন-ই প্রথম অটোকে পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করেন।

জার্মান সম্রাট প্রথম অটো দ্বাদশ জনকে লম্বার্ড রাজার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তার বিনিময়ে তিনি পোপকে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে ঘোষণা করতে। অটোর পরবর্তী জার্মান সম্রাটগণ সকলেই রোমের পোপদের নিযুক্ত করতেন এবং প্রত্যেকেই রোমে গিয়ে পোপের দ্বারা পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হতেন। এভাবে পবিত্র রোমান সম্রাটদের দ্বারা নিযুক্ত হওয়ার ফলে পোপের স্বাধীনতা বহু ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হত। শুধু তাই নয়, অন্যান্য দেশের চার্চগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পোপ অসমর্থ হতেন।

খ্রিস্ট জগতের ধর্মগুরু পোপের পক্ষে এভাবে সামন্তরাজা বা জমিদারের অধীনস্থ হওয়া রীতিমতো অপমানজনক বিবেচিত হওয়ায় পোপ নিজেকে সামন্ত অধীনতা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হলেন। সামন্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টার অর্থ এই নয় যে, পোপ সামন্তপ্রথাকে আঘাত করতে বা এর অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। আপাত বিরোধী মনে হলেও, এই প্রচেষ্টার পিছনে পোপের আসল উদ্দেশ্য ছিল সামন্তপ্রথাকে টিকিয়ে রাখা এবং ইউরোপের সবচেয়ে বড় সামন্তপ্রভু হিসাবে সবার উপরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

দশম শতাব্দীতে ফ্রান্সের বার্গান্ডি প্রদেশের ক্লুনি নামক মঠে এক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। যদিও মঠের সন্ন্যাসীদের সর্বপ্রকার দুর্নীতি, কলুষতা, অনাচার থেকে মুক্ত করা এ সংস্কার আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মঠ ও চার্চকে সামন্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করা। ক্লুনি সংস্কার আন্দোলনের দ্রুত বিস্তৃতি ও এর প্রভাব রোমের পোপ হিল্ডেব্রান্ডকে অনুপ্রাণিত করেছিল সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করতে।

একাদশ শতাব্দীতে হিল্ডেব্রান্ড সপ্তম গ্রেগরি নাম ধারণ করে রোমের পোপ নিযুক্ত হন। সামন্তপ্রথা অনুযায়ী নবনিযুক্ত পোপকে সম্রাট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত করতেন এবং কর্তৃত্বের চিহ্ন সম্বলিত দণ্ড ও অঙ্গুরীয় প্রদান করতেন। এই অনুষ্ঠানে পোপকে সম্রাট তাঁর জমিদারিও প্রদান করতেন।

সম্রাটের হাত থেকে কর্তৃত্ব পাওয়ার এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পোপ ঘোষণা করেন, তিনি (পোপ) ঈশ্বরের নিকট থেকে সরাসরি ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরিত। অতএব তিনি এই পৃথিবীর কারও অধীনস্থ নন এমনকি কারও কাছে স্বীয় কর্মের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। উপরন্তু তিনি দাবি করলেন, পৃথিবীর সকল মানুষ এমন কি সম্রাটও পোপের অধীন। ইউরোপের সকল চার্চের ধর্মযাজকদের তিনি নির্দেশ দিলেন সামন্ত জমিদার বা রাজার আনুগত্য অস্বীকার করে সরাসরি পোপের অধীনতা মেনে নিতে।

www.pathagar.com

পোপ সপ্তম গ্রেগরির আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট চতুর্থ হেনরি জার্মানির বিশপদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করে হিল্ডেব্রান্ডকে পোপের পদ থেকে বহিষ্কার করার কথা ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে হিল্ডেব্রান্ড চতুর্থ হেনরিকে পোপের ক্ষমতা অনুসারে খ্রিস্টান জগৎ থেকে বহিষ্কার (excommunicate) করেন। পোপের এই বহিষ্কার আদেশের অর্থ হল হেনরিকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করা এবং তার প্রজাদের প্রতি সম্রাটকে অমান্য করার নির্দেশ দেওয়া। পোপের এই ঘোষণায় প্রভাবিত হয়ে জার্মান সামন্তপ্রভুরা হেনরির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাধ্য হয়ে হেনরি পোপের কাছে মার্জনা প্রার্থী হলেন। ভয়ঙ্কর শীতের মধ্যে সুউচ্চ আল্পস পর্বত অতিক্রম করে বহু কষ্টে কয়েকজন সঙ্গীসহ হেনরি ইতালিতে পৌছান। পোপ তখন ক্যানোসায় অবস্থান করছিলেন। তিন দিন তিন রাত সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে খালি পায়ে সম্রাট পোপের প্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন সাক্ষাৎ লাভের আশায়। চতুর্থ দিনে পোপ তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন এবং পোপের পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার পরই শুধুমাত্র পোপ হেনরির উপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেন। মধ্যযুগে ধর্মের প্রভাব কতখানি প্রবল ছিল এঘটনা তারই একটা প্রমাণ। দেশে ফিরেও হেনরি কিন্তু এই অপমানের কথা ভুলতে পারেননি। পর বৎসর সসৈন্যে তিনি রোমে অভিযান প্রেরণ করেন এবং সপ্তম গ্রেগরিকে পদচ্যুত করে সেখানে নিজের অনুগত লোককে বসান। পরাজিত গ্রেগরি দক্ষিণ ইতালিতে পলায়ন করেন। সেখানে নর্ম্যানদের আশ্রয়ে ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হেনরি ও হিল্ডেব্রান্ডের মধ্যকার কলহ তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় এবং ১১২২ সালে ওয়ার্মস-এর চুক্তি (Treaty of worms) দ্বারা এ সংঘর্ষের সাময়িক অবসান ঘটে। এ চুক্তিতে উভয়পক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চার্চের বিশপগণ ভবিষ্যতে পোপ বা তাঁর প্রতিনিধিদের দ্বারা অভিষিক্ত হবেন, কিন্তু অভিষেক অনুষ্ঠান জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হবে সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। সম্রাট তাঁকে সব ভূখণ্ডও দান করবেন অর্থাৎ তার উপর রাজনৈতিক অধিকার আরোপ করবেন।

এই চুক্তির তিন বছর পরই কলহ নতুন পর্যায়ে উপস্থিত হল। পোপ তৃতীয় আলেকজান্ডার ও সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসার মধ্যে সংঘটিত এই কলহের মূল কারণ ছিল জার্মান সম্রাট কর্তৃক ইতালির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। কিন্তু ইতালির জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে পরাজিত ফ্রেডারিক পোপের নিকট পুনরায় মার্জনাপ্রার্থী হন। শুধু তাই নয় পোপের কর্তৃত্বে অনুষ্ঠিত ও সংগঠিত তৃতীয় ক্রুসেডেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৃতীয় ইনোসেন্ট-এর সময় পোপের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে। ১২০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাসকে বহিষ্কারাদেশের ভয় দেখিয়ে তাঁর পরিত্যক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেন। একইভাবে ইংল্যান্ডের রাজা জনকে তিনি বাধ্য করেন তাঁর (পোপের) মনোনীত স্টিফেন লাংটনকে ক্যান্টারবেরি চার্চের আর্চ বিশপরূপে নিযুক্ত করতে। পোপ ইনোসেন্ট ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। প্রত্যেক দেশের রাজাকে তিনি তাঁর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। এমন কি তিনি দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে পবিত্র রোমান সম্রাট নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক অবশ্য পরবর্তীকালে এ পোপের উত্তরাধিকারী চতুর্থ ইনোসেন্ট-এর সাথে সিসিলি ও সার্ডিনিয়ার দখল নিয়ে কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পোপের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ক্রুসেডের শোচনীয় ব্যর্থতা এবং পোপ ও ধর্মযাজকদের মাত্রাহীন দুর্নীতি, অনৈতিকতা ও অপরিসীম বিলাসিতা মানুষের মনে

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রশ্নের সৃষ্টি করে। বিশেষত, শহরবাসীর মধ্যে পোপের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তারা সরাসরি পোপের বিরোধিতা শুরু করে।

এই বিরোধিতা দমন করার উদ্দেশ্যে পোপ এদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শহরবাসীকে হেরেটিক বা ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে পোপ সামন্তপ্রভুদের এদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। সসৈন্যে সামন্তপ্রভুরা পোপের বিরোধীদের ধরে ধরে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারে। তা সত্ত্বেও পোপের বিরোধিতার অবসান ঘটল না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের সাথে পোপের সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ দি ফেয়ার ফ্রান্সের চার্চগুলির উপর কর আরোপ করেন। পোপ অষ্টম বনিফেস ফিলিপকে বহিষ্কার করার ভয় দেখালে ফিলিপের সৈন্যদল পোপকে বন্দী করে আনে। বনিফেসের মৃত্যুর পর ফিলিপ পরবর্তী পোপকে নিযুক্ত করেন এবং রোম থেকে পোপের অফিস সরাসরি ফ্রান্সে নিয়ে আসেন। ফ্রান্সের এ্যাভিগ্নন্-এ পোপের অফিস প্রায় ৭০ বৎসর স্থায়ী হয় এবং এ সময়ের মধ্যে নিযুক্ত পোপগণ সকলেই ছিলেন ফরাসি। পরে যদিও রোমেই আবার পোপের অফিস স্থানান্তরিত হয়। তথাপি কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে আবার ধর্মীয় বিরোধ উপস্থিত হয় এবং একই সময়ে তিনজন পোপই নিজেকে সত্যিকার পোপ বলে দাবি করতে থাকেন। ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্স-এর কাউন্সিলের মাধ্যমে এ বিরোধের অবসান ঘটে এবং তিনজন পোপকেই সরিয়ে পঞ্চম মার্টিনকে নতুন পোপ নিযুক্ত করা হয়। এ আভ্যন্তরীণ বিরোধ পোপের প্রভাবকে আরও ক্ষুণ্ন করে। যদিও এরপর প্রায় পাঁচশ বছর পর্যন্ত ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মীয় প্রভাব বিদ্যমান থাকে, তথাপি ইউরোপের সাধারণ মানুষ ক্রমশই পোপের উপর তাদের আস্থা হারাতে থাকে।

পরিণত সামন্ততন্ত্র

শহর সমূহের উৎপত্তি

একাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের সামন্তপ্রথায় বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হয়, কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তির ক্রমশ বিকাশ ঘটতে থাকে। উন্নততর ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে কৃষিতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে পতিত জমির পরিপূর্ণ ব্যবহারও কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করে। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির প্রয়োগ কৃষিকার্যে নিযুক্ত ভূমিদাসদের পরিপূর্ণভাবে কৃষিশ্রমে নিয়োজিত করার ফলে এরা অন্য কোনো কাজ—যেমন কাপড় বোনা, জুতা সেলাই বা অন্যান্য পণ্য উৎপাদন (যা এতদিন তারা করত)—প্রভৃতিতে নিয়োজিত হতে পারত না। অন্যদিকে একদল ভূমিদাস শুধুমাত্র বিভিন্ন হস্তশিল্পেই নিয়োজিত হল। কৃষি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত হয়ে এরা পুরোপুরি কারিগর শ্রেণীতে পরিণত হল। এভাবে কৃষি ও হস্তশিল্প শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হল।

উৎপাদনে শ্রমবিভাগ প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও দাসপ্রথার অবলুপ্তির পর শ্রমবিভাগের অবসান ঘটে। সামন্তপ্রথায় একই লোককে বিভিন্ন কাজ করতে হত বলে সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের জন্ম সম্ভব হয়নি। একাদশ শতাব্দী থেকে কৃষি ও হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে কিছু কিছু

www.pathagar.com

কারিগরি উন্নতি ঘটার ফলে উভয়েই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হস্তশিল্পে নিয়োজিত কারিগরগণ, যথা, কামার, কুমার, তাঁতী, ছুতোর প্রভৃতি এক একজন এক-এক পেশায় বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করে। এর ফলে কৃষির মতো হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্পেও উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কারিগরগণ এখন শুধুমাত্র তাদের উৎপাদিত সামগ্রী দিয়েই সামন্তপ্রভুকে খাজনা দিতে পারত। এদের উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সামন্তপ্রভুকে খাজনা দিয়ে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও তাদের কাছে উদ্বৃত্ত কিছু পণ্য থাকত। উন্নত কারিগরদের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা গ্রামের মধ্যে খুব বেশি ছিল না। কাজেই সামন্তপ্রভুর অনুমতি নিয়ে এরা ম্যানরের বাইরে তাদের পণ্য বিক্রির জন্যে নিয়ে যেত। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে যে গ্রাম্যমেলা বসত সেখানেও তারা তাদের পণ্য নিয়ে বিক্রি করত। ম্যানরের বাইরে কারিগরগণ তাদের পণ্যসামগ্রী বিদেশ থেকে আগত বণিকদের কাছে বিক্রি বা বিনিময় করত। এ জন্য বিদেশী বণিকরা যে পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করত সে পথেরই ধারে এরা নিজেদের পণ্য নিয়ে বসে থাকত। এভাবে একদল কারিগর চিরতরে ম্যানর ছেড়ে চলে এল। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক সামন্তপ্রভুকে এককালীন বেশকিছু পণ্য বা অর্থ দিয়ে মুক্তিপণ জোগাড় করল। অন্যরা আবার পালিয়ে চলে এল। এ সকল পলাতক কারিগরদের আর ধরা গেল না। ম্যানর থেকে আগত হস্তশিল্পী বা কারিগর শ্রেণী অন্য কোনো সামন্তপ্রভুর ম্যানরের পাশে বা কোনো মঠের ধারে বসতি স্থাপন করল। এরা এমন সকল স্থান বসতির জন্যে নির্বাচন করল যেখান থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হওয়া সহজ এবং যেখানে কাছের গ্রাম থেকে খাদ্য ও অন্যান্য কাঁচামাল পাওয়া সম্ভব নয়। কালক্রমে এ সকল কারিগর ও বণিকদের বসতিগুলিকে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগের শহরগুলি গড়ে ওঠে। ডাকাত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে শহরবাসী তাদের শহরের চারদিকে দুর্ভেদ্য উঁচু প্রাচীর গড়ে তোলে। শহরের মধ্যে একাধারে পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে পণ্য কেনাবেচা হতে থাকে। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ম্যানর থেকে কৃষকরাও তাদের কৃষিপণ্য শহরের বণিকদের কাছে বিক্রি করে নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যেত। এভাবে গ্রাম ও শহর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

সামন্তপ্রভুর অত্যাচারে নির্যাতিত বহু কৃষকও পালিয়ে শহরে আসতে শুরু করে, কারণ শহর ছিল মুক্ত অঞ্চল। এখান থেকে কেউ তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারত না।

প্রথম দিকে শহরগুলি কোনো না কোনো সামন্তপ্রভুর জমিদারির এলাকাভুক্ত ছিল; কাজেই সে কারণে সামন্তপ্রভুর বিশেষ অধিকার বলবৎ থাকত শহরের উপরে। সামন্ত জমিদার শহরবাসীর কাছ থেকে নিয়মিত খাজনা ও অন্যান্য জিনিসপত্র আদায় করত। শৌখিন শিল্প ও বিলাসদ্রব্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ তাদেরকে শহরগুলির উপর আরও নির্ভরশীল করে তুলল। অন্যদিকে শহরগুলিকেও জমিদারদের নিত্যনতুন ভোগের সামগ্রী ও অর্থের জোগান দিতে হত। ফলে সংঘবদ্ধভাবে নগরবাসী জমিদারের ক্রমবর্ধমান অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কোনো কোনো স্থানে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জমিদারদের পরাজিত করে শহরগুলি সামন্তপ্রভুর অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করল। ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও জার্মানির নগরগুলি এখন স্বাধীনভাবে গড়ে উঠল, তারা নিজস্ব স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, আদালত, সৈন্যবাহিনী ও অর্থ দফতর গড়ে তুলল। শহরবাসী ব্যক্তিগতভাবেও স্বাধীনতা অর্জন করল। কোনো কৃষক এক বৎসর শহরে বাস করলে স্বাধীন নাগরিকের অধিকার লাভ করত। তবে মনে রাখা দরকার যে, সামন্ত যুগের শহরগুলো সামগ্রিকভাবে সামন্ত ব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যেই গড়ে

www.pathagar.com

উঠেছিল। প্রথম দিকে জমিদারদের সাথে বিরোধ ঘটলেও কালক্রমে এ শহরগুলো সামন্ত ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। এ সকল শহরে যে সব শিল্প গিল্ড কাজ করত সেগুলোও সামন্ত ব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

গিল্ড প্রথা

সামন্তযুগের শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কারিগরি ও হস্তশিল্প। উৎপাদনপ্রথা ও যন্ত্রপাতি ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ থাকলেও শিল্পের অভ্যন্তরে কোনো শ্রমবিভাগ ছিল না। অর্থাৎ কারখানার ভিতরে প্রতিটি কারিগরকেই আগাগোড়া সম্পূর্ণ কাজ করতে হত। কারিগররা নিজেরাই ছিল উৎপাদনযন্ত্রের মালিক, কাঁচামালও সাধারণত নিজেরাই সংগ্রহ করত। কারিগর তার তৈরি জিনিসপত্র সরাসরি খদ্দেরের কাছে বিক্রি করত। বলাবাহুল্য, এই কারিগরি শিল্প সামন্ত অর্থনীতি থেকে একটু পৃথক ধরনের ছিল। কৃষক যে ফসল উৎপন্ন করত তার একটা অংশ যেত জমিদারের ভোগে, আর বাকিটা সে নিজে ভোগ-ব্যবহার করত। কারিগর কিন্তু তার উৎপাদিত দ্রব্য নিজে ভোগ-ব্যবহার করত না. পণ্য হিসাবে বিক্রি করত।

সামন্তযুগে যৌথ জীবনযাত্রাই ছিল রীতি। সামন্ত উৎপাদন প্রথার বৈশিষ্ট্যের কারণে সামাজিক সহযোগিতার জন্য জোট বাঁধাই ছিল সে যুগের রীতি। সামন্তযুগের শিল্প সংগঠনে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী এবং কারিগররা সংঘ বা গিল্ড গঠন করত। প্রথমে সৃষ্ট হয়েছিল বণিকদের সংঘ। পথেঘাটে ডাকাতির উপদ্রব এড়াবার জন্য বণিকরা যাত্রার সময়ে দল গড়ত। কালক্রমে এগুলোই স্থায়ী সংঘের রূপ নেয়। এই সংঘগুলোতে বণিক ও কারিগররা কাঁচামাল কিনে তৈরি মাল বিক্রি করত বলে তাদেরও ব্যবসায়ী বলে গণ্য করা হত। গিল্ড বণিকদের শহরের ব্যবসাবাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার ছিল।

কালক্রমে হস্তশিল্পী ও কারিগরদের নিজস্ব গিল্ড গড়ে ওঠে। এক-একটা শিল্পকে কেন্দ্র করে এক-একটা গিল্ড হত। গিল্ডের গঠন ও বিন্যাস ছিল এ রকম : (১) গিল্ড মাস্টার বা পূর্ণ সদস্য—এরা ওস্তাদ কারিগর; (২) জার্নিম্যান—এরা সহকারী কারিগর; এবং (৩) শিক্ষানবীশ (এপ্রেন্টিস)।

শুরুর দিকে গিল্ডের নিয়মানুসারে শিক্ষানবিসরা কাজ শিখলে জার্নিম্যান হত এবং জার্নিম্যানরা গিল্ড মাস্টারে উন্নীত হত। কালক্রমে ওস্তাদ কারিগরেরাই গিল্ডের সর্বময় কর্তা হয়ে বসে এবং জার্নিম্যান ও শিক্ষানবিসদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করতে থাকে।

সামন্তযুগের এ গিল্ডগুলোর প্রধান দায়িত্ব ছিল গিল্ড সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গিল্ডের সাথে সামন্তপ্রভুর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। এছাড়া বাইরের প্রতিযোগিতা নষ্ট করাও গিল্ডের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল উদ্দেশ্যে বহু নিয়ম-কানুনের প্রচলন হয়। সদস্যদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে গিল্ড সামন্তপ্রভুর পাওনা চুকিয়ে দিত। সদস্যদের ভিতর প্রতিযোগিতা বন্ধ করে সকলকে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য গিল্ড উৎপাদনের প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করত। প্রত্যেক কারিগরকে নির্দিষ্ট বাজারে কাঁচামাল কিনতে হত, কাঁচামাল নিজে ব্যবহার না করে অন্যকে বিক্রি করা চলত না। উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে হত নির্দিষ্ট দিনে; নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট দামে; যন্ত্রপাতির ব্যবহারও সুনির্দিষ্ট ছিল। জার্নিম্যান ও শিক্ষানবিশ নিয়োগ ও তাদের মজুরীর হার স্থির করত গিল্ড। গিল্ডের নিয়ম ভাঙলে জরিমানা ও মাল বাজেয়াপ্ত করা হত, এমনকি শহর থেকেও বের করে দেয়া হত।

www.pathagar.com

এ ছাড়া ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের দিনে গিল্ড পান-ভোজনের আয়োজন করত। এমন কি দুস্থ কারিগর ও তার পরিবারকে সাহায্য করাও গিল্ডের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শহরবাসীর নিরাপত্তা রক্ষার ভারও গিল্ড গ্রহণ করত।

বার্গার শ্রেণী

সামন্তযুগের শেষ দিকে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে শহরগুলোতে নতুন শ্রেণীর উদয় হতে থাকে। এরা হল : ব্যাঙ্কার, ধনী বণিক, সুদখোর মহাজন। এদেরকে বলা হত বার্গার (শব্দটি জার্মান ভাষার বুর্গ বা শহর কথাটি থেকে উদ্ভূত, প্রধানত বাণিজ্যই এদের সম্পদের মূল। উপরে বর্ণিত গিল্ড বণিকদের সাথে নতুন যুগের বার্গারদের পার্থক্য লক্ষণীয়। গিল্ড বণিকরা ছিল একইসাথে কারিগর ও বণিক এবং শহরের শিল্প বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল তাদের। কিন্তু বার্গাররা কারিগর ছিল না, এরা অন্যের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করত। মধ্যযুগের শেষ দিকে যখন বাণিজ্যের পরিধি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক রূপ নিতে শুরু করে, গিল্ড উৎপাদন প্রথা ততই যুগের তুলনায় পশ্চাৎপদ বলে প্রমাণিত হয় এবং গিল্ড সংগঠনের সাথে বার্গারশ্রেণীর বিরোধ ক্রমেই উগ্র হয়ে দেখা দেয়। গিল্ড প্রতিযোগিতা দূর করা এবং নিজ স্বার্থরক্ষার দিকে যতটা মনোনিবেশ করত যান্ত্রিক আবিষ্কার ও উন্নতির দিকে ততটা নয়। বরং কোনো কারিগর নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করলে সেটা বন্ধ করে দেয়া হত এবং কারিগরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হত। গিল্ড প্রথা তাই উৎপাদন বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেয়। বাজারের আয়তন বেড়ে গেলে গিল্ডগুলো চাহিদা মেটাবার জন্য নতুন শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে নতুন গিল্ড স্থাপন করে অর্থাৎ পুরো জিনিসটা না বানিয়ে এক-একটা গিল্ড এক-একটা অংশ তৈরি করতে শুরু করে। এভাবে গিল্ডগুলো আংশিক শ্রমবিভাগের মারফত হস্তশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। কিন্তু কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমবিভাগ কখনও চালু হয়নি। শ্রমিকও তার উৎপাদন যন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। গিল্ডের নিয়মানুযায়ী গিল্ড মাস্টার নিজ শিল্প ছাড়া অন্য কোনো শিল্পে জার্নিম্যানদের নিয়োগ করতে পারত না। গিল্ডের শিক্ষানবিস ও জার্নিম্যানদের সংখ্যা সীমিত থাকার ফলে গিল্ড মাস্টার কখনও পুঁজিপতি হতে পারেনি। অপরপক্ষে বণিকরা সবরকম পণ্যই গিল্ডকারিগরদের কাছ থেকে কিনতে পারত কিন্তু মজুরের শ্রম সে কিনতে পারত না। ফলে তার পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়ার পক্ষে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। বণিকের পুঁজিকে সবরকমে প্রতিহত করার চেষ্টা করত গিল্ডগুলো।

সে সময়ে উৎপাদনের বিকাশের জন্যে দুটো কাজ অত্যাবশ্যক ছিল : কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমবিভাগ—সেটা ছাড়া ব্যাপক হারে পণ্য উৎপাদন সম্ভব নয়; এবং শ্রমিকের হাত থেকে উৎপাদন যন্ত্রকে পৃথক করে সেটাকে পুঁজিবাদের পুঁজিতে পরিণত করা। এদুটো ছিল পুঁজিবাদের বিকাশের আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। এ শর্ত পূরণ করতে পারত বার্গার শ্রেণী, গিল্ড নয়।

মধ্যযুগের শেষপর্বে গিল্ডগুলোর সাথে ক্রমাগত সংঘর্ষে বার্গার শ্রেণী শেষপর্যন্ত জয়লাভ করে। বার্গারদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে সমগ্র দেশে ব্যবসাবাণিজ্য বিস্তৃত হয়। সামন্তপ্রভুদের কলহবিবাদ, লড়াই ও লুঠতরাজ ব্যবসাবাণিজ্যের বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে দেখা দেয়। এ বাধা দূর করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে সমগ্র দেশে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। এ জন্য বার্গার শ্রেণী নিজ নিজ দেশের রাজার হাতকেই শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। বার্গারশ্রেণী রাজাকে শুধু অর্থ সাহায্যই করেনি, সশস্ত্র লোকজন দিয়ে রাজার সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতেও সাহায্য করে। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে এই বার্গারদের সাহায্যেই ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ সামন্তপ্রভুদের দমন করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

ক্রুসেড

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীব্যাপী সমগ্র ইউরোপে এক প্রচণ্ড ধর্মোন্মাদনার সূত্রপাত হয়, যার পরিণামে ইউরোপের খ্রিস্টান ও প্রাচ্যের মুসলিমদের মধ্যে কয়েকবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। ইতিহাসে এই সংঘর্ষের নাম দেয়া হয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। সেলজুক তুর্কিদের দ্বারা অধিকৃত খ্রিস্টানদের ধর্মস্থান প্যালেস্টাইনের উদ্ধার এই যুদ্ধের প্রাথমিক কারণ বলে পরিগণিত হলেও আসলে ক্রুসেডের পাশ্চাতে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান।

ক্রুসেডের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন খ্রিস্ট জগতের ধর্মগুরু পোপ। পোপই ক্রুসেডের আয়োজন, সংগঠন ও অর্থ জোগানোর ভার নেন এবং সমগ্র ক্রুসেডের পরিচালনা ভার তিনিই গ্রহণ করেন। এ কাজের পশ্চাতে তাঁর নিজস্ব লক্ষ্য সাধনই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

ক্রুসেডকে পোপের বৈদেশিক নীতির বাস্তবায়ন রূপে আখ্যা দেয়া হয়। একাদশ শতাব্দীতে পবিত্র রোমান সম্রাটের সাথে পোপের কলহ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত এবং পোপের অবস্থা গভীর সঙ্কটাপন্ন, সে সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার এবং সেই সঙ্গে সম্রাটের উপর নিজের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই পোপ ক্রুসেডের আহ্বান করেন। অবশ্য ঠিক সময়ে এ সুযোগ উপস্থিত হওয়ার ফলেই পোপের পক্ষে তার সদ্ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়েছিল।

খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাবের পর থেকেই যীশুখ্রিস্টের জন্মভূমি জেরুজালেম নগরী খ্রিস্টানদের নিকট পবিত্র স্থানরূপে বিবেচিত হত এবং প্রতি বৎসর বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান তীর্থযাত্রী ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে তীর্থকর্ম করার উদ্দেশ্যে জেরুজালেমে গমন করতেন।

সপ্তম শতাব্দীতে এই জেরুজালেম নগরী আরব মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হয়। কিন্তু আরবগণ খ্রিস্টানদের তীর্থকর্ম বা অন্যান্য কাজে কখনই হস্তক্ষেপ করেনি। কাজেই বিদেশী ও বিধর্মীদের দ্বারা অধিকৃত হলেও খ্রিস্টানগণ জেরুজালেম নগরীতে তাদের উপর কোনো নির্যাতন অনুভব করেনি।

দশম শতাব্দীর ক্লুনি সংস্থার আন্দোলনের ফলে খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মানুরাগ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং আরও বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী জেরুজালেমে গমন করেন। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কিগণ জেরুজালেম নগরী অধিকার করার পর খ্রিস্টানদের উপর তারা নির্যাতন শুরু করে। এসব নির্যাতনের কাহিনী আরও অতিরঞ্জিত রূপে ইউরোপে পৌছালে সেখানকার খ্রিস্টানদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে সেলজুক তুর্কিগণ আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এশিয়া মাইনরের অংশটুকু অধিকার করে। ক্রমশ তারা রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাইজেন্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস কমনেনাস উপায়ান্তর না দেখে পোপ দ্বিতীয় আরবান-এর নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। পোপ এই আবেদনের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। পবিত্র জেরুজালেম নগরী বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করার নামে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পোপ সকল খ্রিস্টানকে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

পোপের আহ্বানে ইউরোপের সকল শ্রেণীর জনগণ ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্যে সমবেত হলেও প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নরূপ।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ইউরোপে সামন্তপ্রথা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, এক ছটাক

www.pathagar.com

জমিও আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে ইউরোপে সামন্তপ্রথার আর প্রসার লাভ সম্ভব ছিল না। সামন্তজমিদারগণ এবার পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করে। বিপুলসংখ্যক সামন্তপ্রভু প্রাচ্যদেশে নতুন ভূখণ্ড অধিকার করে সেখানে সামন্তপ্রথার প্রবর্তন এবং নতুন লোকদের সার্ফ বানিয়ে তাদের শোষণ করে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এই যুদ্ধে যোগ দেয়। পোপও তাদের এই সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। তাছাড়া পোপ সামন্তপ্রভুগণকে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে অযথা রক্তপাত ও শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে ধর্মযুদ্ধে সে শক্তি নিয়োজিত করারও নির্দেশ দেন। শুধুমাত্র সামন্তপ্রভু নয়, সকল শ্রেণীর প্রজাদের ভিন্ন ভিন্ন লোভের উপকরণের আশ্বাস দেয়া হয়। সার্ফদের বলা হয়, যদি তারা ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে তারা সামন্তপ্রভুদের নির্যাতন ও শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করে নতুন দেশে জমি নিয়ে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য করতে পারবে। বেকার ভবঘুরেদের প্রাচ্যদেশে কর্মসংস্থানের আশ্বাস দেওয়া হয়। এমনকি চোর, ডাকাত ও অন্যান্য সমাজবিরোধীদেরকেও আইনের চক্ষু ফাঁকি দিয়ে প্রাচ্য দেশে স্বাধীন নাগরিকের অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

তাছাড়া বলা হয় যুদ্ধের দ্বারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া যাবে। আর যুদ্ধে নিহত হলেও সে শহীদের মর্যাদা অর্জন করবে এবং সরাসরি স্বর্গে গমনের সুযোগ পাবে। পোপের এসকল প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করে ইউরোপের সকল শ্রেণীর খ্রিস্টান পোপের পতাকাতলে সমবেত হয়। শুধুমাত্র ইতালির বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পোপকে এরা অর্থ ও জাহাজ দ্বারা সাহায্য করেছিল। এ সকল ইতালীয় বণিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ক্রুসেডের মাধ্যমে তৎকালীন সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে শক্তিহীন করে তার বাণিজ্যপথগুলি দখল করা। ক্রুসেডে যোগদানকারী সকলশ্রেণীর জনগণের মধ্যে ইতালীয় বণিকরাই ছিল অত্যন্ত চতুর। ক্রুসেডের মাধ্যমে অন্যদের উদ্দেশ্য সাধিত না হলেও ইতালির বণিকরা তাদের নিজস্ব স্বার্থ পরিপূর্ণভাবে চরিতার্থ করেছিল।

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের ক্লারমন্ট নামক স্থানে পোপ দ্বিতীয় আরবান সামন্তপ্রভুদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় পোপ ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং পবিত্র জেরুজালেম নগরী পুনরুদ্ধার যে ঈশ্বরেরই একান্ত ইচ্ছা সে কথা তিনি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেন। অন্যদিকে 'দুধ ও মধু'দ্বারা প্লাবিত প্রাচ্যদেশে তারা যে বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে পারবে—সে লোভনীয় দিকটিও তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। পোপের অনুরাগীগণ বিশেষত, পিটার দি হার্মিট কৃষকদের মধ্যে ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে প্রচার করে তাদের ক্রুসেডে যোগদানের জন্যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। পোপের নির্দেশে সকল শ্রেণীর জনগণ পবিত্র ক্রুস বহন করে ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য সমবেত হয়। এ ক্রুস বা ক্রস থেকেই ক্রুসেড নামের উৎপত্তি হয়।

১০৯৬ সালের প্রথম ভাগে একদল অসংগঠিত লোক, প্রধানত কৃষক ও বিত্তহীন জনগণ, পিটার দি হার্মিট-এর নেতৃত্বে জেরুজালেমের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। সংখ্যায় তারা বহু হলেও গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে তাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় যে-কোনো শহরে উপনীত হয়েই তারা স্থানীয় অধিবাসীদের প্রশ্ন করত সেটা জেরুজালেম কিনা! পথিমধ্যে গ্রাম ও জনপদগুলি ধ্বংস ও লুঠতরাজ করতে করতে তারা অগ্রসর হয় এবং শেষপর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলে উপনীত হয়। ভীতসন্ত্রস্ত বাইজেন্টাইন সম্রাট এদের হাত হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাদের এশিয়া মাইনরে পাঠিয়ে দেন। সেখানে সেলজুক তুর্কিদের হাতে এরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

প্রথম সুসংগঠিত ক্রুসেড শুরু হয় ১০৯৬ সালের শেষ ভাগে। ফ্রান্স জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশ থেকে আগত সামন্তপ্রভুগণ বিপুল অস্ত্র ও অর্থে বলীয়ান হয়ে ক্রুসেডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

www.pathagar.com

হন। বিভিন্ন পথ বেয়ে তাঁরা কনস্টান্টিনোপলে এসে সমবেত হন এবং একত্রে এশিয়া মাইনরের দিকে যাত্রা করেন।

দীর্ঘ, বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ক্রুসেডাররা তিন বছর পরে (১০৯৯ খৃঃ) জেরুজালেম নগরীতে উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে তারা নিকায়া, সিরিয়ার এন্টিওক ও এডেসা নগর দখল করে। জেরুজালেমে তারা অধিকাংশ মুসলিম নাগরিককে হত্যা করে সমগ্র শহরটিকে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। অধিকৃত দেশগুলিতে তারা সামন্তপ্রথার প্রচলন করে এবং তথাকার অধিবাসীদের বলপূর্বক সার্ফ বানানো হয়।

অধিকৃত নগরগুলিতে নিজ নিজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সামন্তপ্রভুদের মধ্যে অচিরেই কলহের সূত্রপাত হয়। অনেকে আবার মুসলিমদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে অপর পক্ষের সামন্তপ্রভুর সাথে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়।

এই সুযোগে মসুলের মুসলিম শাসনকর্তা জাঙ্গি পুনরায় এডেসা দখল করে নেন এবং এন্টিওক ও জেরুজালেম দখলের হুমকি দেন। তাঁর হুমকিতে ভীত হয়ে প্রাচ্যের খ্রিস্টানগণ পুনরায় সাহায্যের জন্য পোপের কাছে আবেদন জানায়।

হৃতরাজ্য এডেসা পুনরুদ্ধারকল্পে ১১৪৪ সালে দ্বিতীয় ক্রুসেড শুরু হয়, কিন্তু ক্রুসেডাররা তাদের অভিযানে ব্যর্থ হয়। এ দিকে মিশরের সুলতান সালাহউদ্দিন ১১৮৭ সালে জেরুজালেম নগরী পুনরায় অধিকার করে নেন এবং জেরুজালেমে খ্রিস্টান শাসনের অবসান ঘটে।

জেরুজালেম পুনরায় উদ্ধারের আশায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তৃতীয় ক্রুসেড পরিচালিত হয় তিনজন বিখ্যাত নরপতির নেতৃত্বে। পবিত্র রোমান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের রাজা 'সিংহ হৃদয়' রিচার্ড এ ক্রুসেড পরিচালনা করেন। বহু কষ্টে তারা বসফরাস পর্যন্ত উপনীত হওয়ার পর এশিয়া মাইনর অতিক্রমকালে ফ্রেডারিক এক নদীতে ডুবে মারা যান। ইংরেজ ও ফরাসি সেনারা সমুদ্রপথে প্যালেস্টাইনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কালে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং ফিলিপ তাঁর দলবল নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। শুধুমাত্র রিচার্ডই বহু কষ্টে জেরুজালেমের নিকট পৌছান; কিন্তু জেরুজালেম উদ্ধারে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। সুলতান সালাহউদ্দিনের সাথে এক সন্ধির মাধ্যমে রিচার্ড শুধু এটুকু প্রতিশ্রুতি আদায় করতে সমর্থ হন যে, তীর্থযাত্রী খ্রিস্টানগণের উপর আর কোনো নির্যাতন হবে না। এছাড়া এ ক্রুসেডে আর কোনো ফল লাভ হয় না।

ইতিমধ্যে ইউরোপে ক্রুসেডের উন্মাদনা ক্রমশ হ্রাস পেলেও পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ১২০২ সালে চতুর্থ ক্রুসেডের আয়োজন করেন। মিশরই সে যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র ছিল বলে এ ক্রুসেড মিসরের বিরুদ্ধেই প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

চতুর্থ ক্রুসেডে শুধুমাত্র ফ্রান্সের ধর্মযোদ্ধাগণ অংশগ্রহণ করে। ভেনিসের বণিকরা এ যুদ্ধে জাহাজ দিয়ে সাহায্য করে বটে কিন্তু মিশরের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল বলে তারা মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ইচ্ছুক ছিল না। পথিমধ্যে ভেনিসীয় বণিকদের প্ররোচনায় ভেনিসের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী জারা (Zara) শহরটিকে ক্রুসেডাররা ধ্বংস করে। তদুপরি মিশরে নিয়ে যাওয়ার নাম করে বণিকরা পথিমধ্যে সুকৌশলে জাহাজের গতি পরিবর্তন করে জাহাজগুলিকে কনস্টান্টিনোপলের দিকে চালিত করে। ধর্মোন্মাদ ক্রুসেডাররা বহুদিনের সমৃদ্ধ, সুন্দরী নগরী কনস্টান্টিনোপলকে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। যে বাইজেন্টাইন সম্রাটের আবেদনে একদিন ক্রুসেডের সূত্রপাত হয় তা শেষপর্যন্ত তাঁরই রাজধানীর ধ্বংস ডেকে আনে। নিষ্ঠুর ক্রুসেডাররা শুধু লোকজন হত্যা করে, লুঠতরাজ করেই ক্ষান্ত হয়নি, সুন্দর সুন্দর শিল্পকলা ও

www.pathagar.com

স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি, দীর্ঘদিনের সাধনায় সঞ্চিত বাইজেন্টাইন লাইব্রেরির মূল্যবান গ্রন্থসমূহ ও প্রাচীন বিজ্ঞানের অমূল্য গবেষণার সম্পদ যেখানে রক্ষিত ছিল, কতকগুলি ধর্মোন্মাদের হাতে তা নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস হল। ১২০৪ সালে এ ঘটনা ঘটে।

পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট প্রথমে এই ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদ করলেও প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের মিলনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় তিনি এ ব্যাপারে আর বেশিদূর অগ্রসর হন নি। এরপরই কনস্টান্টিনোপলে ল্যাটিন চার্চের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য এ অধিকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

চতুর্থ ক্রুসেডই মোটামুটিভাবে সর্বশেষ বড় রকমের অভিযান। এর পরে আরও কয়েকটি ছোটখাট ক্রুসেড সংঘটিত হয়। তাদের মধ্যে শিশুদের ক্রুসেড অন্যতম। ধর্মীয় উন্মাদনা ও হীন স্বার্থবোধ কতখানি মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, এ ক্রুসেড তার আরেকটি প্রমাণ। ইউরোপের সকল দেশের শিশুদের একত্রে সমবেত করে জাহাজযোগে প্রেরণ করা হয়। পথিমধ্যে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও ক্লান্তিতে অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করে ও বাকি হতভাগ্য শিশুদের ইতালীয় বণিকগণ ক্রীতদাসরূপে আরব বণিকদের নিকট বিক্রি করে।

প্রতিটি সামরিক অভিযানের ব্যর্থতায় ইউরোপের খ্রিস্টানগণের মনোবল ক্রমশই ভেঙে পড়তে থাকে। কাজেই পোপের পুনঃপুনঃ আবেদন মানুষের মনে আর সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়নি।

ইতিমধ্যে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর শাসনের পর খ্রিস্টানরা ১২৬১ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টীয়গণ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল থেকে বিতাড়িত হয়। এরপর ল্যাটিন ও গ্রিক (বাইজেন্টাইন) গির্জার মধ্যে পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পায়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ক্রুসেডের উন্মাদনা কমে আসে। ১২৯২ সালের পর আর কোনো ক্রুসেড হয়নি। পোপ যদিও ক্রুসেডের নামে অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন, ক্রমেই তা ব্যর্থ হয়। জনগণ বিদ্রূপ করে পোপের প্রতিনিধির সামনেই ভিক্ষুককে পয়সা দিত কিন্তু ক্রুসেডের জন্য দিত না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সংঘটিত অষ্টম ক্রুসেডই শেষ ক্রুসেড এবং এর মধ্যেই প্রাচ্যদেশে অর্জিত সকল এলাকাই খ্রিস্টানদের হাত ছাড়া হয়ে যায়।

দু'শ বছর স্থায়ী ক্রুসেড পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সাধিত না হলেও পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

ক্রুসেডের ফলে সর্বাপেক্ষা লাভবান হয় উত্তর ইতালীর নগরসমূহ যথা, জেনোয়া, ভেনিস ও পিসা। চতুর্থ ক্রুসেডে বিধ্বস্ত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্য পথগুলি ইতালীর নাবিকদের হস্তগত হওয়ার ফলে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে এদেরই পুরোপুরি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের বন্দরগুলি ইতালির নাবিকদের দখলে আসে এবং কৃষ্ণসাগরের উপকূলে তারা নিজস্ব বাণিজ্য ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে।

এর ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক আবার প্রতিষ্ঠিত হয়—যা একদা রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। নতুন নতুন পণ্যসামগ্রী প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজারে চালান যাওয়ার ফলে ইউরোপবাসী সর্বপ্রথম এগুলোর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। চাল, সুতীবস্ত্র, সিল্ক, আয়না, মশলা, সুগন্ধী, বিলাসদ্রব্য, লেবু, এপ্রিকট, তরমুজ প্রভৃতি আরব বণিকদের থেকে ক্রয় করে ইতালির বণিকগণ ইউরোপে পাঠাত। এর ফলে ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও সামন্তপ্রভুদের জীবনে বিলাসিতার প্রচলন ঘটে। অন্যদিকে প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী আমদানির ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনেও সচ্ছলতার আভাস দেখা দেয়। ব্যবসাবাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বহু বছরের সামন্ত অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে।

www.pathagar.com

ক্রুসেডের ফলে সামন্ত প্রথার ভাঙ্গন অন্যভাবেও ত্বরান্বিত হয়। বহু সামন্ত জমিদার ক্রুসেডে যোগদানের উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্যে তাদের জমিজমা এমন কি শহরগুলির উপরও তাদের সামন্ত স্বত্ব বিক্রি করে দেয়। এদের অধিকাংশই ক্রুসেডে মারা যায় এবং যারা শেষপর্যন্ত ফিরে আসতে সক্ষম হয় তারাও নিঃস্ব কপর্দকশূন্য ভিখারীতে পরিণত হয়। ফলে সাধারণভাবে সমগ্র ইউরোপে সামন্তপ্রভুদের শক্তি ভীষণভাবে খর্বিত হয়। অন্য দিকে এর সুযোগ নিয়ে কয়েকটি দেশের রাজা (যেমন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি) নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। সামন্তপ্রভুদের উচ্ছেদ করে তাঁরা নিজেরাই প্রজাদের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর আরোপ করেন। অন্যদিকে ক্রুসেডের দ্বারা সারা ইউরোপে যে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে পোপের ক্ষমতা প্রথম দিকে বৃদ্ধি পেলেও ক্রমশ যখন ব্যর্থ অভিযানের কাহিনী ইউরোপের জনগণের কর্ণগোচর হতে থাকল—তখন ধীরে ধীরে পোপের প্রতি লোকের আস্থাও কমে যেতে লাগল। ক্রুসেডের শেষে পোপ ও ধর্মের প্রতি সাধারণভাবে জনগণের বিশ্বাস আরও বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। এবং পোপ ও তাঁর সহযোগীদের কার্যকলাপ তখন থেকেই মানুষের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের সৃষ্টি করে।

কিন্তু ক্রুসেডের ফলে ইউরোপবাসীর মানসিক চেতনার যে প্রসার ঘটে তার মূল্যই সর্বাধিক। প্রাচ্যের উন্নততর সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার ফলে সমগ্র ইউরোপের চেতনা জগতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আরবদের মাধ্যমেই কেবল ইউরোপের জনগণ প্রাচীন গ্রিস ও রোমের বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার সাথে পরিচিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান বিশেষভাবে তাদের প্রভাবিত করে। মুসলমানরা গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় রচিত গ্রেকো রোমান গ্রন্থগুলো আরবিতে অনুবাদ করেছিল। সেগুলো আরবি থেকে পুনরায় ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

অন্যদিকে নতুন দেশ ও জনগণের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে ও রীতিনীতিতে তারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। সর্বোপরি ক্রুসেডের ফলে মানুষের মনে অজানাকে জানার যে আগ্রহের সৃষ্টি হয় তা শুধু পরবর্তীকালের ভৌগোলিক আবিষ্কারেরই প্রেরণা জোগায়নি, মধ্যযুগের বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করে তার চেতনাকে বহুদূরে প্রসারিত করেছে। এই চেতনার উৎকৃষ্টতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের মাধ্যমে।

সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়

ইউরোপে কৃষক বিদ্রোহ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ইউরোপে একদা সামন্তপ্রথার উৎপত্তি হয়েছিল। কালক্রমে উৎপাদন ব্যবস্থায় নতুন উপাদান যুক্ত হওয়ার ফলে সামন্তপ্রথার অবক্ষয় সূচিত হল। সামন্ত যুগে বিদ্যমান বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর পারস্পরিক বিরোধিতা এ অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছিল।

সামন্তযুগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর বিরোধ সামন্ত যুগের সামাজিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করেছিল। যথা : (১) সামন্তপ্রভু ও কৃষক তথা ভূমিদাসের বিরোধ (২) সামন্তপ্রভুদের নিজেদের

www.pathagar.com

মধ্যকার অধিকারের লড়াই (৩) গিল্ডগুলোতে কারিগর (গিল্ড মাস্টার) এবং জার্নিম্যানদের বিরোধ (৪) বণিক তথা বার্গারদের সাথে সামন্তশক্তির বিরোধ।

এদের মধ্যে সামন্তপ্রভু এবং কৃষকদের মধ্যকার বিরোধটাই সামন্তযুগের বিকাশকে মূলত প্রভাবিত করেছিল। সামন্ত অর্থনীতি এবং সামন্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এই দুই মূল শ্রেণীকে কেন্দ্র করে। সামন্ত অর্থনীতি এবং উৎপাদনের ভিত্তি ছিল কৃষক—বার্গার নয়, গিল্ড মাস্টার নয়, জার্নিম্যান নয়। সামন্ত ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছিল কৃষক ও ভূস্বামীর সম্পর্কের দ্বারা। এবং এই সামন্তব্যবস্থার পক্ষছায়ায় জন্মলাভ করেছিল গিল্ডগুলো এবং বণিকশ্রেণী। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, প্রথম অবস্থায় গিল্ডগুলো ছিল সামন্ত কৃষি অর্থনীতিরই পরিপুরক।

প্রথম অবস্থায় সামন্তব্যবস্থা মানব সভ্যতার অগ্রগতির বাহন হিসাবে কাজ করেছে। লৌহযুগের যে সকল যান্ত্রিক আবিষ্কারের প্রয়োগ ইতিপূর্বে সম্ভব হয় নি অথবা হলেও কেবল কয়েকটা শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, সামন্ত যুগে সে সকলের সফল প্রয়োগের সাহায্যে সুবিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল দৃঢ়ভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কালক্রমে সামন্তব্যবস্থাই আবার উৎপাদন প্রথার বিকাশের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সামন্তযুগের উৎপাদন প্রথা খুবই অনুন্নত হওয়ার ফলে অনবরত শোষণের মাত্রা বৃদ্ধিই ছিল শাসকশ্রেণীর ধনবৃদ্ধির একমাত্র পথ। সামন্ত কৃষিব্যবস্থায় শুধু যে উৎপাদন হার কম ছিল তাই নয়, ক্রমে জমির ফলনও কমে গিয়েছিল। জমির ফলন বৃদ্ধিতে কৃষকদের একেবারেই উৎসাহ ছিল না। কৃষকেরা জানত যে ফসল বৃদ্ধি মানেই জমিদারের হাতে নতুন কর চাপানোর অজুহাত তুলে দেয়া। ভোগলিপ্সু পরস্বার্থহারী জমিদারের একমাত্র চিন্তা ছিল কীভাবে প্রজাকে ঠকিয়ে বেশি কর আদায় করা যাবে। এভাবে মাত্রাতিরিক্ত শোষণের ফলে কৃষকরা উৎপাদনে উদাসীন হয়ে পড়ে এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা সত্যি সত্যি কমে যায়।

এভাবে অবিরাম শোষণে জর্জরিত কৃষকের দরিদ্রতার সাথে উৎপাদনের বন্ধ্যাত্ব যুক্ত হয়ে সামন্তব্যবস্থায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে।

কিন্তু চরম শোষিত ও নিষ্পেষিত হলেও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হওয়া খুবই কঠিন ছিল। কৃষকরা বিস্তৃত ভূখণ্ডে ছড়িয়ে থাকার ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ, আলাপ আলোচনা, বোঝাপড়া অথবা সংহতি গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এছাড়া প্রভুর নিকট নতি স্বীকারের যুগসঞ্চিত অভ্যাস, অস্ত্রচালনা শিক্ষা এবং অভ্যাসের অভাব, বিভিন্ন সামন্ত প্রভুদের স্বভাব এবং প্রয়োজনের তারতম্যের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে শোষণের মাত্রার পার্থক্য এবং সে কারণে এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার সুযোগের অভাব—এসব কিছু মিলে কৃষকদের অবদমিত করে রাখত। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই মধ্যযুগে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছোট বড় কৃষক বিদ্রোহ ঘটলেও ষোল শতকের আগে ব্যাপক এবং সাধারণ কৃষক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়নি।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত জ্যাকুয়ারি বিদ্রোহের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত এই কৃষক বিদ্রোহ সমগ্র ফ্রান্সে এক ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করে। একদিকে ইংরেজ ও ফরাসি সৈন্যদের মিলিত অত্যাচার—অন্যদিকে ফরাসি সামন্তপ্রভুদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায় শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সের কৃষকদের সাধারণ ভাবে বলা হত জ্যাক্স। এই নাম থেকে জ্যাকুয়ারি নামটির উৎপত্তি।

www.pathagar.com

১৩৫৮ সালের মে মাসে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহ শুরু হয়। কোনোরকম পূর্ব প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিদ্রোহের আরম্ভ। সামন্তপ্রভুদের সমূলে বিনাশ করা ছাড়া কৃষকের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই দলবদ্ধভাবে সামন্তপ্রভুদের দুর্গগুলি আক্রমণ করে ধ্বংস করা ছাড়াও কৃষকরা বহু ক্ষেত্রে তাদের প্রাণসংহারও করে।

গুইলাম ক্যালে নামক একজন কৃষক নেতা অসংগঠিত বিদ্রোহী কৃষকদের একত্রিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সর্বদা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বাস করার দরুন বিদ্রোহী কৃষকদের একদলের সাথে আরেক দলের কোনোরূপ যোগাযোগ ছিল না। কাজেই নিজ নিজ সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে এককভাবে আক্রমণ পরিচালনা ছাড়া সুসংগঠিতভাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণে তারা অস্বীকৃতি জানায়। ফলে এ বিদ্রোহ অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সামন্তপ্রভুরা প্রথমে হতচকিত ও দিশেহারা হয়ে পড়লেও অল্পদিনের মধ্যে নিজেদের সুসংগঠিত করে নেয় এবং নির্মম হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করে। কৃষকদের গ্রামগুলিতে ব্যাপক হারে আগুন লাগিয়ে শস্যক্ষেত্র অগ্নিদগ্ধ করে তাদের এমন নৃশংসভাবে হত্যা করে যে, বহুদিন পর্যন্ত ফ্রান্সের বিস্তৃত অঞ্চলে জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না।

চতুর্দশ শতাব্দীতে সংঘটিত ইংলন্ডের কৃষক-বিদ্রোহ আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ইংল্যান্ডের কৃষকবৃন্দ ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষকদের মতোই সামন্তপ্রভুদের নির্যাতন ও শোষণের শিকার হয়েছিল। ইংল্যান্ডের শহরগুলি গড়ে ওঠার সাথে সাথে এ নির্যাতনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। শহরের বিলাসদ্রব্য ক্রয়ের জন্য সামন্তপ্রভুরা কৃষকদের কাছ থেকে অতিমাত্রায় খাজনা আদায় করতে থাকে।

এ ছাড়া চতুর্দশ শতাব্দীতে ভয়াবহ প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবে ইংল্যান্ডের এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়। তখন সার্ফদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাদের চাহিদাও বেড়ে যায়। প্রত্যেক সামন্তপ্রভু তাদের সার্ফকে ধরে রাখার চেষ্টা করে এবং তাদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে থাকে। কৃষি মজুরদের অল্প মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা হয় এবং পার্লামেন্টের মাধ্যমে আইন পাস করিয়ে এদের মজুরির হার কমানো হয়। জেল, জরিমানা, চাবুকমারা ইত্যাদি শাস্তির ভয় দেখিয়ে এই আইন কার্যকর করা হয়।

ইংল্যান্ডের রাজাও তাঁর খাজনার হার বৃদ্ধি করতে শুরু করেন—কারণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে দেশে নিদারুণ অর্থ-সঙ্কট দেখা দেয়। রাজার কর্মচারীগণ জনগণের বিশেষ করে কৃষকদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে কর আদায় শুরু করে।

এ সমস্ত কারণই কৃষকদের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ১৩৮১ সালের মে মাসের এক দিনে লন্ডনের উত্তরাঞ্চলে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে রাজার কর আদায়কারী কর্মচারীদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। এ ঘটনাই বৃহত্তর বিদ্রোহের সঙ্কেতরূপে কাজ করে।

কুড়াল, তীর ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কৃষককূল প্রায় প্রতিটি গ্রামে রাজকর্মচারী ও অর্থ আদায়কারীদের আক্রমণ করে। তারা বিশেষভাবে সামন্তপ্রভুদের ঘরবাড়ি ও মঠগুলি জ্বালিয়ে দেয়। এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন প্রখ্যাত যোদ্ধা ও সংগঠক ওয়াট টাইলার।

দুটি পৃথক স্থানে বিদ্রোহীরা সমবেত হয়। লন্ডন শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলের বিদ্রোহীরা লন্ডনের দিকে ধাবিত হয়। স্থানীয় দরিদ্র লন্ডনবাসীদের সহায়তায় তারা শহরে প্রবেশ করে এবং আদালত, বিচারকদের বাসগৃহ, রাজকর্মচারীদের বাসস্থান প্রভৃতিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। রাজা তাঁর পারিষদদের নিয়ে প্রাণভয়ে লন্ডন টাওয়ারে আশ্রয় নেন। বিদ্রোহীরা টাওয়ার অবরোধ করে রাজাকে হত্যা করার ভয় দেখালে রাজা শেষপর্যন্ত তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজি হন। ওয়াট

www.pathagar.com

টাইলারের নেতৃত্বে কৃষকগণ রাজার নিকট ভূমিদাসপ্রথার উচ্ছেদ, কর্ভি ইত্যাদি বেগার পরিশ্রমের অবসান এবং কৃষিশ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতির দাবি জানায়। তাছাড়া তারা সামন্তপ্রভুদের দ্বারা অধিকৃত পশুচারণ ভূমি, বনভূমি ও অন্যান্য সর্বজনীন জমি তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি পেশ করে।

রাজা বিদ্রোহীদের সাথে আচরণে শঠতার আশ্রয় নেন। তিনি কৃষকদের দাবি মেনে নেয়ার মৌখিক স্বীকৃতি দেন বটে কিন্তু তার সৈন্যদল সামন্তপ্রভু ও শহরের ধনী ব্যবসায়ীদের সাথে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে ও ওয়াট টাইলারকে হত্যা করে। নেতার এই আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে কৃষকগণ দিশাহারা হয়ে পড়ে। তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সৈন্যদল তাঁদের নির্মমভাবে ধ্বংস করে। গ্রামে গ্রামে সামন্তপ্রভুরা কৃষকদের বিরুদ্ধে তাদের তাঁবেদার সৈন্যদের লেলিয়ে দেয়। কৃষকদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে মৃতদেহগুলি গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়—ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ বিদ্রোহ করতে সাহস না পায় সেই উদ্দেশ্যে।

প্রাথমিকভাবে এ বিদ্রোহ দমন করা হলেও ইংল্যান্ডের সামন্তপ্রভুরা ১৩৮১ সালের পর কোনো সার্ফ-এর কাছ থেকে কর্ভি বা বেগার আদায় করতে সাহসী হয় নি। অনেকে আবার মুক্তিপণের বিনিময়ে সার্ফদের মুক্তি দিয়ে দেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে ইংল্যান্ডে ভূমিদাস প্রথা মোটামুটি অবলুপ্ত হয়। কৃষকদের কাছে জমি ইজারা দেয়ার পরিবর্তে ইংল্যান্ডের সামন্তপ্রভুরা তখন ভেড়া চরাবার উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহারের কাজেই অধিক উৎসাহী হয়ে পড়ে।

ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ব্যতীত বোহেমিয়ার কৃষক বিদ্রোহ চতুর্দশ শতাব্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এ বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল একদিকে বোহেমিয়ায় জার্মান পুঁজিপতি ও সামন্ত জমিদারদের আধিপত্য ও অন্যদিকে বোহেমিয়ার জমিদার ও চার্চের অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোহেমিয়া চতুর্দশ শতাব্দীতে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিচালিত হয়েছিল। এই সমৃদ্ধিই এর সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় জার্মানির ঔপনিবেশিক শাসন। বোহেমিয়ার জমিজমা, খনি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চার্চ—সব কিছুর অধিকর্তা জার্মানরা। এদের শোষণে বোহেমিয়ার জনগণ নিঃস্ব, রিক্ত ও সর্বহারা। বোহেমিয়ার গুটিকয়েক ক্ষুদ্র জমিদারই শুধু কিছু সম্পদের মালিক এবং তারাও শোষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বোহেমিয়ার চেক জনগণই প্রথম সোচ্চার হয় এই ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ধর্মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনহাস্। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি বিদেশী শোষণ, দেশীয় নির্যাতন ও চার্চের দুর্নীতির স্বরূপ তুলে ধরেন জনগণের নিকট। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য দলে দলে মানুষ ছুটে আসত। জনগণের মনে বিক্ষোভ সঞ্চারিত করার অভিযোগে জন হুসকে কন্সট্যান্স-এর কাউন্সিল-এ (১৪১৫) অভিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্বলিত হয়। বিদ্রোহীরা জন হাসের নামের সাথে নিজেদের নাম যুক্ত করে হাস্পন্থী নামে পরিচয় দেয়; সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি গড়ে তুলল তারা। সুরক্ষিত দুর্গের আকারে প্রস্তুত এই ঘাঁটিকে বলা হত ট্যাবর। ১৪১৯ সাল থেকে ১৪৩৭ সাল পর্যন্ত হাসপন্থীরা বিদেশী শাসন, দেশীয় শোষক ও চার্চের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং কয়েকটি স্থানে বিজয়লাভ করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত নরম পন্থীদের আপোসমূলক মনোভাব

www.pathagar.com

ও দলীয় বিভেদ ঐ বিদ্রোহের শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনে।

সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও হাসপন্থীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ শেষপর্যন্ত বোহেমিয়ায় জার্মান আধিপত্যের অবসান ঘটায়। এ বিদ্রোহ চার্চের ক্ষমতা খর্ব করে এবং ভবিষ্যতের জার্মানির ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। সর্বোপরি এ বিদ্রোহ বোহেমিয়ার জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের পথ খুলে দেয়।

মধ্যযুগের কৃষক বিদ্রোহগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হলেও. সামগ্রিকভাবে সামন্তপ্রথার অবসান ঘটাতে এরা সক্ষম হয়নি। কৃষকরা বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামে অবস্থান করত বলে সুসংগঠিতভাবে তারা সংঘবদ্ধ হতে পারেনি এবং স্পষ্ট শ্রেণী চেতনাও তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারেনি। প্রত্যেক গ্রামের কৃষকবা তাদের নিজের সামন্তপ্রভুকেই সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করত এবং তাকে ধ্বংস করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কাজেই ব্যাপকভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদান তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা হল, সামন্তপ্রভুদের সবচেয়ে বড় শত্রু যে উদীয়মান বার্গার শ্রেণী তাদের সাহায্য ব্যতীত একাকী সংগ্রামে জয়ী হওয়া মধ্যযুগের কৃষকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু কৃষকরা তাদের পক্ষে মিত্রশক্তি কারা সেটা না বুঝেই অনেক সময় বার্গারদেরও তারা শত্রু মনে করেছে। এ সমস্ত কারণই এ সকল কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। কাজেই পরবর্তীকালে সামন্তপ্রথার অবসান ঘটিয়েছে কৃষকবিদ্রোহ নয় বরং বার্গারদের শক্তি। দীর্ঘদিন ক্ষয়প্রাপ্ত সামন্তপ্রথা তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পেরে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলল। বার্গারদের সাথে অবশ্য কৃষক ও শহরের জনগণ এসে যোগ দিয়েছিল বলেই শেষপর্যন্ত সামন্তবাদের উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছিল।

সামন্তপ্রথার অবক্ষয়ের আরেকটি কারণ এর অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি। সামন্তপ্রথায় প্রাথমিক উৎপাদনকারী হল কৃষকশ্রেণী, কিন্তু অবিরত শোষণের দরুন তাদের শ্রমশক্তির পুরোপুরি ব্যবহার সম্ভব হত না। কৃষক জানত যে, সে যতই উৎপাদন বৃদ্ধি করুক না কেন তা কেবল সামন্তপ্রভুর খাজনা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। এর ফলে সামন্ত যুগে কৃষিতে যতখানি যান্ত্রিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল তাও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায়নি শুধুমাত্র কৃষকদের অনীহার ফলে। অন্যদিকে অনুৎপাদক সামন্তশ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উৎপাদনে অংশগ্রহণ না করার ফলে সামন্তপ্রভুদের কাজই ছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা, যুদ্ধ ও হানাহানিতে লিপ্ত থাকা। তারা শুধু কৃষকদের শোষণ করেই ক্ষান্ত থাকত না—ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও ধনবৃদ্ধির লালসায় তারা অবিরতই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। সামন্তপ্রভুরা যতই তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে, ততই তাদের ভ্যাসালের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ভ্যাসাল ও তাদের পরিবার-পোষ্যদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে এমন পরিমাণ হয়ে দাঁড়াল যে, পরশ্রমজীবী মানুষরা বিপুলহারে কৃষকদের শোষণ করা শুরু করল। অন্যদিকে যুদ্ধ-বিবাদ প্রভৃতির ফলে সামন্তপ্রভুদের খরচ অসম্ভব বেড়ে গেল এবং সমস্ত ব্যয়ভারই গিয়ে পড়ল কৃষক সম্প্রদায়ের উপর। কিন্তু কৃষকদের পক্ষে আর এই খরচ জোগানো সম্ভব হচ্ছিল না। যতই তাদের নির্যাতন করা হোক না কেন সম্পদের পরিমাণ আর বাড়ছিল না। সামন্তপ্রভুরা এই সঙ্কট যতই এড়াবার চেষ্টা করছিল ততই তারা আরও গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত হচ্ছিল। বস্তুত সামন্তপ্রথাকে টিকিয়ে রেখে এই সঙ্কট কখনই এড়ানো সম্ভব ছিল না। কাজেই সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত সামন্তসমাজ ক্রমশই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আর এর বিরোধী শক্তি রূপে আবির্ভূত হচ্ছিল বার্গারশ্রেণী।

www.pathagar.com

উদীয়মান বার্গারশ্রেণীই ছিল সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল অংশ। রাজশক্তির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তারই সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব এরা ক্রমেই বৃদ্ধি করে যাচ্ছিল। অপ্রয়োজনীয় ও নিষ্কর্মা জমিদার শ্রেণী যখন সমাজ প্রগতির পথে অন্তরায়রূপে বিরাজ করছিল, তখন এই বার্গার শ্রেণীই সম্পদ সঞ্চিত করে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে উৎপাদন শক্তির ক্রমিক বিকাশ ঘটাতে থাকে। এই বার্গারশ্রেণীর নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল সামন্তপ্রথার অবসান ঘটানো। এর জন্যে প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রক্ষমতায় বুর্জোয়া শ্রেণীর অভিষেক। বুর্জোয়াদের প্রয়োজন যেমন খুশি কেনা বেচার স্বাধীনতা; কিন্তু সামন্ত ব্যবস্থার শত সহস্র বাধানিষেধের বেড়াজালের মধ্যে তা সম্ভব নয়। বুর্জোয়া চায় তার উৎপাদনের কাজে যত খুশি মজুর নিয়োগ করতে, কিন্তু কৃষক বাঁধা পড়ে আছে গ্রামের সামন্তপ্রভুর জমিতে। তাই সামন্তপ্রথার মূল উৎপাটন ভিন্ন বুর্জোয়া শক্তির বিকাশের আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

তাই সামন্তপ্রথার উচ্ছেদের জন্যই নিয়োজিত হল বুর্জোয়ার সমস্ত শক্তি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কখনও পার্লামেন্টের মাধ্যমে, কখনও গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় অভিষেক সম্পন্ন হল। এ সময়ের সকল রাজনৈতিক ঘটনা ও সংঘাতের মূল বিষয় একটিই—তা হল সামন্ত শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সংঘর্ষ এবং শেষোক্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল।

ইউরোপে রাজশক্তির উদ্ভব

বিভিন্ন জাতীয়রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে মধ্যযুগের শেষদিকে উদ্ভূত বণিক সম্প্রদায় যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হল সামন্তপ্রভু ও তাদের সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা। ক্রুসেডের পরে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে সাথে বহির্বাণিজ্যের প্রসারও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আরব দেশগুলি থেকে আগত নতুন নতুন পণ্যসম্ভার নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে চলাকালে বণিকগণ এই সামন্ত জমিদারদের নিয়োজিত লুটেরা ও ডাকাতদের হাতে পড়ত। অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে। ফলে বণিক সম্প্রদায় সারা দেশে শাসন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করে। সামন্তপ্রভুদের খামখেয়ালী ও ঝগড়া বিবাদ—এসবও ছিল বাণিজ্য বিস্তারের পথে প্রবল বাধা। এসকল বাধা দূর করার জন্য প্রয়োজন ছিল সারা দেশ জুড়ে এক কেন্দ্রীয়শক্তি স্থাপন করা, যে শক্তি অরাজকতা এবং অনিশ্চয়তা দূর করে শাসন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নিরাপত্তা ছাড়াও সারা দেশে ঐক্য, সংহতি এবং বিধি-ব্যবস্থার অভিন্নতাও প্রয়োজন বাণিজ্যিক অগ্রগতির জন্য। এক এক জমিদারের সম্পর্কে আস্থা স্থাপন করাও কঠিন, আবার এতে ঝামেলাও কম না, জায়গা বদলালেই টাকা বদলাতে হত। সর্বোপরি ছিল জমিদারদের হাজার রকমের ট্যাক্সের বোঝা—নদী পেরোতে ট্যাক্স, রাস্তা পেরোলে ট্যাক্স, ধুলো উড়লে ট্যাক্স, ট্যাক্সের কোনো শেষ ছিল না।

www.pathagar.com

এ সমস্ত কারণে বার্গার শ্রেণী এবং তাদের প্রভাবাধীন নগরগুলোর প্রধান চেষ্টা দাঁড়িয়েছিল খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন জমিদারি এলাকার অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে এক রাষ্ট্র, এক নিয়ম, একই মুদ্রা, একই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য। দেশের রাজার হাত শক্তিশালী করে তাঁর দ্বারা সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে বার্গারশ্রেণী রাজাকে অস্ত্র, সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। এই বার্গারদেরই সহায়তায় ইউরোপের সর্বত্র রাজন্যবর্গের অধীনে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

বারুদের প্রচলন এবং ইউরোপে কামান বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে এর ব্যাপক ব্যবহার এ রাজশক্তিকে গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। জমিদারদের শক্তিশালী দুর্গগুলি রাজকীয় বাহিনীর কামানের গোলার আঘাতে একে একে ভেঙে পড়ল। আর এই দুর্গগুলিই ছিল জমিদারদের ক্ষমতার প্রকৃত শক্তি। দুর্গগুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে সামরিকভাবে পর্যুদস্ত সামন্তপ্রভুদের উপর ক্ষমতা বিস্তার করা রাজার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

ফ্রান্সের জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

শার্লামেনের সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর ফ্রান্সে মোট চৌদ্দটি সামন্ত রাজ্যের আবির্ভাব হয়। এর মধ্যে ডিউক অব প্যারিসকে নামে ফ্রান্সের রাজা বলে স্বীকার করা হলেও আসলে প্রত্যেকটি সামন্তরাজ্য স্বাধীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সত্তারূপে বিরাজ করতে থাকে। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সেই সামন্তপ্রথা পরিপূর্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, ফলে সামন্তপ্রভুদের স্বেচ্ছাচারের পরিপূর্ণ রূপ ফ্রান্সেই দেখা দেয়। প্রতিটি সামন্ত প্রভুর নিজস্ব টাকশালে মুদ্রা প্রস্তুত হত, নিজস্ব আদালতে বিচার কার্য সম্পন্ন হত, নিজস্ব সৈন্যবাহিনী প্রজাপীড়নে ও অন্য সামন্তপ্রভুর উপর হামলায় নিয়োজিত হত, সর্বোপরি রাজার নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে সামন্তপ্রভুরা ইচ্ছামতো কৃষকদের উপর শোষণ চালিয়ে যেত। নর্মান্ডি, অ্যাকুইটেন, বার্গান্ডি, ফ্লান্ডার্স, শ্যাম্পেন ও টুলো—প্রত্যেকটির সামন্ত জমিদার ক্ষমতার দিক দিয়ে ছিলেন ফ্রান্সের রাজারও উপরে। এর মধ্যে অর্ধেক আবার ছিলো ইংল্যান্ডের রাজার অধীনে। নর্মান্ডি, অ্যাকুইটেন প্রভৃতির অধিকারী ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন আইনত ফ্রান্সের রাজার ভ্যাসাল। কিন্তু কার্যত তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান এবং ফ্রান্সের রাজার সবচেয়ে বড় শত্রু। ফ্রান্সের রাজার হাতে ছিল শুধুমাত্র প্যারিস ও অর্লি।

৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের ডিউকহিউ ক্যাপেট ক্যাপেসিয়ান রাজবংশের প্রথম নরপতি হিসাবে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এ-বংশের নরপতিগণ ফ্রান্সের সামন্তশক্তিকে পরাভূত করে রাজশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। এ-বংশের নরপতি ষষ্ঠ লুই নিজের ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সামন্তপ্রভুদের দমন করে এদের অত্যাচারের হাত থেকে বণিক সম্প্রদায়কে বহুলাংশে রক্ষা করেন। ক্যাপেসিয়ান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ফিলিপ অগাস্টাস শুধু ফ্রান্সের সামন্ত জমিদারদের হাত থেকে বহু এলাকাই উদ্ধার করেন নি, ইংল্যান্ডের রাজা জনকে পরাজিত করে নর্মান্ডি ও আঞ্জু প্রদেশ দুটি মুক্ত করে নেন। উদ্ধারকৃত অঞ্চলগুলিতে রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজার নিজস্ব বাহিনী এগুলোর প্রহরায় মোতায়েন হয়।

ফিলিপের পৌত্র নবম লুই পরবর্তী পর্যায়ে ফ্রান্সের সামন্তপ্রভুদের দমন করেন। তাঁর সময়ে ফ্লান্ডার্স, ব্রিটানি, গ্যাসকনি, বার্গান্ডি প্রভৃতির ডিউকগণ একত্রে বিদ্রোহ করেন এবং লুই এই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে লুই রাজশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং তাঁর

www.pathagar.com

অনুচরবৃন্দ দেশের সর্বত্র রাজার শাসন প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্সের প্রায় সর্বত্র (ইংল্যান্ড অধিকৃত অ্যাকুইটেন ব্যতীত) ফ্রান্সের রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এত বড় দেশ শাসনে প্রায়শ রাজার অর্থের প্রয়োজন হত। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের উপর কর আরোপের উদ্দেশ্যে রাজা এস্টেট্স জেনারেল (Estates General)। নামক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতেন।

যাজক সম্প্রদায়, সামন্তপ্রভু ও অভিজাত বণিকদের দ্বারা গঠিত এই এস্টেটস্ জেনারেল রাজাকে ক্ষুদ্র বণিক ও কৃষকদের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপানোর পরামর্শ দিত। এস্টেট্স জেনারেল-এর সহায়তায় রাজার অর্থাগমের পথ খুলে যায় এবং রাজশক্তির ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ফ্রান্স ইংল্যান্ডের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসে এটা শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৩৩৭—১৪৫৩) নামে পরিচিত। ইংল্যান্ডের রাজা ফ্রান্সে তাঁর হারানো জায়গাগুলি উদ্ধারে সচেষ্ট হন। শিল্পসমৃদ্ধ শহর ফ্লান্ডার্স-এর দখল নিয়ে উভয় দেশের রাজার মধ্যে নতুন করে বিবাদ শুরু হয়। ফ্রান্সের রাজা ফ্লান্ডার্সকে নিজের অধীনে আনতে চেয়েছিলেন, অপরপক্ষে ফ্লান্ডার্স-এর বণিকগণ ইংল্যান্ডের সাথে বাণিজ্যসূত্রে ঘনিষ্ঠতা থাকার দরুন সে দেশের রাজার কাছ থেকে সমর্থন লাভ করে। এই কলহ চরমে উপনীত হয় যখন ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড স্বয়ং ফ্রান্সের সিংহাসন দাবি করে বসেন।

যুদ্ধ প্রধানত ফ্রান্সের মাটিতে সংঘটিত হয়। সবদিক দিয়ে দুর্বল ফ্রান্সের সৈন্যদল ইংল্যান্ডের সৈন্যদলের হাতে নিদারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়। প্রথমে ক্রেসি (১৩৪৬) ও পরে পয়তিয়ার-এর (১৩৫৬) যুদ্ধে পরাজিত ফ্রান্সের রাজাকে বন্দী করে রাখা হয়। উত্তর হতে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ফ্রান্সের এক বিরাট ভূখণ্ড ইংল্যান্ড দখল করে নেয়। ফ্রান্সের এই ঘোর দুর্দিনে যুগপৎ ফরাসি ও ইংরেজ সৈন্যদল লুটপাট ও কৃষকদের উপর নির্যাতন শুরু করে। এর উপর শুরু হয় সামন্ত প্রভুদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ও অকথ্য অত্যাচার। ফ্রান্সের যুবরাজ চার্লস-এর কাছে তাঁর পিতার মুক্তিপণ হিসাবে প্রচুর অর্থ দাবি করা হয়। প্যারিসের নেতৃত্বে উত্তরের শহরগুলি চার্লস-এর কাছে দাবি জানালো দেশের ক্ষমতা এস্টেস্ জেনারেল-এর কাছে তুলে দেবার জন্য। চার্লস তাদের দাবি না মেনে এস্টেস্ ভেঙে দিতে অগ্রসর হলে প্যারিসে এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় কৃষকদের বিদ্রোহ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত এই কৃষকবিদ্রোহ সারা দেশে ফরাসি সামন্তপ্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। "জ্যাকুয়ারি বিদ্রোহ" নামে পরিচিত এই বিদ্রোহ সামন্তপ্রভুদের মনে এমন ত্রাসের সঞ্চার করে যে, তারা নির্মমভাবে এটা দমন করতে অগ্রসর হয়। জ্যাকুয়ারি বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও এটা ফ্রান্সে ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটাতে বহুলাংশে সমর্থ হয়।

কৃষকবিদ্রোহ দমনের পরে ফরাসি সামন্তপ্রভুরা বহুলাংশে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলে এবং রাজাকে সাহায্য করতেও অগ্রসর হয়; তৎসত্ত্বেও ফ্রান্সের বিরাট অংশ ইংল্যান্ডের হাতে ছিল। অর্লি শহরটি তখন ফ্রান্সের সর্বপ্রধান সামরিক ঘাঁটি। ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ শহর প্রায় ২০০ দিন প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ফ্রান্সের এই গভীর সঙ্কটের দিনে কৃষককন্যা জোয়ান অব আর্ক রাজার অনুমতি নিয়ে নেতৃত্ব দানে এগিয়ে এলেন। জোয়ান তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও তেজস্বী

www.pathagar.com

মনোভাবের দ্বারা ভেঙেপড়া সৈন্যদের মনোবল দৃঢ় করতে সক্ষম হলেন। জোয়ানের বীরত্বে মুগ্ধ ফরাসি সৈন্যরা তাঁর নেতৃত্বে অগ্রসর হল অর্লি শহর মুক্ত করতে। কিন্তু সামান্য কৃষককন্যার এতখানি কৃতিত্ব সহ্য হল না সামন্তপ্রভুদের। ইংরেজের পরম বন্ধু বার্গান্ডির ফরাসি ডিউকের হাতে বন্দী হলেন জোয়ান। তাঁকে তুলে দেয়া হল ইংরেজদের হাতে। সে যুগের সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে যা পরিগণিত ছিল—সেই মারাত্মক ডাইনি অপরাধে অভিযুক্ত করে জোয়ানকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। জোয়ানের মৃত্যু হল নৃশংসভাবে, কিন্তু কৃষককন্যা জোয়ান অব আর্ক পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশের নির্যাতিত মুক্তিসংগ্রামী জনগণের কাছে আদর্শের প্রতীকরূপে পরিগণিত হলেন।

জোয়ানের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি। ফ্রান্সের জনগণ অর্লি শহর মুক্ত করে ক্রমশ ইংরেজদের নর্ম্যান্ডি থেকেও অপসারিত করে এবং শেষপর্যন্ত প্যারিস শহরও শত্রুমুক্ত হয়।

১৪৫৩ সালে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। শুধুমাত্র ক্যালে বন্দর ছাড়া সমগ্র ফ্রান্স ইংল্যান্ডের হস্তচ্যুত হয়।

ইংল্যান্ডের হাত থেকে ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চল মুক্ত হওয়ার পরে দেশের একত্রীকরণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হতে থাকে। পরবর্তী রাজা একাদশ লুই তাঁর প্রধান শত্রু বার্গান্ডির ডিউককে পরাজিত করে প্রদেশটি দখল করেন। লুই-এর বংশধরগণ সবশেষে ব্রিটানি প্রদেশটিও দখল করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফ্রান্সের একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়।

একত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের রাজশক্তি পরিপূর্ণ ক্ষমতা লাভ করে। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ফ্রান্সের অসংগঠিত, সামন্ততান্ত্রিক সৈন্যদলের পরিবর্তে একটি সংগঠিত, সুশৃঙ্খল স্থায়ী সৈন্যদল গড়ে তোলা হয়। এদের বেতন দেয়া হত রাজকোষ থেকে। এদের ভরণপোষণের জন্য জনগণের উপর বার্ষিক কর আরোপ করা হয়। এস্টেটস্ জেনারেল-এর সভা আহ্বানের পরিবর্তে রাজা বেতনভোগী কর্মচারীদের দ্বারা রাজ্যশাসন করতে শুরু করেন।

এরপর থেকে সামন্তপ্রভুদের সাহায্য ছাড়াই রাজা নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করতেন ও সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার ফলে বণিকদের তৎপরতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রাজার আনুকূল্যে প্রতিপালিত বণিকরা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। দেশের বাণিজ্যিক নৌবহর তৈরি হয় এবং ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

ইংল্যান্ডে রাজশক্তির অভ্যুদয়

বিভিন্ন বর্বর জাতি যখন পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণ করতে শুরু করে, তখন তাদের কয়েকটি শাখা যেমন—এ্যাঙ্গলি, স্যাক্সন, কেল্ট প্রভৃতিরা রোমান অধিকৃত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়। এ্যাঙ্গলদের নাম থেকেই এই দ্বীপের নাম হয় ইংল্যান্ড। নবম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত রাজ্যগুলির উৎপত্তি ঘটতে থাকে।

একাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডি প্রদেশের ডিউক 'প্রথম উইলিয়াম' ইংল্যান্ড আক্রমণ করেন। ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস-এর যুদ্ধে তিনি সর্বশেষ এ্যাংলো-স্যাক্সন রাজা এডোয়ার্ডকে পরাজিত করে ইংল্যান্ড দখল করে নেন। উইলিয়াম নর্মান বংশোদ্ভূত ছিলেন বলে এ বিজয়কে নর্মান বিজয় বলা হয়। যদিও সমগ্র ইংল্যান্ড পরিপূর্ণভাবে অধিকার করতে উইলিয়ামের বেশ কয়েক বছর সময় লাগে, তবুও এ সময়ের মধ্যে উইলিয়াম তাঁর বিশ্বস্ত নর্ম্যান অনুচর ও

www.pathagar.com

সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে বিজিত অঞ্চলের জমিগুলি বিতরণ করে দেন। সামন্তপ্রথা পরিপূর্ণভাবে ইংল্যান্ডে শিকড় গেড়ে বসে নর্ম্যান বিজয়ের পরেই। বিজিত রাজ্যকে পরিপূর্ণভাবে দখলে রাখার জন্য উইলিয়াম রাজশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ-কারণে তিনি শুধু তার নিজের সামন্ত ভ্যাসালদেরই নয়, তাদের অধস্তন ভ্যাসালদের কাছ থেকেও শপথ আদায় করে নেন। 'স্যালিসব্যারির শপথ' নামে পরিচিত এ-শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সকল সামন্ত জমিদারগণ রাজাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই উইলিয়াম রাজার প্রতি সামন্তপ্রভুদের আচরণ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। কাজেই ভবিষ্যতে সামন্তজমিদারগণ যাতে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ না পায় সেজন্য তিনি তাদের বিক্ষিপ্তভাবে জমি বিতরণ করেন। একই সামন্তপ্রভুর জমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকার দরুন তার পক্ষে সংগঠিত সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে রাজা নিজেও সমগ্র দেশের এক-সপ্তমাংশ জমির মালিক হন। মিলিতভাবে রাজা ও সামন্তপ্রভুগণ কৃষকদের উপর সামন্তশোষণ শুরু করেন। স্বাধীন কৃষকদেরও ভূমিদাসে পরিণত করা হল। মেটায়েজ, বেনালাইটিস, প্রেস্টেশনস কর্ভি প্রভৃতি নির্যাতনমূলক কর আরোপ করা হল কৃষকদের উপর। তা সত্ত্বেও ইউরোপের সামন্তপ্রথার সাথে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত সামন্তপ্রথার। তা হল রাজশক্তির ক্ষমতা অধিক থাকার দরুন সামন্তপ্রভুরা কখনই বিশেষ ক্ষমতা সঞ্চয় করতে পারেনি। উইলিয়ামের উত্তরাধিকারী স্টিফেনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামন্তপ্রভুরা দেশকে সাময়িকভাবে অরাজকতার মুখে নিক্ষেপ করলেও পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় হেনরি আবার তাদের শক্ত হাতে দমন করেন। স্টিফেনের সময়ে তৈরি সামন্তপ্রভুদের দুর্গগুলিকে হেনরি ভেঙে দেন। তিনি দেশের সর্বত্র রাজার প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন সামন্তপ্রভুদের আদালতের স্থলে রাজ আদালত স্থাপন করার উদ্দেশ্যে। স্থানীয় সামন্তপ্রভুদের আইন প্রয়োগের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সর্বত্র রাজার আইন প্রচলন করা হল।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ডে শহরগুলির উৎপত্তি শুরু হয়। প্রথম উইলিয়ামের সময়ে শহরের সংখ্যা ছিল ৮০টি, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এগুলির সংখ্যা উন্নীত হয় ১৬০টিতে। লন্ডন প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। বেশিরভাগ শহর রাজার নিজস্ব এলাকায় গড়ে ওঠে। যদিও রাজা এ শহরগুলির কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতেন, তথাপি তারা রাজাকেই সমর্থন করে; কারণ সামন্তপ্রভুদের শোষণ তাদের কাছে ছিল আরও ভয়াবহ। অনেক সামন্তপ্রভুর বদলে একজন রাজাকেই তারা অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করত।

দ্বিতীয় হেনরির পুত্র জনের রাজত্বকালে সামন্তপ্রভুরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ক্রুসেডের দরুন সামন্তপ্রভুদের উপর কর বৃদ্ধি এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাসের কাছে রাজা জনের পরাজয় প্রভৃতি কারণে সামন্তপ্রভুরা রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়। তারা রাজাকে দিয়ে বলপূর্বক ম্যাগনা কার্টা (১২১৫) নামক দলিলে সই করিয়ে নেয়। ম্যাগনা কার্টায় সামন্তপ্রভুদের কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত হয়। যদিও এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি সামন্ত দলিল, তথাপি পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সংঘটিত রাজা ও পার্লামেন্টের সংঘর্ষে ম্যাগনা কার্টাকে ইংল্যান্ডের জনগণের অধিকারের সনদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ দলিলে রাজার ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছিল, তাই পরবর্তীকালে রাজার ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে ম্যাগনা কার্টায় বর্ণিত ধারাগুলির উদ্ধৃতি দেয়া হত।

রাজার বিরুদ্ধে সামন্তপ্রভুদের শক্তি সঞ্চয় কৃষকদের উপর সামন্ত নির্যাতন আরও বাড়িয়ে

www.pathagar.com

দেয়। এই নির্যাতন ও শোষণ এক পর্যায়ে এতদূর পৌঁছায় যে, শেষপর্যন্ত সমগ্র ইংল্যান্ডে ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াট টাইলর-এর নেতৃত্বে সংঘটিত এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে পূর্বেই আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এই বিদ্রোহ দমিত হলেও এর পরিণতিস্বরূপ ইংল্যান্ডে ব্যাপকভাবে সার্ফরা মুক্তিলাভ করে।

অন্যদিকে সামন্তপ্রভু রাজার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে শুরু করে। ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট-এর অধিবেশন ডাকা হয়। সাইমন ডি মন্টফোর্ডের নেতৃত্বে এই পার্লামেন্ট রাজা তৃতীয় হেনরির বিরুদ্ধে লড়াই-এ অবতীর্ণ হয়! যাজক ও সামন্তপ্রভুদের দ্বারা গঠিত এই পার্লামেন্টে এখন থেকে বণিক সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী রাজা প্রথম এডোয়ার্ড ব্যক্তিগতভাবে সাইমনের বিরোধিতা করলেও সাইমন প্রস্তাবিত পার্লামেন্টকে তিনি সমর্থন করেন। তাঁর সময়ে গঠিত 'মডেল পার্লামেন্ট'-এর উদ্দেশ্য ছিল সামন্তপ্রভুদের উপর রাজার নির্ভরশীলতা কমানো। এ জন্য তিনি বণিকদের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকতর সুযোগ দেন। পরবর্তী রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের সময়েই পার্লামেন্ট 'হাউস অব লর্ডস' ও 'হাউস অব কমন্স' এই দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়। রাজার কর ধার্য করার ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ছাড়াও পার্লামেন্টে এখন থেকে দেশের একমাত্র আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় পরিণত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ডে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার, শহরগুলির সমৃদ্ধি, মুদ্রার ব্যবহার, শ্রমশক্তির অভাব—প্রভৃতি কারণে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয় এবং ম্যানর প্রথা ভাঙতে শুরু করে।

অন্যদিকে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সমাপ্তির ফলে ফ্রান্স থেকে প্রত্যাগত ইংরেজ সামন্তপ্রভু ও তাদের সৈন্যদল দেশে ভয়ঙ্কর অরাজকতার সৃষ্টি করে। যুদ্ধ সমাপ্তির দুই বছরের মধ্যে ইংল্যান্ড একটি মারাত্মক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইতিহাসে এটা গোলাপের যুদ্ধ (১৪৫৫) নামে পরিচিত। সাদা ও লাল গোলাপের প্রতীক চিহ্ন নিয়ে 'হাউস অব ইয়র্ক' ও 'হাউস অব ল্যাঙ্কাস্টার' নামে দুই দল ইংল্যান্ডের রাজসিংহাসন দখল করার উদ্দেশ্যে এই মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হয়। ত্রিশ বছর পরে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধে বহু সামন্তপ্রভু সবংশে নিহত হয়। এই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ইংল্যান্ডে সামন্তপ্রথার উপর প্রবল আঘাত হানে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের জনগণ একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভব করে। সেই সুযোগে হেনরি টিউডর (সপ্তম হেনরি নামে পরিচিত) সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৮৫) এবং নতুন রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তম হেনরির প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ টিউডর বংশ নামে পরিচিত।

নবোদ্ভূত বণিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় হেনরি সামন্তপ্রভুদের উপর শেষ আঘাত হানেন। সামন্তপ্রভুদের দুর্গগুলি কামানের গোলায় উড়িয়ে দেয়া হয় এবং সামন্ত সৈন্যদল ভেঙে ফেলা হয়। বহু সংখ্যক সামন্ত জমিদার—যারা রাজার শাসন মানতে অস্বীকার করে— মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের জমিদারি রাজার অধীনে আনা হয়।

ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি সুসংগঠিত ছিল। শহরের বণিকরা ছাড়াও সদ্যমুক্ত কৃষক সম্প্রদায় দলে দলে রাজার সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে রাজশক্তি বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের সামন্ত জমিদারদের অধিকাংশ এখন নিজেরাই বণিকশ্রেণীতে পরিণত হয়। ম্যানর ভেঙে দিয়ে সেখান থেকে কৃষকদের ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ করে সামন্তপ্রভুরা বেড়া দিয়ে ঘিরে (Enclosure) সেগুলিকে পশুচারণ ক্ষেত্রে পরিণত করে। মেষচারণ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে এবং তারা এখন ফ্লান্ডার্স ও ইতালির বিভিন্ন শহরে পশম

www.pathagar.com

রপ্তানি করে বিশেষ অর্থশালী হয়ে ওঠে। এই নবোদ্ভূত সামন্ত তথা বণিক সম্প্রদায় সর্বপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও ব্যবসাবাণিজ্যকেই তাদের প্রধান পেশায় পরিণত করে এবং সামন্তপ্রথার পরিবর্তে ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পথ সুগম করে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের ছোটবড় আরও কয়েকটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলেই এটা সম্ভব হয়। পশ্চিমে শক্তিশালী স্পেনীয় রাজ্যের উৎপত্তি হয়, উত্তরে ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন জাতীয় রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হয়—এবং পূর্বে পোলান্ড, বোহেমিয়া ও শ্লাভ রাজ্য মাস্কভির আবির্ভাব ঘটে। স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলি নিজ নিজ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়।

ইতালি ও জার্মানির রাজনৈতিক অনৈক্য

মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান দেশেই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটলেও ইতালি ও জার্মানিতে এর ব্যতিক্রম দেখা দেয়।

ইতালী দশম শতাব্দী থেকেই ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করে। প্রাচীন রোমের বাণিজ্য পথগুলি ব্যবহার করেই ইতালি দু-এক শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ইতালির প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ইতালির প্রধান প্রধান বাণিজ্য বন্দর জেনোয়া, ভেনিস, পিসা, ও ফ্লোরেন্স-এর নাবিকগণ প্রাচ্যদেশগুলি থেকে সোনা, হাতির দাঁতের তৈরি দ্রব্যাদি, ব্রোকেড ও সুগন্ধি দ্রব্য কিনে নিয়ে পশ্চিমের দেশগুলির নিকট বিক্রি করত। ক্রুসেডের মাধ্যমে ইতালির ব্যবসাবাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্য পথগুলো হস্তগত হওয়ার ফলে ইতালির বণিকগণ প্রাচ্যের ব্যবসাবাণিজ্যের পুরোটাই দখল করে। ব্যবসাবাণিজ্যের সমৃদ্ধি ইতালির ব্যবসায়ীদের শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করে; ফলে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য যেমন কাঁচা শিল্প, ধাতুশিল্প, পশম ও রেশম শিল্পের উৎপত্তি ঘটে। ইতালিতে ধনতন্ত্রের উন্মেষের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

রাজনৈতিকভাবে ইতালিতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রগঠনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মতো বণিকশ্রেণীর সাহায্যে এখানে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা ঘটেনি। তার কারণ হল : প্রথমত, ইতালির বিভিন্ন বাণিজ্যবন্দরগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সব সময়েই লেগে থাকত। প্রাচ্য দেশগুলি থেকে ক্রীত বিলাস দ্রব্যাদির বাজার ইতালিতে বিশেষ ছিল না। ইতালির নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না সে-সব দ্রব্য ক্রয় করা। পশ্চিম ইউরোপের সামন্তপ্রভুরাই ছিল ঐ সব দ্রব্যের একমাত্র ক্রেতা। এর ফলে প্রাচ্যের বণিকদের কাছ থেকে বিলাসদ্রব্য কেনা এবং সেগুলো নিয়ে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে বিক্রি করে দিত। ইতালির বিভিন্ন নগররাষ্ট্রে যথা ভেনিস, জেনোয়া, পিসা ও ফ্লোরেন্সের মধ্যে এই মাল বেচাকেনা নিয়ে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। এহেন অবস্থায় ইতালিতে এমন কেউ ছিলেন না যিনি সে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং নগরগুলিকে একত্রিত করতে পারেন। একমাত্র ক্ষমতাশালী ছিলেন রোমের পোপ যিনি সকলের কাছেই ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু তিনি সদাই আতঙ্কে দিন কাটাতেন পাছে কোন সামন্তপ্রভু প্রভাবশালী হয়ে তাঁর উপর খবরদারি শুরু করেন। কাজেই সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে যে দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারতেন তা না করার ফলে ইতালি একটি জাতীয় রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠতে পারলই না, উপরন্তু উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়ে রইল। মধ্যযুগে শার্লামেনই মোটামুটি

www.pathagar.com

ইতালিকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই ইতালি পুনরায় খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উত্তরে পুরাতন লম্বার্ড রাজ্য, মধ্যে পোপের রাজ্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রিন্সিপালিটিগুলি। দক্ষিণের অংশ ভাগাভাগি হয়ে যায় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও মুসলিম সারাসিনদের মধ্যে। এ ছাড়া ছিল স্বাধীন স্বতন্ত্র নগরগুলি যেমন জেনোয়া, ভেনিস, পিসা ও ফ্লোরেন্স।

ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ইতালির ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নর্মানদের আক্রমণ। ফ্রান্সের নর্মান্ডি রাজ্য থেকে আগত নর্মান নাইট ভ্রাতৃদ্বয় রবার্ট জিসকার্ড ও রজার জিসকার্ড ইতালির দক্ষিণে নেপলস রাজ্য ও সিসিলি দ্বীপ দখল করেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ১১২৭ খ্রিস্টাব্দে এই দুইটি রাজ্য একত্রিত হয়ে গড়ে ওঠে নেপলস ও সিসিলি রাজ্য।

নর্মানদের অধীনস্থ নেপলস ও সিসিলি রাজ্য একটি সুশাসিত রাজ্যরূপে গড়ে উঠে। একদল সুযোগ্য রাজকর্মচারীর সহযোগিতায় সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি কেন্দ্রীয় সরকার। করের বোঝা মোটামুটি সহনশীল ছিল এবং রাজকীয় সেনাবাহিনীর একটি দল সার্বক্ষণিকভাবে তৈরি থাকত দেশরক্ষার জন্য। এক কথায় নেপলস-সিসিলি রাজ্যটিকে ইউরোপের প্রথম আধুনিক রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। নর্মানরা যখন নেপলস-সিসিলিতে আধুনিক রাষ্ট্রের পত্তন করছিল ঠিক একই সময়ে তারা ইংল্যান্ডে একই ধরনের রাজ্য গড়ে তুলছিল। ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে তারা নেপলস-সিসিলিতে একটি পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করে যাকে অনুকরণ করেই ১২৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের মডেল পার্লামেন্ট গড়ে তোলা হয়।

ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় নেপলস-সিসিলি রাজ্যটি খ্রিস্টান, গ্রিক, সারাসিন ও নর্মানদের মিশ্র সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর শাসক দ্বিতীয় ফ্রেডারিক-এর শাসনকালে এ রাজ্যটি একটি উচ্চ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতদের সম্মিলন ঘটে এ রাজ্যটিতে। একজন সুদক্ষ সংস্কৃতিবান শাসকের কেন্দ্রীয় শাসনে শাসিত নেপলস-সিসিলি রাজ্যটিকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যত ইতালিতে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সুন্দর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত হতে পারেনি। বরং রাজ্যটি সম্রাট ও পোপের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পবিত্র রোমান সম্রাট ষষ্ঠ হেনরি সিসিলির কনস্টানসকে বিবাহ করার পরে তাঁদের দুজনের সন্তান ফ্রেডারিক একই সঙ্গে নেপলস-সিসিলির রাজা ও পবিত্র রোমান সম্রাটরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। স্বভাবতই তিনি পোপের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পোপ প্রতিহিংসার বশে তাঁর রাজ্যটি আক্রমণ করার জন্য ফ্রান্সের অ্যাঞ্জু প্রদেশের ডিউককে আমন্ত্রণ জানান।

নেপলস-সিসিলির-এর পরের ইতিহাস অ্যাঞ্জেভিনদের ইতিহাস। অ্যাঞ্জেভিন শাসকগণ অবশ্য নেপলস-সিসিলি রাজ্যে নিদারুণভাবে অ-জনপ্রিয় ছিলেন। সিসিলিতে অ্যাঞ্জেভিস কাউন্টগণ তাঁদের অধীনস্থ ফরাসি সরকারি কর্মচারীবৃন্দ বিশেষভাবে প্রতিরোধপ্রাপ্ত হন। অবশেষে ১২৮২ খ্রিস্টাব্দের এক সন্ধ্যায় সিসিলিবাসী অকস্মাৎ এক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং সকল ফরাসি নাগরিককে হত্যা করে। ইতিহাসে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সিসিলীয় সন্ধ্যা নামে পরিচিত। এই অভ্যুত্থানের পর সিসিলির সিংহাসন শেষপর্যন্ত স্পেনের অ্যারাগণ প্রদেশের পিটারকর্তৃক অধিকৃত হয়। তিনি জার্মানি হেনস্টাউফেনর রাজবংশে বিবাহ করেন। ফলে এখন থেকে সিসিলি স্পেনের কর্তৃত্বাধীনে চলে যায় এবং নেপলস স্বতন্ত্রভাবে ফরাসি শাসনাধীন থাকে। ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দে অ্যারাগণের রাজা অ্যালফনসো নেপলস জয় করেন। ফলে নেপলস-সিসিলি রাজ্য দুটি পুনরায় একত্রিত হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

এই একত্রীকরণ ইতালির দক্ষিণাঞ্চলের এই দুটি রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য মোটেও শান্তি ডেকে আনেনি কারণ এদের বিদেশী শাসকগণ ইউরোপে তাঁদের রাজ্য দখলের অভিপ্রায়ে প্রায় প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন।

নেপলস-সিসিলির ভাগ্য যখন এরূপ তখন ইতালির অন্যান্য রাজ্যগুলি বিশেষত উদীয়মান নগর রাষ্ট্রসমূহের উপর চলছিল জার্মানির পবিত্র রোমান সম্রাটদের আক্রমণ। এই প্রথমবারের মতো দেখা গেল ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলিকে পোপের নেতৃত্বাধীনে লম্বার্ড লিগের পতাকা তলে সমবেত হতে। শেষ পর্যন্ত ইতালির রাজ্যগুলি মিলিতভাবে জার্মানিকে পরাজিত করে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু এ একতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। একটি সম্মিলিত ইতালির জাতীয় শক্তির অভ্যুদয়ের পরিবর্তে আবার জেগে ওঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং নগর রাষ্ট্র। এরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের অভিপ্রায়ে নিরন্তর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত।

ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সবচেয়ে বেশি। ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি নগরগুলির বাণিজ্য প্রতিযোগিতা অনেক সময়েই সামরিক সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করত। নগর রাষ্ট্রগুলি অনেকটা প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলির মতোই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন। এদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল কতকগুলি বণিক পরিবারের হাতে। এঁরা একজন অত্যাচারী শাসককে ক্ষমতায় বসাতেন এবং তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। অনেক সময় কয়েকটি পরিবার এ কার্যে পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হত। তাঁরা ক্ষমতার অন্তরালে বসে ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে লিপ্ত থাকতেন। এক্ষেত্রে বিষ প্রয়োগ, গুপ্তহত্যা এমনকি গৃহযুদ্ধের ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের থেকে সংগৃহীত ভাড়াটে সৈন্যদের একাজের জন্য নিয়োগ করা হত।

এমন একটি সৈন্যদলের নেতা ছিলেন একজন ইংরেজ স্যার জন হকউড; 'হোয়াইট কোম্পানী' নামে পরিচিত তাঁর সৈন্যদল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইতালির রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভেনিসকে বলা যেতে পারে নগর রাষ্ট্রগুলির মুক্তা বা মধ্যমণি। এটা ছিল দৃশ্যত একটি প্রজাতন্ত্র কিন্তু কার্যত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যক্তির হাতে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভেনিসের অধীনে ছিল তিন হাজার পণ্যবাহী জাহাজ। এদের প্রহরা দিত বিশাল নৌবাহিনী।

বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি সাধন ও বিপুল ধন-সম্পদ করায়ত্ত করার ফলে ভেনিস ইতালি তথা ইউরোপের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

এর পরবর্তী নগররাষ্ট্র হিসাবে মিলান ও ফ্লোরেন্সের নাম করা যেতে পারে। মিলানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল ভিসকন্তি পরিবার। আর ফ্লোরেন্সের শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মেডিসি পরিবারের হাতে। এই দুই পরিবারই ছিল স্বৈরাচারী শাসক। তথাপি শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে এদের উভয়েরই খ্যাতি ছিল। ফ্লোরেন্সের অধিকর্তা লরেঞ্জো ডি মেডিসির (১৪৭৮-১৪৯২) খ্রিস্টাব্দে শাসনকালে ফ্লোরেন্স রেনেসাঁ যুগের সর্বোচ্চ শিল্পচর্চা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইতালির ভাগ্যে নেমে আসে আরো দুর্ভোগ। ইতালির সমৃদ্ধি, অর্থ তার রুচিবোধ, তার শিল্পের বিকাশ সবকিছুই প্রতিবেশী দেশগুলির বিশেষত ফ্রান্সের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রান্সের শাসকদের অধীনে ছিল একটা গোটা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র।

www.pathagar.com

তাঁরা আক্রমণ করলেন ইতালিকে। ইতালি তখন অভ্যন্তরীণ বিরোধে ক্ষতবিক্ষত, বাইরের হস্তক্ষেপ রোধ করার মতো কোনো সুযোগ্য নেতৃত্ব সেখানে ছিল না। বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ অবশ্য এ বিপদ অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দান্তে বা পের্ট্রাক-এর মতো মনীষীদের সতর্কবাণীতে কেউ কান দেয়নি। কেউ এগিয়ে আসেনি এই বিবদমান রাজ্যগুলির বিরোধ থামিয়ে তাদের একত্রিত করার মহান উদ্যোগ নিতে। এর পরিণাম হল ভয়াবহ। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লস নেপলস-এর সিংহাসন দাবি করে ইতালি আক্রমণ করে বসলেন। এরপর থেকে ইতালির বিরাট অঞ্চলে ফরাসি কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে স্পেনীয় রাজশক্তির কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইতালির উপর আধিপত্য বিস্তার ও শাসন প্রতিষ্ঠা করে অস্ট্রিয়ার রাজশক্তি। একক রাজ্যের অধীনে ইতালির একত্রীকরণের কাজ শুরু হয় অনেক পরে—কেবলমাত্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে।

জার্মানির রাজনৈতিক অনৈক্য

৯১১ খ্রিস্টাব্দে জার্মান ভূখণ্ডে ক্যারোলিঞ্জিয়ান রাজবংশের অবলুপ্তি ঘটার পর জার্মানরা তাদের পূর্বপুরুষের অনুসৃত নির্বাচিত রাজতন্ত্রের পদ্ধতি গ্রহণ করে। দশম শতাব্দীতে জার্মানির মূল সামন্ত রাজ্য ছিল পাঁচটি; ফ্রাঙ্কোনিয়া, স্যাক্সনি, থুরিঞ্জিয়া; সয়াবিয়া ও ব্যাভারিয়া।

জার্মানদের প্রথম নির্বাচিত রাজা ছিলেন ফ্রাঙ্কোনিয়ার ডিউক কনরাডি। এর পরে রাজা নির্বাচিত হলেন স্যাক্সনির ডিউক হেনরি। হেনরির মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রথম অটো জার্মানির সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। অটোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক বেশি। তিনি শুধু জার্মানির রাজা হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল শার্লামেনের মতো বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে ইতালির দিকে হাত বাড়ালেন। ইতালির তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে সে সুযোগ এনে দিয়েছিল। অতঃপর তিনি পোপকে বাধ্য করলেন তাঁকে রোমান সম্রাট রূপে অভিষিক্ত করতে। অটোর রাজ্য শুধুমাত্র ইতালি ও জার্মানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে জার্মানির সিংহাসন অধিকৃত হল হহেনস্টাউফেন রাজবংশের দ্বারা। এ রাজবংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা ছিলেন ফ্রেডারিক বারবারোসা। তিনি তাঁর রাজ্যটির নাম দিয়েছিলেন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। তিনি ও তাঁর পরবর্তী জার্মান শাসকগণ সুদূর ইতালিতে গিয়ে পোপের দ্বারা রোমান সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হতেন। তিনিও অটোর মতো ইতালিতে অভিযান প্রেরণ করেন। তবে তাঁর আক্রমণের কালে ইতালির প্রায় সবকটি রাজ্য পোপের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে তাঁকে বাধা দেয়। দুইবার তিনি ইতালি আক্রমণ করেছিলেন। দুইবারই তিনি পরাজিত হন।

এই বংশের পরবর্তী বিখ্যাত শাসক ছিলেন দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। তিনিও তাঁর পূর্বপুরুষের মতো বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তবে তাঁর পরিকল্পনা ছিল তার মূল ঘাঁটি অর্থাৎ সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে তাঁর শক্তি সুসংঘবদ্ধ করা এবং সেখান থেকে সমগ্র ইতালিতে আক্রমণ পরিচালনা করা। সে উদ্দেশ্যে তিনি সিসিলিতে তাঁর রাজশক্তিকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করার প্রয়াস পান। সেখানকার সকল শক্তিকে তিনি উৎখাত করেন। ইংল্যান্ডের রাজা বিজয়ী উইলিয়ামের মতো তিনি পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল সামন্ত-ভূস্বামীকে দিয়ে রাজানুগত্যের শপথ করিয়ে নেন। তিনি একটি স্থায়ী সেনাবাহিনীও গড়ে তোলেন এবং প্রজাদের উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করেন।

সামন্তরাজদের আদালতগুলি বাতিল করে তিনি নিজে দেশের সর্বত্র বিচারকদের নিযুক্ত করেন

www.pathagar.com

যাতে তাঁরা সারাদেশব্যাপী একই ধরনের আইনের প্রয়োগ ও আদালত স্থাপনের সুযোগ লাভ করেন।

তিনি ব্যবসাবাণিজ্যের উপর প্রত্যক্ষ সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। মুদ্রা লেনদেন এবং শস্য, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। এত ধরনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা সত্ত্বেও ফ্রেডারিকের শাসনব্যবস্থা তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এর মূল কারণ এই যে, তিনি ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের রাজাদের মতো বার্গার বা ব্যবসায়ীশ্রেণীর সমর্থন লাভের চেষ্টা করেননি। পোপের নেতৃত্বে ইতালীয়রা তাঁকেও বাধাদান করে। তাঁর মৃত্যুর পর পোপ ইতালিতে হহেনস্টাউফেন বংশের শেষ চিহ্নটিও মুছে ফেলতে অগ্রসর হন। জার্মানিতে হহেনস্টাউফেন রাজবংশের পরে পবিত্র রোমান সম্রাটের সিংহাসন ও রাজমুকুট অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ (Hapsburg) রাজবংশের হাতে চলে যায়। ১২৭৫ খ্রিস্টাব্দে এ রাজবংশের রুডলফ হ্যাপসবার্গ সম্রাটদের মধ্যে প্রথম পবিত্র রোমান সম্রাট নির্বাচিত হন। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা নেপোলিয়ান কর্তৃক এই রাজপদটি বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল পবিত্র রোমান সম্রাটই অস্ট্রিয়ার রাজবংশোদ্ভূত।

দীর্ঘদিন যাবৎ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের দ্বারা শাসিত হলেও জার্মানিতে প্রকৃতপক্ষে কোনো শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যার ফলে জার্মানি দেশটি ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের মতো এককেন্দ্রিক রাজ্যরূপে গড়ে উঠতে পারেনি।

রাজ্য হিসেবে জার্মানির মূল কাঠামোর দুর্বলতাই এর জন্য প্রধানত দায়ী। জার্মানি ছিল বিভিন্ন জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত কতকগুলি সামন্তরাজ্যের সমষ্টি। এর মধ্যে ছিল জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, লিথুয়ানীয়, ফিন ও স্লাভ জাতির মিশ্রণ; এরা প্রত্যেকেই ছিল নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। অন্যদিকে জার্মান সামন্ত রাজাগণ নিজস্ব ধর্ম ও পথ মতে এতখানি দৃঢ় ছিলেন যে, তাঁরা কেবল ক্রমাগত এই চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন যাতে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই গড়ে উঠতে না পারে। পবিত্র রোমান সম্রাট নামে সম্রাট হলেও, কোন সুদৃঢ় ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন নাম ও পদসর্বস্ব এমন একজন দুর্বল শাসক যিনি ছিলেন তাঁর নিজের সামন্ত ভ্যাসালদের দ্বারা অনুগৃহীত। ইংল্যান্ডেও ফ্রান্সের শহরগুলির তুলনায় জার্মান শহরগুলির উৎপত্তি হয়েছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে। এ শহরগুলি গড়ে উঠেছিল বাল্টিক সাগর ও জার্মানির অভ্যন্তরে প্রবাহিত নদীগুলির তীরে। পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের দেশের সাথে তাদের বাণিজ্য চলত জোটবদ্ধ হয়ে। এ জোটের নাম হেনসিয়াটিক লিগ। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে লীগের সদস্যদের কোনো যোগ ছিল না। তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল কীভাবে সামন্ত নাইটদের আক্রমণ থেকে তাদের ব্যবসাকে রক্ষা করা যায়। এজন্য তারা নিজস্ব সামরিক বাহিনীও গড়ে তুলেছিল। তবে ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের মতো জার্মান বণিকগণ পবিত্র রোমান সম্রাট বা অন্য কোনো জার্মান রাজাও বণিকদের সমর্থন নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে কোনো আগ্রহ দেখান নি। ফলে ইতালির মতো জার্মানিও রইল বেশকয়েক শতক ধরে বহু খণ্ডে বিভক্ত দুর্বল সামন্ত শাসিত একটি দেশ হয়ে, যেখানে বহুকাল পর্যন্ত পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার কোনো সুযোগই পেল না। জার্মানির একত্রীকরণের পর্বটি সমাপ্ত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে প্রুশিয়ার রাজা কাইজারের অধীনে এবং এই কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর অসাধারণ প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক।

www.pathagar.com

কিন্তু তার আগে অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভে জার্মানিতে প্রবল প্রতাপ ছিল সামন্ত ভূস্বামীদের। ইউরোপের আর কোনো দেশে সামন্ত প্রভুদের স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা এতখানি সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। জার্মান রাজা কর্তৃক ইতালি ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত সামরিক অভিযানগুলিও মূলত সামন্তপ্রভুদের সীমাহীন লোভ ও বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশে পরিচালিত হয়েছিল।

আমরা আগেই দেখেছি যে, দশম শতাব্দী থেকে জার্মান রাজারা ইতালিতে সামরিক অভিযান পরিচালনা আরম্ভ করেছিলেন। ইতালি ছিল জার্মানির তুলনায় অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ দেশ। সুসংবদ্ধ অভিযান ও লুঠতরাজের মাধ্যমে জার্মান সামন্ত ভূস্বামীরা নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্রমশ শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে যখন ইতালির নগরগুলি জার্মান আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে শুরু করে তখন থেকে জার্মানি সামন্তপ্রভুরা ইতালিকে ছেড়ে ইউরোপের পূর্ব দিকের দেশগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

সামন্ত নাইটদের পূর্ব ইউরোপের প্রথম অভিযান শুরু হয় লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে। সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের নির্মূল করে জার্মান সেনাদল পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হয়ে বাল্টিক সাগরের পূর্ব তীরবর্তী এস্তোনিয়া ও লাটভিয়া দখল করে নেয়। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের নামে (যদিও এসব অঞ্চলের অধিকাংশ লোক বহুপূর্বেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল) সামন্তদস্যুদের অত্যাচার নিষ্ঠুরতার সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় কীভাবে জার্মান সেনাবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম লুট করেছে, শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে, কী নৃশংসভাবে হত্যা করেছে নারীপুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলকে। জার্মানদের অপ্রতিহত অভিযান প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় রুশদের হাতে যখন তারা রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে। ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার নেভস্কি লেক পেইপাসের নিকট তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। দু'শ বছর পরে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে পোল, লিথুয়ানিয়া ও রুশদের সম্মিলিত বাহিনী পূর্ব প্রাশিয়ার গ্রুনওয়াল্ড-এর নিকট জার্মান সেনাদলকে আর একবার পরাজিত করে। এর পর থেকেই জার্মানদের পূর্ব অভিযানের সমাপ্তি ঘটে।

জার্মানদের সামরিক অভিযান কেবল তাদের অধিকৃত দেশগুলির জন্যই ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনেনি, স্বয়ং জার্মানির জন্যও এ অভিযান সৃষ্টি করেছিল মারাত্মক ক্ষত। ইতালি ও পূর্বদেশগুলি থেকে লুটের মাধ্যমে ধনসম্পদ আহরণ এবং পূর্ব ইউরোপের কতকাংশের দখল (যা পরবর্তীকালে পূর্ব প্রশিয়া নামে পরিচিত হয়েছিল) জার্মানির সম্রাটের শাসনকেই শুধু দুর্বল করে তোলেনি, ভবিষ্যতে জার্মানিতে কোনরকম রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে একেবারে নির্মূল করে দেয়। ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট চতুর্থ চার্লস-এর গোল্ডেনবুল (Golden Bull)-এর নির্দেশনামার দ্বারা জার্মান সামন্ত রাজাগণ নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার আরও সুসংহত করেন। তাঁরা সম্রাট নির্বাচনের অধিকারসহ অন্যান্য সুবিধা আদায় করে নেন। পবিত্র রোমান সম্রাট এখন থেকে হন তাদের হাতের ক্রীড়নক। বিভিন্ন শহরগুলির মধ্যে মৈত্রীবন্ধন ঘোষিত হয় কিন্তু সামন্তরাজ্যগুলির মধ্যকার সংঘর্ষের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। এর ফল হল এই যে, জার্মানি এখন প্রকৃত অর্থেই একটি নিরন্তর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কেন্দ্রভূমি রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। এ সংঘর্ষের মূলে ছিল কয়েক শতক ধরে সঞ্চিত লুণ্ঠনের মনোবৃত্তি এবং বিভিন্ন জাতিগুলির প্রতি ঘৃণা যা শেষপর্যন্ত পারস্পরিক বিদ্বেষ ও সংঘর্ষেরই জন্ম দিয়েছিল। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা জার্মানির জঙ্গী মনোভাব ও জাতিবিদ্বেষের সূত্রপাত এর মধ্য দিয়েই ঘটেছিল।

www.pathagar.com

সামন্ত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক

সামন্তপ্রভুদের আচরণবিধি : শিভালরি

সামন্তপ্রভুদের শিষ্টাচার ও ভদ্র আচরণকে শিভালরি (Chivalry) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শিভালরিকে বলা হয় সামন্ত বৃক্ষের পুষ্প। শিভালরি শব্দটি এসেছে ক্যাভালিয়ার (cavalier-ঘোড়সওয়ার,), ক্যাভালরি (cavalry-অশ্বারোহীবাহিনী) প্রভৃতি সমজাতীয় শব্দ থেকে। এর কারণ হচ্ছে, সামন্ত ব্যবস্থায় এক ধরনের সামরিক প্রতিষ্ঠান ও বিধি থেকেই প্রথমে শিভালরি প্রথার উদয় ঘটেছিল।

সামন্ত সমাজব্যবস্থা যখন গড়ে উঠেছিল তখন নিয়ম ছিল যে জমিদারি (Fief) পেতে হলে অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হবে —প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে, অন্য সময়ে দুর্বৃত্তদের দমন করতে হবে। এ অশ্বারোহী জমিদারদের বলা হত নাইট (Knight)। নাইটরা গির্জা ও পাদরিদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিত এবং দুর্বল, অসহায় ও উৎপীড়িতদের সাহায্য করার শপথ নিত। নাইটরা লোহার বর্ম দিয়ে শরীর ঢেকে, তলোয়ার, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করত। ক্রমশ লড়াই করে বেড়ানোই ইউরোপের সামন্ত জমিদারের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়াল। এই যোদ্ধা জমিদার শ্রেণী ক্রমশ একটি পৃথক গোষ্ঠীতে পরিণত হল। অনেক নাইট জমিদারি পরিচালনায় লিপ্ত না থেকে কেবল যোদ্ধা নাইট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। অবশ্য শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ জমিদার বংশের ছেলেরাই নাইট হতে পারত। মধ্যযুগের শেষভাগে জমিদারের যে সন্তানরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না তারা এসে নাইট হত। ইউরোপের নানাস্থানে প্রচলিত প্রথা অনুসারে রাজা ও জমিদারের বড় ছেলে পিতার পুরো সম্পত্তির মালিক হত। অন্য ছেলেরা হয় গির্জার পুরোহিত হত, না হয় নাইট হত।

শিভালরি প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর নাইটদের শিভালরির রীতিনীতি শিক্ষা দেয়ার সুনির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সামন্তপ্রভুদের যে ছেলেদের গির্জায় পাঠানোর ব্যবস্থা হত, তারা ছাড়া অন্য ছেলেদের শিভালরির নিয়মশৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া হত। ক্ষুদ্র জমিদার ও অভিজাতদের ছেলেদের কোনো বিখ্যাত ও বড় জমিদারের পরিবারে রাখা হত। সেখানে তারা নাইটদের কাজকর্ম ও আচরণ বিষয়ে শিক্ষালাভ করত।

নাইটদের শিক্ষা পর্ব শুরু হত সাত বছর বয়সে। এ সময়ে তার নাম হত পেজ (page) বা ভ্যালেট (Valet)। এখানে জমিদার ও তাঁর অধীনস্থ নাইটরা শিক্ষার্থী বালক পেজকে যুদ্ধবিদ্ধা এবং পুরুষ সুলভ বলিষ্ঠ আচরণ শিক্ষা দিতেন। আর জমিদারের পত্নী ও প্রাসাদের অভিজাত মহিলারা ঐ শিক্ষার্থী নাইটকে ধর্মীয় কাজ ও নাইটসুলভ ভদ্র আচরণ বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষার্থী নাইটরা যাতে প্রভু ও বন্ধুদের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকে, যেন ভদ্র, নম্র, উদার হৃদয় ও মানবিক গুণসম্পন্ন হয় এবং মহিলাদের প্রতি যেন ভদ্র আচরণ করে ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে সে শিক্ষাই তাদের দেয়া হত।

চৌদ্দ বছর বয়সে শিক্ষার্থী নাইটের নাম হত স্কোয়ার বা এস্কোয়ার (Square, Esquare)। এসময়ে এক একজন নাইটের উপর তাদের শিক্ষার পরিপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হত। স্কোয়াররা শিক্ষাদাতা নাইটের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন এবং যুদ্ধবিদ্যা শিখতেন।

www.pathagar.com

একুশ বছর বয়সে এক চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একজন স্কোয়ার পুরোপুরি নাইট হতেন। প্রথমে, নইট হিসেবে তাঁর কি কি করা উচিত সে বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা শোনানো হত। তারপর তিনি জমিদারদের আনুগত্যমূলক 'হোমেজ' (Homage) অনুষ্ঠানের মতো হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হয়ে তার প্রভুর সামনে বসতেন এবং প্রতিজ্ঞা করতেন যে সারা জীবন ধরে ধর্মকে এবং মহিলাদের রক্ষা করবেন, দুস্থদের সেবা করবেন এবং স্বশ্রেণীর নাইটদের প্রতি অনুগত থাকবেন; এরপর তাঁকে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হত এবং তাঁর প্রভু তাঁকে নাইটরূপে ঘোষণা করতেন।

মধ্যযুগে নইটদের প্রতিযোগিতা বা টুর্নামেন্ট (Tournament) ছিল জমিদার ও জনসাধারণের আনন্দ ও আমোদপ্রমোদের একটি বড় অনুষ্ঠান। টুর্নামেন্টে বিভিন্ন দলের নাইটদের মধ্যে নকল যুদ্ধ হত। শিভালরির যুগে টুর্নামেন্ট একটি মস্তবড় সর্বজনীন উৎসবের রূপ নিত। কোন একজন রাজা বা ব্যারন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে বিভিন্ন দেশের ও অঞ্চলের নাইটদের আমন্ত্রণ জানাতেন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য। টুর্নামেন্টের স্থানটিকে নানা রঙের পতাকা ও প্রতীকে সজ্জিত হয়ে সাধারণত ভোঁতা তলোয়ার ও বল্লম নিয়ে নকল লড়াই করতেন।

যে নাইট বল্লম বা তলোয়ারের আঘাতে প্রতিপক্ষকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিতে পারতেন বা অন্য নাইটদের বল্লম সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ভাঙ্গতে পারতেন তাঁকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হত। বিজয়ীরা ফুলের তোড়া, বর্ম, শিকারী কুকুর প্রভৃতি পুরস্কার পেতেন এবং মহিলাদের প্রশংসা লাভ করে ধন্য হতেন। পুরস্কার বিতরণ করতেন কোন অভিজাত মহিলা। বর্তমানকালে যে আমাদের দেশে ও পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহিলারা পুরস্কার বিতরণ করে থাকেন, সে প্রথার মূলে রয়েছে শিভালরির যুগের ঐ পদ্ধতি।

শিভালরি প্রথার জন্ম হয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপে। কিন্তু তিনটি বিভিন্ন উৎস থেকে এর উদয় ঘটেছিল। প্রথমত, জার্মান বর্বরদের মাঝে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদের হাতে সামরিক অস্ত্র তুলে দেয়ার রেয়াজ প্রচলিত ছিল। এ প্রথা শিভালরির অনুষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছিল। দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টীয় নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ শিভালরির ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল। তৃতীয়ত, আরবি ও প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কাব্যিক গুণ এবং বংশগত প্রতীক ধারণের প্রথাও শিভালরির আচরণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল : মধ্যযুগের জমিদাররা তাঁদের বংশ মর্যাদা ও পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে পোশাক, বর্ম ও ঢালের উপর সিংহ, বাঘ, প্রভৃতি প্রাণীর ছবি ধারণ করতেন। প্রথাকে বলা হয় হেরালড্রি (Hearaldry)।

পনের শতকের পর থেকে ক্রমশ শিভালরি প্রথার বিলোপ ঘটতে শুরু করে। যে সকল কারণে সামন্তপ্রথার বিলোপ ঘটেছিল, সে একই কারণে শিভালরি প্রথার অবনতি ও বিলোপ ঘটেছিল। এটাই স্বাভাবিক। কারণ শিভালরি প্রথা ছিল সামন্তপ্রথা থেকেই উদ্ভূত ও তারই একটি অঙ্গ। মধ্যযুগের শেষে কামান, বারুদ ও বন্দুকের আগমনের ফলে যুদ্ধের রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ক্রমশ জাতীয় রাষ্ট্রের উদয় ঘটে এবং জাতীয় সরকার গঠিত হয়। ইউরোপের দেশে দেশে সামন্ত অর্থনীতির স্থানে যতই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন হতে থাকে, ততই মানুষের মনে নতুন চিন্তা-চেতনার উদয় ঘটতে থাকে। এভাবে শিভালরির মোহ মানুষের মন থেকে ক্রমে মিলিয়ে যায়। জাতীয় সরকার ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ দেশে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলে দুর্বলদের রক্ষার জন্য আর নাইটদের প্রয়োজন থাকে না, আইন রক্ষাকারী সংস্থাই এখন সে কাজ করতে শুরু করে।

মধ্যযুগের অবসানের সাথে সাথে ইউরোপের শিভারলি প্রথার বিলোপ ঘটলেও শিভালরির

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। শিভালরিতে দীক্ষা দেয়ার সময়ে নাইটদের ভদ্রতা, নম্রতা, মানবিকতা, আনুগত্য, উদারতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি গুণ শিক্ষা দেয়া হত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মহিলাদের প্রতি সৌজন্যমূলক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের শিক্ষা নাইটদের দেয়া হত। বস্তুত, নারীর প্রতি ভদ্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব ও আচরণ হল শিভালরির একটা প্রধানতম লক্ষণ ও অঙ্গ। এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা, কারণ প্রাচীন গ্রিসে বা রোমে প্রাচীন মিশরে বা ব্যাবিলনে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বা চীনে কোথাও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব বিদ্যমান ছিল না। সত্য বটে, মধ্যযুগে শিভালরির ধারণা শুধুমাত্র জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং জমিদার নাইটরাও সবসময় পুরোপুরি শিভালরির আদর্শকে আয়ত্ত বা অনুসরণ করেন নি। বস্তুত অনেক নাইটই সুযোগ পেলে লুটতরাজ, মারামারি এবং স্ত্রীলোকের সাথে অসদাচরণ করতেন, বিশেষত যদি সে মহিলারা অভিজাত শ্রেণীর বাইরের হতেন।

ভ্রাম্যমাণ নাইটরা অনেক সময়েই আবার বাহাদুরী করার জন্য মহিলাদের সম্মান রক্ষার নামে নিরীহ পথচারীদের আক্রমণ করতেন। শিভালরির আদর্শ রক্ষা করার নামে নাইটরা প্রায়ই পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে (Duel) লিপ্ত হতেন। এর ফলে অযথা এত রক্তপাত হত যে, শেষপর্যন্ত এ ব্যাপারের অবসান ঘটানোর জন্য পোপকে হস্তক্ষেপ করতে হয় (এ বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে)। এ সকল নাইটের অদ্ভুত কার্যকলাপকে বিদ্রূপ করে স্পেনীয় সাহিত্যিক সেরভান্টেস তাঁর সুবিখ্যাত ব্যঙ্গ কাহিনী 'ডন কুইকজোট' রচনা করেছিলেন।

কিন্তু এসকল ত্রুটি সত্ত্বেও শিভালরির আদর্শটা যে শিক্ষা দেয়া হত সেটাই বড় কথা। এর ফলে মধ্যযুগের অবসানে রেনেসাঁসের যুগে যখন নতুন মানবতাবাদী আদর্শের নব উন্মেষ ঘটে, তখন শিভালরির আদর্শ সে মানবতাবাদকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলেই আধুনিক মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে পূর্ণ মানুষের মর্যাদা দান করা হয়েছে যা প্রাচীন গ্রিসে বা রোমে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল।

মধ্যযুগের শিভালরির আদর্শের প্রভাবেই আধুনিক যুগে ইউরোপ থেকে নারীর মর্যাদার ধারণা ক্রমশ সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, মধ্যযুগের ইউরোপের শিভালরির আদর্শ বিশ্ব সংস্কৃতিতে অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে।

মধ্যযুগের চিন্তা ও দর্শন

সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ছিল স্বনির্ভর, বদ্ধ, ক্ষুদ্র ম্যানরের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। স্বভাবতই সামন্তযুগের মানুষের চিন্তাধারাও ছিল তেমনি একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামন্তযুগের অপরিবর্তনশীল সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মানুষের চিন্তাশক্তিকেও সীমিত করে রেখেছিল। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ মানুষ একটি অপরিবর্তনশীল সমাজ ও অর্থনীতি প্রত্যক্ষ করেছে—একটি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বাস করেছে; ম্যানরের বাইরে সে কখনও যায়নি—যাওয়ার প্রয়োজনও অনুভব করে নি। এক্ষেত্রে ম্যানরটি তার কাছে সমগ্র জগৎ; এর মানুষগুলির সাথেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার পরিচয়। ম্যানরের প্রভু এবং চার্চই তার ইহকাল পরকালের মালিক, এর সেবাই তার জীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য।

মধ্যযুগে চার্চও এই একই আদর্শ প্রচার করেছে। সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের ধারক চার্চ। গির্জার ধর্মযাজক ও মানুষকে জগৎ সম্পর্কে এই ধারণাই দিয়েছে—দিয়েছে এক একটি গোলকের ধারণা—চন্দ্র-সূর্যের গোলক, গ্রহদের গোলক, সকলের উপরে স্থির নক্ষত্রের গোলকসমূহ যার

www.pathagar.com

উপরে আছে স্বর্গলোক। প্রচলিত ব্যবস্থাকে মেনে নেয়াই ছিল স্বর্গে যাওয়ার একমাত্র উপায়—তা না হলে আছে অনন্ত নরক, দান্তের 'ইনফার্নোতে' যার ভয়াবহ চক্রের কথা বর্ণিত আছে।

সাধারণভাবে মধ্যযুগের চিন্তার বৈশিষ্ট্য হল : অবিচল নিয়মের উপর গভীর আস্থা। বিভিন্ন পর্যায়ে এ সকল নিয়মকে ক্রিয়াশীল বলে মনে করা হত। যথা, মহাজাগতিক নিয়ম, সামাজিক নিয়ম, মানুষের দেহের ভিতরের নিয়ম ইত্যাদি। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানও জগতে নিয়মের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুজগৎকে পর্যবেক্ষণ করে তার নিয়ম আবিষ্কার করে। আর মধ্যযুগে খ্রিস্টীয় পাদ্রী এবং দার্শনিকদের কল্পিত নিয়মকে বস্তুজগতের উপর আরোপ করা হত। গির্জা সংস্থা এবং সামন্ত প্রথার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কথাকেই শুধু মধ্যযুগে জগতের নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করা হত, সে কথা সঠিকই হোক বা অবাস্তবই হোক। মধ্যযুগীয় চিন্তায় পৃথিবীতে সবকিছুই নিজ নিজ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। সমাজে জমিদারদের স্বাভাবিক স্থান ছিল উঁচুতে এবং কৃষকদের স্বাভাবিক স্থান ছিল নিচুতে। এই জগৎ ব্যবস্থার মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতেরও নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল; সেটা কেবল মানুষের প্রয়োজন মেটানোই নয়, তাকে নৈতিক শিক্ষাদানও বটে—যেমন, পিঁপড়ার শ্রমশীলতা, সিংহের সাহসিকতা ইত্যাদি। এই বিশাল, জটিল, অথচ সুশৃঙ্খল জগৎ ব্যবস্থা তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গতও ছিল। এর মধ্যে এরিস্টটলীয় সিদ্ধান্ত—এবং বাইবেল ও গির্জার সন্দেহাতীত সত্যসমূহের সমন্বয় ঘটেছিল। এভাবে বদ্ধ অর্থনীতির পটভূমিকায় সামন্ত সমাজ সৃষ্টি করেছিল এক স্থির, অচঞ্চল ও অপরিবর্তনেয় জগতের।

এই অপরিবর্তনের জগতে পরিবর্তন এল যখন শহরগুলির উৎপত্তি ঘটল এবং সেই সঙ্গে আবির্ভাব ঘটল এমন এক শ্রেণীর যারা কয়েক শতাব্দীর সামন্তপ্রথার শিকল ভাঙতে উদ্যত হয়েছে। এই নগর জীবনের প্রভাব এসে পড়ল ম্যানরের মধ্যেও। ম্যানরবাসীর চিরকালের ধ্যান-ধারণা পাল্টে যেতে লাগল, সেই সঙ্গে চার্চের প্রতিও মোহভঙ্গ ঘটতে লাগল কিছু কিছু। ধর্মযাজকগণ ক্ষিপ্ত হল বার্গারদের উপর— সামন্তপ্রথার বিরোধীদের ঘোষণা করা হল ঈশ্বরবিরোধী (Heretic) বলে, বিধান দেয়া হল তাদের পুড়িয়ে মারার। কিন্তু সমাজের পরিবর্তন রোধ করা গেল না, ঠেকিয়ে রাখা গেল না ইতিহাসের অমোঘ গতিকে। ক্রুসেডের মাধ্যমে ধর্মোন্মাদনার সৃষ্টি করা হলেও এর ফলাফল চার্চের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করল। ক্রুসেড পরোক্ষভাবে সামন্ত প্রথাকেই আঘাত করল—শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয়; চেতনার ক্ষেত্রে এর পরিব্যাপ্তি সকলকেই গ্রাস করল। আর চার্চ চেষ্টা করল নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে এবং সে জন্য চার্চ বাধ্য হল গ্রিক দর্শনের শরণাপন্ন হতে, যাকে সে একদা পরিত্যাগ করেছিল ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে।

মধ্যযুগের ইউরোপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে চার্চ বা গির্জা সংগঠন। মধ্যযুগের চিন্তা ও দর্শনকেও গির্জাই নিয়ন্ত্রিত করেছে। যে সব সূত্র বা উৎসকে গির্জার ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হত সেগুলো হল : বাইবেল বা যীশু খ্রিস্টের বাণী, সেন্ট অগাস্টিন ও অন্যান্য ধর্মগুরুদের রচনা এবং গির্জা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ। এ সকল উৎসকে অভ্রান্ত ও খাঁটি সত্য বলে মনে করা হত। কিন্তু চার্চ এ সকল মতবাদ ও গোঁড়ামী দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে পারলেও এক পর্যায়ে এসে বিপত্তি দেখা দিল। পণ্ডিতরা যখনই চার্চের গোঁড়া মতবাদের কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি খুঁজে পেতেন না তখনই নানা রকম মতের উদ্ভব হত।

বার শতকে প্রাচীন গ্রিকদের ও মধ্যযুগের মসুলমানদের রচনা ইউরোপে এসে পৌঁছালে ইউরোপের ধর্ম ও দর্শন চিন্তায় প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয়। মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ে ইউরোপে শুধু ল্যাটিন ধর্মগুরু এবং প্লিনি প্রমুখ রোমান পণ্ডিতের রচনার প্রচলন ছিল। প্লেটো, এরিস্টটল বা

www.pathagar.com

আর্কিমিডিসের গ্রিক রচনাগুলির সাথে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা প্রথম দিকে পরিচিত ছিলেন না। মুসলমানরা যে-সব গ্রন্থ গ্রিক থেকে আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন সে-সব অনুবাদ বার শতকে ইউরোপে এসে পৌঁছুতে শুরু করে। ক্রুসেডের সময়েও অনেক পণ্ডিত বাইজেন্টাইন অঞ্চল থেকে গ্রিক পাণ্ডুলিপিসহ ইতালি প্রভৃতি স্থানে চলে আসেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এসব আরবি ও গ্রিক পাণ্ডুলিপিকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এভাবে বার শতকে প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিত এবং মধ্যযুগের মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের রচনা ইউরোপে এসে পৌঁছায়। এরিস্টটলের নীতিবিদ্যা (এথিকস), কাব্যশাস্ত্র (পোয়েটিকস) অলঙ্কারশাস্ত্র (রোটোরিকস্) প্রভৃতি গ্রন্থ সরাসরি গ্রিক থেকে অনূদিত হয়। এরিস্টটলের যুক্তিশাস্ত্র সম্পর্কিত সমস্ত রচনা ইউরোপে এসে পৌঁছালে তাঁকে মধ্যযুগের পণ্ডিতরা যুক্তিশাস্ত্রের সেরা পণ্ডিত হিসেবে মেনে নেন। বস্তুত মধ্যযুগের পণ্ডিতরা ক্রমে এরিস্টটলের রচনাকে বাইবেলের পরেই স্থান দেন। এ ছাড়া ইউক্লিডের জ্যামিতি ও 'আল-খারিজমির বীজগণিত, জ্যোতির্বিদ টলেমি রচিত 'আল মাজেস্ট' এবং হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও ইবনেসিনার চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলীও মধ্যযুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতে পৌঁছেছিল।

এরিস্টটল ও অন্যান্য গ্রিক দার্শনিকদের রচনা পড়ে ইউরোপের মধ্যযুগের পণ্ডিতরা বুঝতে পারেন যে, এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে চার্চের ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারলে একটা দুরূহ দার্শনিক সমস্যার সমাধান করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন ছিল বাইবেল ও খ্রিস্টীয় ধর্মগুরুদের শিক্ষার সাথে প্লেটো, এরিস্টটলের দর্শনের সমন্বয় সাধন। এ সমন্বিত দর্শনের নাম স্কলাস্টিক দর্শন (Scholastic Philosophy বা Scholasticism)। দর্শনের সূত্রপাত করেছিলেন ফরাসি পাদ্রি ও দার্শনিক পিটার আবেলার্ড (১০৭৯—১১৪২ খৃঃ)। এগার শতকে ইউরোপের খ্রিস্টান পণ্ডিতদের মধ্যে দুটো দার্শনিক মতের উদ্ভব হয়েছিল। একটি মত অনুসারে শ্রেণীগত নামের বা সাধারণ নামবাচক শব্দের অস্তিত্ব নেই, শুধুমাত্র মূর্ত পদার্থেরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে; যেমন প্রত্যেকটা আমের পৃথক পৃথক এবং বাস্তব অস্তিত্ব আছে; কিন্তু সাধারণভাবে আম বললে কোনো বাস্তব পদার্থ বোঝায় না: এ ধরনের শ্রেণীগত নাম একটি বিমূর্ত ধারণা। এ-মতটি নামবাদ বা নমিনালিজম (Nominalism) নামে পরিচিত হয়েছে। নামবাদের একটা অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, গির্জা একটি সাধারণ নামবাচক শব্দ, অতএব গির্জা সংগঠনের কোনো বাস্তব অর্থ নেই। এ কারণেই গোঁড়া খ্রিস্টানরা এর বিরুদ্ধে এত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

নামবাদের বিরোধী অপর একটি মত ছিল : সাধারণ (general) ধারণাই একমাত্র বাস্তব সত্য, তাদের নাম যাইহোক না কেন। এ মতের নাম দেয়া হয়েছে বাস্তববাদ বা রিয়ালিজম (Realism)। এই মতের প্রবক্তারা অন্য মতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতেন। পিটার আবেলার্ড এ দুই মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি বলেন যে, বস্তুর নামের মধ্যে কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই ঠিকই, কিন্তু কোনো বস্তুর যেমন নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, তেমনি তার নামও আমাদের মনে একটি ধারণার সৃষ্টি করে, এবং আমাদের মনে ও চিন্তায় ঐ নামটির অস্তিত্ব থাকে। এ অর্থে, শ্রেণীগত নামের একটা বাস্তবতা আছে।

পিটার আবেলার্ড অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, 'জ্ঞান লাভের চাবিকাঠি হচ্ছে প্রশ্ন, বিরামহীন প্রশ্ন। সন্দেহ আমাদের নিয়ে যায় অনুসন্ধানের পথে; অনুসন্ধান দ্বারা আমরা সত্যকে লাভ করি।'

আলবার্টস ম্যাগনাস (জন্ম ১১৯৩ খৃঃ) এবং সেন্ট টমাস একুইনাস (জন্ম ১২২৫ খৃঃ) নামক দুইজন পণ্ডিতের চেষ্টায় ১৩ শতকে স্কলাসটিক দর্শন গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এ দর্শনের সৃষ্টিতে

www.pathagar.com

সেন্ট টমাস এ কুইনাসের অবদানই ছিল বেশি। আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে স্কলাসটিক দর্শনের মূল পার্থক্য এখানে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হচ্ছে বিভিন্ন পদার্থ ও প্রক্রিয়ার উৎপত্তি ও বিকাশের কারণ নির্ণয় করা; বস্তুর ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থির করা এবং বিভিন্ন বস্তু ও প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র নির্ণয় করা। কিন্তু স্কলাসটিক দর্শনের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন পদার্থের গুণ ও ধর্ম নিরূপণ করা, বিভিন্ন পদার্থ ও ঘটনার গুঢ় অর্থ নির্ণয় করা। মধ্যযুগীয় দৃষ্টিতে জগৎকে স্থবির ও অপরিবর্তনশীল বলে ধরে নেয়া হত। তাই বস্তুজগতের বিকাশ ও রূপান্তরের কারণ বিশ্লেষণ করার সমস্যাটাই স্কলাসটিক দর্শন অনুভব করতে পারেনি। পরিবর্তন ও বিকাশই যে জগতের মূল বৈশিষ্ট্য এ কথাটাই মধ্যযুগের স্কলাসটিক দার্শনিকরা জানতেন না বা মানতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে জমিদারি ব্যবস্থা চিরস্থায়ী, গির্জা চিরস্থায়ী; এ বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে চিন্তা ও দর্শন তা হল: জগৎ পরিবর্তনহীন। এ কারণেই মধ্যযুগের দার্শনিকরা স্বভাবতই বিশ্বাস করতেন যে, জগৎ স্থবির ও অপরিবর্তনীয়।

সেন্ট টমাস একুইনাস ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্রিস্টান ক্যাথলিক মতের ডোমিনিকান শাখায় যোগদান করেন। পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তবে তাঁর রচনার মধ্যে 'ঈশ্বর তত্ত্বের সারকথা' গ্রন্থটিই সবচেয়ে বিখ্যাত। এরিস্টটলের দর্শন ও বাইবেলের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে সেন্ট টমাস একুইনাস দেখাতে চেষ্টা করেন যে, বিশ্বজগৎ নিয়মশৃঙ্খলা ও যুক্তি মেনে চলে। তিনি বলেন যে, খ্রিস্টীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পরকালে মানবজাতির মুক্তি সাধনের বিষয়ে সহায়তা করার জন্যই সমস্ত বস্তুজগতের সৃষ্টি হয়েছে। এরিস্টটল মনে করতেন যে, এ বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট স্থান ও কর্তব্য আছে: কোনো একটি বিশ্ব পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে সমস্ত ঘটনা ঘটে। এ মতের নাম দেয়া হয়েছে টেলিওলজি (Teleology) বা উদ্দেশ্যবাদ। টেলিওজি অনুসারে প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার সৃষ্টি হয় একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। অপরপক্ষে বিজ্ঞান বলে যে, প্রত্যেক ঘটনা ঘটে তার অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ সম্পর্কের দরুন। বিজ্ঞান বলে যে, কারণ ছাড়া কাজ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানের কার্যকারণ সূত্র টেলিও জি তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। স্কলাসটিক দর্শন এরিস্টটলের টেলিওলজি ও অন্যান্য ভ্রান্ত দর্শনকে গ্রহণ করেছিল। মধ্যযুগের শেষদিকে এরিস্টটলকে বাইবেলের মতো অভ্রান্ত মনে করা হত। স্কলাসটিক দর্শনের সাথে সঙ্গতি থাকায় আরও দুজন গ্রিক পণ্ডিতকে মধ্যযুগে প্রায় এরিস্টটলের সমান মর্যাদা দেয়া হত। এঁদের একজন হলেন জ্যোতির্বিদ টলেমি, আরেকজন চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ গ্যালেন।

জ্যোতির্বিদ টলেমি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে 'আলমাজেস্ট' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আলমাজেস্ট নামটি অবশ্যই মুসলমানদের দেয়া। এ-গ্রন্থে বলা হয়েছিল যে পৃথিবী স্থির, সূর্য তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এ মত খ্রিস্টান চার্চ ও স্কলাসটিক পণ্ডিতরা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কোপার্নিকাস নতুন করে প্রমাণ করেন যে সূর্য স্থির, পৃথিবীই ঘুরছে। তবে টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক মতবাদ ভুল হলেও আলমাজেস্ট গ্রন্থটির বাস্তব উপযোগিতা ছিল। এ গ্রন্থে বর্ণিত পদ্ধতি ও নানা প্রকার তালিকার সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করা যেত।

চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ গ্যালেন (১৩০–২০০ খ্রিঃ) খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে যে গ্রন্থ রচনা করেন সেটিও গির্জা এবং স্কলাসটিক দার্শনিকদের অনুমোদন লাভ করেছিল। কারণ স্কলাসটিকদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এ গ্রন্থটি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে ভেসালিয়াস (১৫১৪–১৫৬৪ খ্রিঃ) নতুন

www.pathagar.com

গ্রন্থ রচনা করে গ্যালেনের ভুল-ত্রুটি প্রদর্শন করেন। কিন্তু মধ্যযুগের শেষপর্যন্ত গ্যালেনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

মধ্যযুগের স্থবির দৃষ্টিভঙ্গি, স্কলাসটিক দর্শন, এরিস্টটল, গ্যালন ও টলেমির ভ্রান্তবিজ্ঞান শেষপর্যন্ত মধ্যযুগের সমস্ত জ্ঞানচর্চার বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছিল। ক্রমে এরিস্টটলের প্রভাব এত সর্বব্যাপী হয়েছিল যে, এরিস্টটলকে পরিপূর্ণভাবে বর্জন না করে বিজ্ঞানের পক্ষে আত্মপ্রকাশ করাই সম্ভব হচ্ছিল না। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, উইপোকার চোখ আছে কিনা জানার জন্য পণ্ডিতরা বাইবেল ও এরিস্টটলের লেখা পড়ে দেখতেন, উইপোকা ধরে দেখতেন না। কারণ বাস্তব পর্যবেক্ষণ যে জ্ঞান লাভের একটা প্রধান উপায় তা স্কলাসটিক দার্শনিকরা মানতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, সর্বজ্ঞপণ্ডিত বা সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রই হল জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস ও পদ্ধতি। তাঁদের মতে এরিস্টটল ছিলেন এরকম একটা সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য উৎস (authority)। একবার একজন ছাত্র সূর্যের গায়ে কালো দাগ বা সৌর কলঙ্ক দেখে সেকথা তাঁর শিক্ষককে জানিয়েছিলেন; ঐ স্কলাসটিক শিক্ষক জবাবে বলেছিলেন যে, ঐ রকম দাগের কথা এরিস্টটলের কোনো গ্রন্থে লেখা নেই, অতএব ঐ দাগ নিশ্চয়ই ছাত্রের চোখেই রয়েছে, সূর্যের গায়ে নয়।

মধ্যযুগের শেষদিকে স্কলাসটিক দর্শনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হয়। পূর্বোক্ত নামবাদ (nominalism) আবার নতুনরূপে ব্যাপ্তি লাভ করে। নামবাদীরা বললেন যে, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ না থাকলে কোনো কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁরা বললেন যে, শুধুমাত্র বিমূর্ত যুক্তির সাহায্যে কোনো সত্যে বা ধর্মীয়-সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। এবার নামবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ইংরেজ পাদ্রি উইলিয়াম অফ ওকাম (William of Occam)। এ দার্শনিকের রচনা ও যুক্তিকৌশল পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক প্রগতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। কালক্রমে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার ঘটার সাথে সাথে মধ্যযুগে স্কলাসটিক দর্শনও বিলুপ্ত হয়েছিল।

মধ্যযুগের সাহিত্য

মধ্যযুগের ইউরোপে প্রথম দিক থেকেই চিরায়ত গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে। খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ এসকল সাহিত্য পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সাহিত্যের নান্দনিক শৈল্পিক দিককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়। পোপ প্রথম গ্রেগরি ধর্মপুস্তকগুলিকে ব্যাকরণের অনুশাসন মেনে চলা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।

গ্রিক-ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের স্থান দখল করে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে তা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে। মধ্যযুগের ইউরোপীয় দেশীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন অষ্টম শতাব্দীতে রচিত এ্যাংলো-স্যাক্সনদের Beowulf নামক মহাকাব্যটি। প্রাচীন জার্মান জাতির ঐতিহ্য ও বীরত্বের গাথা বর্ণিত হয়েছে এই মহাকাব্যটিতে।

এ যুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রে আইরিশদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আইরিশ লেখক

www.pathagar.com

ও সন্তগণ তাঁদের স্থল ও সামুদ্রিক অভিযানের উপর বহু কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণাঢ্য বর্ণনার উপর ভিত্তি করে অনেক কবিতাও রচিত হয়েছে।

মধ্যযুগের শেষের দিকে গ্রিক-ল্যাটিন সাহিত্যের প্রতি পুনরায় আগ্রহের সৃষ্টি হতে থাকে যা পরবর্তীকালে রেনেসাঁর জন্ম দেয়। চার্চ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষাদানের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। ল্যাটিন ভাষায় কাব্য, বিশেষত গীতিকাব্য রচনা শুরু হয়। গলিয়ার্দি নামক কবিরা এই ধরনের কাব্য রচনা করেন। এদের কবিতাগুলি সাধারণত মানব-মানবীর প্রেম, ঋতুচক্রের সুদৃশ্য বর্ণনা অথবা স্বাধীন মুক্ত জীবনের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত। ধর্মযাজকদের জীবন ও চরিত্র নিয়ে প্যারডি কাব্যও এঁরা রচনা করতেন। এঁরা নিজেদের গলিয়ার্দ বা শয়তানের শিষ্য বলে ঘোষণা করতেন। প্রধানত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভবঘুরে ছাত্ররাই ছিলেন এ শ্রেণীভুক্ত কাব্যের রচয়িতা। মধ্যযুগের প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এঁরাই সর্বপ্রথম সাহিত্যের মাধ্যমে সোচ্চার বক্তব্য পেশ করেন।

ল্যাটিন সাহিত্যের পাশাপাশি দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হতে থাকে। মহাকাব্যগুলি পূর্ণ অবয়ব ধারণ করে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। ফরাসি ভাষায় রচিত হয় Song of Roland, জার্মানি ভাষায় Song of the Nibelungs, স্পেনীয় ভাষায় Poem of my Cid এবং নর্মানদের Saga গুলি। এগুলির মূল বিষয়বস্তু ছিল বীরত্ব, সম্মান ও প্রভুর প্রতি আনুগত্য দেখান। নায়কের পৌরুষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই এ সকল রচনার মূল উদ্দেশ্য।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে ইউরোপের সামন্তসমাজের মন ও মানসিকতার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার কিছুটা প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সে যুগের সাহিত্যে। এ যুগের চারণ কবিদের কাব্যে তাই পাওয়া যায় সামন্ত রমণীর প্রেমোপাখ্যান, তার সুমধুর হাসি, তার স্বর্গীয় রূপের অপূর্ব বর্ণনা। এদের কাব্যে ধর্মযাজকদের লোভ ও মোনাফেকির চমৎকার ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা পাওয়া যায়।

সামন্ত ভাবাদর্শের পরিপূর্ণ রূপের পরিচয় পাওয়া যায় আর্থারিয়ান চক্রের রোমান্টিক উপাখ্যানগুলির মধ্যে। এই রোমান্টিক উপাখ্যানগুলির মূল বিষয় সংগ্রহ করা হয়েছে বিখ্যাত কেল্টিক বীর আর্থারের কাহিনী থেকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কয়েকজন নর্মান ও ফরাসি লেখক আর্থারের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে কতগুলো উপাখ্যান রচনা করেছেন যার মূল বিষয় হল প্রেমের রোমান্স ও এডভেঞ্চার, যেগুলি ছিল উজ্জ্বল বর্ণনায় সমৃদ্ধ ও কাব্য সৌন্দর্যে অনুপম। পরবর্তীকালে কয়েকজন জার্মান লেখকের রচনাও এর সাথে যুক্ত হয়। এই কাহিনীগুলিতে বীরত্ব, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, বিপন্নকে উদ্ধার, দুর্বলকে রক্ষা প্রভৃতি নাইটদের যাবতীয় আদর্শের এক অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। তবে প্রেমের রীতির ব্যাপারে এ সকল কাহিনীর লেখকদের মধ্যে মতবিরোধ অনেক সময় পরিস্ফুট হয়েছে। কারও কারও মতে দাম্পত্য প্রেমই আদর্শ প্রেম। অন্যেরা আবার পরকীয়া প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। এ শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট রোমান্টিক উপাখ্যানগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিয়োগান্তক ভাবে। জার্মান লেখক গটফ্রিড ভন স্ট্রাসবুর্গ-এর Triston গ্রন্থটি এ-ধরনের রচনার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু হল : প্রেম মানেই দুঃখ ও দহন এবং এর পরিণতি ঘটে শুধুমাত্র ব্যথা, বিয়োগ ও মৃত্যুতে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের সাহিত্যে বার্গারদের প্রবেশ ঘটে। এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Aucassin and Nicolitte। স্পেনের পটভূমিতে রচিত এই গ্রন্থের নায়ক অকাসিন একজন সামন্ত নাইট। সে প্রেমে পড়ল নিকোলেট নামের একটি সারাসিন ক্রীতদাসীর। সমাজের দৃষ্টিতে এ প্রেম অবৈধ। অকাসিনের প্রতি সমাজ ও ধর্মপতিদের সাবধান বাণী উচ্চারিত হল যদি

www.pathagar.com

সে তার প্রেমিকাকে পরিত্যাগ না করে তা হলে সে অনন্তকাল নরক ভোগ করবে। এর উত্তরে অকাসিন বলল, তাতে তার কিছু এসে যায় না কারণ নরকে সে তাদেরই সান্নিধ্য লাভ করবে যারা এই পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে বেঁচেছিল। মধ্যযুগের কোন নায়ক সমাজের ভ্রূকুটিতে এমন নির্বিকারভাবে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে কি?

নগরবাসীদের আরেকটি প্রিয় গ্রন্থ Fabliaux নামের গল্প সংগ্রহটি। অনেকটা অশোভনভাবে এতে দেখানো হয়েছে শিভালরির অসারতা, নাইটদের এডভেঞ্চারের নামে ফাঁপা বীরত্ব প্রভৃতি। সাথে সাথে এর মধ্যে আছে ধর্মযাজকদের প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ হল উইলিয়াম অফ লরিস ও জন অফ মিউয়েন রচিত Romance of the Rose এবং দান্তের Divine Comedy। Romance of the Rose গ্রন্থটি দুখণ্ডে রচিত। এর প্রথম খণ্ডের রচয়িতা উইলিয়াম অব লরিস তাঁর রচিত অংশে শিভালরিমূলক প্রেমকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় অংশের রচয়িতা জন অব মিউয়েন অবশ্য মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দিহান। তিনি সকল কুসংস্কার এবং ধর্মের নামে প্রচলিত সকল অনাচারের প্রচণ্ড বিরোধী। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে বার্গার শ্রেণীর প্রতিভূ।

Romance of Rose গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের শেষ দিকের সমাজের দুটি বিপরীত শ্রেণীর চিন্তাধারার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ Divine Comedy। এর রচয়িতা দান্তে আলেঘিরি (১২৬৫—১৩২১ খৃঃ) ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে ইতালির ফ্লোরেন্সের একজন আইনজীবীর পুত্র। প্রথম জীবনে তিনি ফ্লোরেন্সের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি দর্শন ও সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। এক পর্যায়ে দান্তে যে রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন সে দল ফ্লোরেন্সের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয় এবং দলটিকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা হয়। ফলে দান্তেকেও ফ্লোরেন্স থেকে বহিষ্কৃত হতে হল। জীবনের বাকি অংশ তিনি জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত অবস্থায় কাটান। এই নির্বাসিত জীবনেই তিনি তাঁর বিখ্যাত Comedy গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে দান্তের অনুরাগীবৃন্দ এ গ্রন্থের নামকরণ করেন Divine Comedy। মধ্যযুগের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির পুরো পরিচয় এ গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায়। সামন্তযুগের স্কলাসটিক দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, অর্থনীতি ও নৈতিক আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে এ গ্রন্থটিতে।

এই গ্রন্থের মূল বিষয় হল যুক্তি ও ঐশ্বরিক আশীর্বাদ দ্বারা মানবাত্মার মুক্তি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ যার কেন্দ্রস্থলে এই পৃথিবী অবস্থিত এবং এর সবকিছুই সৃষ্ট হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। প্রতিটি প্রাকৃতিক বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে কোনো না কোনো ঐশ্বরিক শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, যার সর্বশেষ উদ্দেশ্য মানবাত্মার মুক্তি। এই গ্রন্থের নায়ক দান্তে নিজেই। নায়িকা বিয়াত্রিচের সাথে সাথে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন স্বর্গ, মর্ত ও পারগেটরি। সে সব স্থানে তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছেন পোপ, সম্রাট, রাজা, বীর, কবি, শিল্পী এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের। এঁদের সকলের পরিচিতি তিনি তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এবং সাথে সাথে বর্ণনা করেছেন তাঁদের কীর্তিকাহিনী। এঁদের কথা মধ্যযুগের মানুষেরা অনেক আগেই বিস্মৃত হয়েছিল। দান্তেকে বলা হয় রেনেসাঁর অগ্রদূত। কারণ তিনি তাঁর Divine Comedy-র মধ্য দিয়ে প্রাচীন গ্রীক-রোমান ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন, বহু শতাব্দীর বিস্মৃত ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের

www.pathagar.com

পুনরুত্থান রেনেসাঁর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। দান্তে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে মানবতাবাদী। মনেপ্রাণে ধার্মিক হলেও ধর্মীয় গোঁড়ামীর অনেক উর্ধ্বে ছিল তাঁর অবস্থান। তাই যেমন এরিস্টটল, সেনেকা, ভার্জিল ও বিভিন্ন রোমান সাহিত্যিকদের তিনি পারগেটরিতে মনোরম পরিবেশে স্থান দিয়েছেন, তেমনি অনেক পোপকে আবার নরকে নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর উচ্চ কল্পনাশক্তি, কাব্যরীতি এবং সর্বোপরি তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তিনি যথার্থভাবেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে স্থান লাভ করেছেন।

মধ্যযুগের শিল্পকলা

মধ্যযুগের শিল্পকলা স্থাপত্য শিল্পকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। আর ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিকাশ ঘটেছিল স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে। অবশ্য মধ্যযুগের ইউরোপে স্থাপত্য বলতে একমাত্র গির্জার স্থাপত্যকেই বোঝাত। সমস্ত ইউরোপে দুটি বিশিষ্ট স্থাপত্য রীতির উদ্ভব ঘটেছিল, যথা, রোমানেস্ক ও গথিক রীতি।

খ্রিস্টানরা প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রোমান যুগে মাটির নিচের ঘরে গোপনে উপাসনা করত, কারণ সে সময়ে খ্রিস্টধর্ম বেআইনি ছিল। পরে রোমান যুগের শেষদিকে যখন খ্রিস্টানরা প্রকাশ্যে উপাসনা করার অধিকার পেল তখন তারা রোমান রীতির গৃহ নির্মাণ করত। পরবর্তীকালে ক্যারোলিঞ্জিয়ান যুগে নতুন ও বড় আকারের উপাসনাগৃহের প্রচলন হয়। এ সকল গৃহ সাধারণত কাঠের তৈরি ছিল বলে নবম ও দশম অরাজকতার সময়ে সেগুলি ধ্বংস হয়ে যায়।

রোমানেস্ক স্থাপত্য

এগার শতকে ক্লুনির সংস্কারের সাথে সাথে নতুন ধরনের স্থাপত্য রীতির আবির্ভাব ঘটে। এ স্থাপত্য রীতির নাম রোমানেস্ক (Romanesque) শৈলী।

রোমানেস্ক স্থাপত্যশৈলীতে গোলাকৃতি খিলান ব্যবহার করা হত। রোমানেস্ক স্থাপত্য শৈলিতে রোমান স্থাপত্যরীতির অনুকরণে খিলান নির্মাণ করা হত।

রোমানেস্ক রীতির গির্জা ইউরোপের সর্বত্রই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এ সকল গির্জার দেয়ালগুলি ভারী ও পুরু হত এবং দেয়ালে বেশি জানালা কাটা যেত না। পরবর্তীকালে গথিক রীতির গির্জায় এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল।

রোমানেস্ক স্থাপত্যের অনুরূপ রোমানেস্ক ভাস্কর্যেরও উদয় ঘটেছিল। গির্জার অভ্যন্তর ভাগের অলঙ্করণের জন্য এ সকল ভাস্কর্য ব্যবহৃত হত।

গথিক স্থাপত্য

বার-তের শতকের রোমানেস্ক রীতির পরিবর্তে গথিক রীতির গির্জা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গথিক রীতি অবশ্য বর্বর গথদের উদ্ভাবিত না। পরবর্তীকালে রেনেসাঁর যুগের পণ্ডিতরা অবজ্ঞাভরে এ সকল মধ্যযুগীয় গির্জাকে গথিক বা 'বর্বরোচিত' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।

গথিক গির্জার খিলানগুলি উঁচু সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট হত। এর নির্মাণ কৌশল এমন ছিল যে, খিলানের কাঠামোগুলিই ছাদের ভার সহ্য করতে পারত, ভারী দেয়ালের প্রয়োজন হত না। গথিক গির্জায় তাই অনেক বেশি পরিমাণে জানালা রাখা হত। ইউরোপের উত্তরাংশে সূর্যের আলো কম বলে

www.pathagar.com

জানালার প্রয়োজনীয়তা ছিল খুব বেশি। রোমানেস্ক গির্জাগুলি গড়ে উঠেছিল মঠসমূহের উদ্যোগে। কিন্তু গথিক গির্জাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই শহরের মানুষদের উদ্যোগ ও উদ্যমের ফলে তৈরি হয়েছিল।

গথিক গির্জার অভ্যন্তর ভাগকে অলঙ্কৃত করার জন্য গথিক ভাস্কর্যের সৃষ্টি হয়েছিল। গথিক ভাস্কর্যের মূর্তিগুলিকে উঁচু দরজার সাথে সঙ্গতি রেখে লম্বা করে তৈরি করা হত। বস্তুত এ মূর্তিগুলি ছিল প্রতীকধর্মী।

রঙিন কাচের জানালা

গথিক গির্জার জানালাগুলি রঙিন ও চিত্রিত কাচ দিয়ে সাজান হত। রঙিন কাচের জানালা ছিল মধ্যযুগের ইউরোপের এক অনবদ্য শিল্পকলা। তের শতকের কারিগররা গলান কাচে গরম অবস্থায় রঙিন খনিজ পদার্থ মিশিয়ে রঙিন কাচ তৈরি করতেন। সিসার পাতের কাঠামোয় টুকরো টুকরো রঙিন কাচ বসিয়ে সুন্দর চিত্রিত জানালা তৈরি করা হত। এসব রঙিন জানালায় নানারকম দেবদেবীর ছবি অথবা কোনো ঘটনার বিবরণমূলক ছবি থাকত। এ-সকল রঙিন জানালার ছবি থেকে মধ্যযুগের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। রঙিন কাচের জানালা তৈরির কৌশল বর্তমানে লোপ পেয়ে গেছে।

চিত্রকলা

মধ্যযুগের ইউরোপে চিত্রকলার খুব বেশি বিকাশ ঘটেনি। গির্জার অভ্যন্তর ভাগকে সাধারণত মূর্তি দিয়েই অলঙ্কৃত করা হত। দেয়াল চিত্র আঁকার রেওয়াজ বিশেষ ছিল না। গথিক গির্জাগুলিতে বড় দেয়াল খুব বেশি ছিল না। তবে মধ্যযুগে হাতে লেখা বইয়ের ভিতরে সুন্দর রঙিন ছবি আঁকার প্রচলন ছিল। পুঁথির চিত্রায়ণ ও অলঙ্করণের মাধ্যমে ঐ যুগে চিত্রকলার কিছু বিকাশ ঘটেছিল।

সঙ্গীত

মধ্যযুগের ইউরোপে গির্জার প্রার্থনা সঙ্গীতকে অবলম্বন করে সঙ্গীত শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল, পাশাপাশি লোকায়ত সঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীতের ধারাও অব্যাহত ছিল। লোকায়ত সঙ্গীতসমূহ বাদ্যযন্ত্র সহকারে এবং বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষায় গাওয়া হত। গির্জায় সৃষ্ট সঙ্গীতের সাথে লোকায়ত সঙ্গীতের সম্মিলকদের মাধ্যমে ইউরোপে এক অতি অপরূপ সঙ্গীতকলার জন্ম হয়।

মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা

খ্রিস্টধর্মের মূলমন্ত্র হল বিশ্বাস: ধর্মযাজকগণ যা ব্যাখ্যা করেন তাতে সন্তুষ্ট চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করাই প্রকৃত খ্রিস্টানের কর্তব্য। যে ধর্ম বা দর্শনের প্রধান শিক্ষা বিশ্বাস, সেখানে বিজ্ঞানচর্চা বা জ্ঞানের অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। কাজেই খ্রিস্টধর্মযাজকগণ গ্রিক বিজ্ঞান বা দর্শনের চর্চার উপর (যা তখনও অতি অল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন—কেননা তা বিধর্মীদের অলস মস্তিষ্কের আবর্জনা মাত্র।

আর্চবিশপ থিওফেলাসের নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির একাংশ (গ্রিক বিজ্ঞান চর্চার

www.pathagar.com

ফল যেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে সঞ্চিত ছিল) ধ্বংস করা হল। এর কিছুকাল পরে বিদুষী গণিতজ্ঞ হাইপেসিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। খ্রিস্টানদের এই ব্যাপক আক্রমণের ভয়ে বহু গ্রিকপণ্ডিত আলেকজান্দ্রিয়া পরিত্যাগ করে এথেন্সে প্লেটোর একাডেমির দ্বারস্থ হলেন। কিছুদিন পরে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের এক নির্দেশ দ্বারা প্লেটোর একাডেমিও বন্ধ করে দেয়া হল (৫২৯ খৃঃ) এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার গ্রিকবিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচার আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হল।

এরপর শুরু হল কয়েক শতাব্দীব্যাপী তমসার যুগ। বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ, জ্ঞানের অনুশীলনের আর প্রয়োজন নেই; ধর্মজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান। চার্চের ছত্রছায়ায় সারা পশ্চিম ইউরোপ এক অজ্ঞতার পরিমণ্ডলে নিমজ্জিত হল। মানুষের চেতনার দ্বার হল রুদ্ধ; কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামী, জঘন্য হীন যাদুবিদ্যা প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসের নামে মানুষের অন্তরে শিকড় গেড়ে বসল। কয়েক শতাব্দীব্যাপী মধ্যযুগের মননশীলতার এটাই হল ইতিহাস।

এই চরম তমসার যুগে কোথাও কোথাও ক্ষীণ প্রদীপের শিখার মতো জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত হতে দেখা গেছে। মধ্যযুগের মঠগুলিতে ধর্ম চর্চার প্রয়োজনেই কখনও কখনও জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন বা গণিতের চর্চা হয়েছে।

নবম শতাব্দীতে সম্রাট শার্লামেন তাঁর রাজধানী আচেন-এর রাজপ্রাসাদে যে স্কুল খুলেছেন, সেখানেও কিছু কিছু জ্ঞানচর্চা হয়েছে। রাজপরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে যে বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল তাতে সম্রাটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিতবর্গ সমবেত হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের ইয়র্ক থেকে এসেছিলেন অ্যালকুইন, প্রাসাদ স্কুলের তিনি ছিলেন প্রধান পরিচালক। অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে ছিলেন দার্শনিক জন স্কটাস এরিগোনো ও কবি ওয়াল ফ্রিড স্ট্র্যাবো। কিন্তু জ্ঞানচর্চার পরিব্যাপ্তি অতি ক্ষুদ্র স্থানে সীমিত থাকায় সারা ইউরোপ এর আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল।

দশম শতাব্দী থেকে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিস্টীয় যাজকতন্ত্র নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই আবার জ্ঞানচর্চার দিকে ঝুঁকে পড়ে! কেবল সৎ কাহিনী ও নীতিকথা শুনিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব ছিল না; যাজকদের লিখতে, পড়তে ও চিন্তা করতে শিখতে হত যাতে তাঁরা চার্চের যাবতীয় ঐহিক ও পারত্রিক দাবিদাওয়ার কথা জোর গলায় প্রচার করতে পারে এবং লোকজনকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রথমাবস্থায় গির্জার নিজস্ব স্কুলগুলোতেই যাজকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এ স্কুলগুলোই স্ফীত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রাথমিক মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় বলতে সাধারণত কর্পোরেশন বা গিল্ডকেই বোঝাত। এগুলো ছিল কারিগরি গিল্ডদের মতোই। এদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের ট্রেনিং দেয়া এবং শিক্ষকতার লাইসেন্স বা অনুমতি প্রদান করা।

পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়টি সর্বাধিক পুরোনো তা নিশ্চিত বলা কঠিন। সম্ভবত স্যালারনো বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। দশম শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় বোলোনা ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় দুটি। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ এবং ইতালির মন্টপেলিয়ার, স্যালাম্যানকা, রোম এবং নেপলস বিশ্ববিদ্যালয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে জার্মানিতে গড়ে উঠল একে একে কয়েকটি

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাগ, ভিয়েনা, হাইডেলবার্গ, কলোন ইত্যাদি। এভাবে মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াল আশিতে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণত দুটি মডেলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। দক্ষিণ ইউরোপের, যথা সমগ্র ইতালি, স্পেন এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হত সাধারণত ছাত্রদের দ্বারা। ছাত্ররাই শিক্ষকদের নিযুক্ত করত। তাঁদের বেতন প্রদান করত, আবার কখনও কখনও অযোগ্য শিক্ষকদের জরিমানা এমনকি চাকরিচ্যুত করত। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হত। উত্তর ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে গঠিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়াও ধর্মশাস্ত্র এবং কলাবিদ্যাও শিক্ষা দেয়া হত। এক-একটি বিষয়ের জন্য ছিল এক-একটি ফ্যাকাল্টি। প্রতিটি ফ্যাকাল্টির কর্তা ছিলেন একজন নির্বাচিত ব্যক্তি। তাঁকে বলা হত ডিন। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কতকগুলি কলেজকে সংযুক্ত করা হত। এই কলেজগুলি ছিল সাধারণত দরিদ্র ছাত্রদের বাসস্থান। কালক্রমে উপলব্ধি করা হল যে, সকল ছাত্রকে আবাসিক ভবন বা হস্টেলে রাখলেই কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ও শৃঙ্খলা পুরোপুরিভাবে বজায় রাখা সম্ভব। কিন্তু পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ই শুধুমাত্র এই পদ্ধতি বহাল রাখে।

আধুনিক কালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদিও অনেকটা মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত, তথাপি মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয় ছিল আধুনিক পাঠক্রম ও বিষয়ের থেকে অনেকাংশে পৃথক। ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ই মধ্যযুগে শিক্ষা দেয়া হত না। প্রাথমিক পর্যায়ে চার অথবা পাঁচ বছরে ছাত্রদের সাধারণত তিনটি বিষয়ে (Trivium) পাঠ গ্রহণ করতে হত; যথা—ব্যাকরণ, সাহিত্য তত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যা। সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে Bachelor of arts ডিগ্রি দেয়া হত; পরবর্তীতে তাকে তিন অথবা চার বছর Master of Arts ডিগ্রি লাভের জন্য অধ্যয়ন করতে হত। এ সময়ে তার পাঠ্য বিষয় ছিল চারটি (quadrivium); যথা—গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীত। অবশ্য গণিত বলতে বোঝাত শুধুমাত্র সংখ্যাতত্ত্ব এবং সঙ্গীত অর্থ ছিল ধ্বনির মূল বৈশিষ্ট্য।

এর পরবর্তী পর্যায়ে Doctor ডিগ্রি দেয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীর বিশেষ যোগ্যতার উপর গুরুত্ব দেয়া হত। প্রার্থী পঁয়ত্রিশ বছর বয়স অতিক্রম না করা পর্যন্ত এ ডিগ্রি লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে এ জন্য প্রার্থীকে প্রায় চৌদ্দ বছর পর্যন্ত গবেষণা করতে হত। মাস্টার বা ডক্টর ডিগ্রিকে শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নকাল ছিল ছাত্রদের জীবনের একটি বিশেষকাল। ছাত্ররা ছিল বিভিন্ন দেশ ও শ্রেণী থেকে আগত। একজন ফরাসি অথবা জার্মান ছাত্রকে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য যেতে হত ইতালির বোলোনা অথবা পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। তেমনি একজন ইংরেজ অথবা ইতালীয়ান ছাত্রকে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে যেতে হত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতি ও শ্রেণীগত বিভিন্নতা ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি করত চিন্তাধারার বিচ্ছিন্নতা এবং স্বভাব, কৃষ্টি ও ভাষাগত বিভিন্নতা। ছাত্রদের পাঠ গ্রহণের পদ্ধতি ছিল মোটামুটি নিম্নরূপ :

একটি কক্ষে শিক্ষক বক্তৃতা করতেন মেঝে থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচুতে অবস্থিত প্লাটফরম থেকে। ছাত্ররা সারি সারি কাঠের বেঞ্চে বসে শিক্ষকের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করত। কাগজের প্রচলন না হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যেত না। দুর্লভ প্রাচীন পুঁথির দু-একটি কপি ধনী ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ সংগ্রহ করতে পারলেও সাধারণ ছাত্রদের তা ছিল নাগালের বাইরে। মাঝে মাঝে

www.pathagar.com

ছাত্ররা শিক্ষকের বক্তৃতার সারাংশ মোমের পাতের উপর একপ্রকার সুচালো কাঠির সাহায্যে লিপিবদ্ধ করত। তথাপি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নিজস্ব স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করে পাঠ্য বিষয় মনে রাখতে হত। ক্লাসের শেষে ছাত্ররা প্রদত্ত বক্তৃতার বিভিন্ন দিক নিয়ে পরস্পরের সাথে আলাপ-আলোচনা করত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে ছাত্রদের খেলাধুলা বা চিত্ত বিনোদনের বিশেষ কোনো সুযোগ ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী; কেউ কেউ আবার উচ্ছৃঙ্খল, পাঠে অমনোযোগী। অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হত ধর্মদ্রোহিতার। ধর্মীয় অনুশাসনের কঠোরতা পালিত হওয়া সত্ত্বেও পোপ ও ধর্মযাজকগণ প্রায়শই ছাত্রদের মধ্যে খুঁজে পেতেন নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহীদের।

মধ্যযুগের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা

বিজ্ঞান

মধ্যযুগের ইউরোপে বিজ্ঞান চিন্তার প্রসার খুব বেশি ঘটেনি। স্থবির অর্থনীতি ও গির্জার কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং স্কলাসটিক দর্শন ছিল বিজ্ঞানের বিকাশের পরিপন্থী। প্রাচীন গ্রিসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ মধ্যযুগের প্রথম দিকে ইউরোপবাসীর নিকট অজানা ছিল। বার শতকে গ্রিক ও আরবি গ্রন্থগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করলে ইউরোপবাসী প্রাচীন গ্রিসের জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে পরিচিত হয়। প্রাচীন গ্রিকপণ্ডিতদের অনেক রচনা প্রথমে মুসলমানরা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং পরে আরবি থেকে সেগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আবার, মধ্যযুগে মুসলমানরা গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার সাধন করেছিলেন সে সংক্রান্ত গ্রন্থও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের বিজ্ঞান চর্চায় সহায়তা করেছিল। মুসলিম গণিতবিদদের রচনা দ্বারা উৎসাহিত হয়েই তের শতকে 'লিওনার্ড অব পিসা' নানাপ্রকার গাণিতিক আবিষ্কার সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন।

মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপে কয়েকজন নতুন মৌলিক চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞানিকের উদয় ঘটেছিল; এঁরা হলেন অ্যাডেলার্ড অব বাথ, সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও রোজার বেকন।

অ্যাডেলার্ড অব বাথ খ্রিস্টীয় বার শতকের প্রথম দিকে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূত্রপাত করেন। তিনি এরিস্টটল বা অন্য কোনো প্রামাণ্য সূত্রের উপর আস্থা রাখতে অস্বীকার করেন এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষামূলক পদ্ধতির পক্ষ সমর্থন করেন। বস্তুত, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ দুটো হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দুটো মূল অঙ্গ।

সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক তের শতকের প্রথম দিকে পবিত্র রোমান সম্রাট ছিলেন। তিনি নিজে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল অবদান ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ দান। তিনি আরবি গ্রন্থসমূহ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং লিওনার্ড অফ পিসা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অর্থ সাহায্য প্রদান করতেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে মৃতদেহ কেটে পরীক্ষা করার আইন প্রণয়ন করেন এবং নেপলস বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যার শাখাটি ছিল ইউরোপের একটি সেরা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়।

মধ্যযুগের একজন সেরা বিজ্ঞানী ছিলেন রোজার বেকন (আনুমানিক ১২১৪—১২৯৪ খৃঃ)। তিনি আলোকবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর রচনা কয়েক শতাব্দী ধরে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়েছিল। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তাঁর বিজ্ঞান চিন্তা। রোজার বেকন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম প্রবর্তক। তিনি বাস্তব জগৎকে পর্যবেক্ষণ করার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জ্ঞানলাভের পদ্ধতি হিসাবে আরোহ (Inductive) পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্কলাসটিক চিন্তা পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। বেকন এরিস্টটলের রচনা প্রভৃতিকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আরোহ পদ্ধতি ইত্যাদি প্রক্রিয়া হল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল স্তম্ভস্বরূপ।

অবশ্য রোজার বেকন এসব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেননি। প্রাচীন গ্রিসেই এ সকল পদ্ধতি কিছু কিছু আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু রোজার বেকনের মৌলিকত্ব এবং কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি স্কলাসটিক চিন্তার ত্রুটি উন্মোচন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল নিয়ম ও পদ্ধতিগুলি তুলে ধরেছিলেন। রোজার বেকনের মুক্ত চিন্তা ও স্পষ্ট বক্তব্য পরবর্তী পণ্ডিতদের স্বচ্ছ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছে।

মধ্যযুগের ইউরোপে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কার কতটুকু ঘটেছিল এখানে আমরা তাই আলোচনা করলাম। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, মধ্যযুগের ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। তার কারণও অবশ্য ছিল। সামন্ত যুগের স্থবির সমাজ, অর্থনীতি ও জীবনদর্শন বিজ্ঞানের বিকাশের অনুকূল ছিল না। মধ্যযুগের অবসানে যখন সামন্ত অর্থনীতি লোপ পেয়ে ধনতন্ত্রের উদয় ঘটল, তখনই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল। বস্তুত মধ্যযুগের স্কলাসটিক দর্শনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের উদয় হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

মধ্যযুগের কারিগরিবিদ্যা

মধ্যযুগের ইউরোপে বিশেষ কোনো কারিগরি আবিষ্কার ঘটেনি। প্রাচীন গ্রিস, রোম, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের অনেক যান্ত্রিক আবিষ্কার মধ্যযুগের ইউরোপে গিয়ে পৌঁছেছিল। এ সকল কারিগরি কৌশলের প্রয়োগের ফলে মধ্যযুগের সামন্ত অর্থনীতিতে ক্রমশ পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়েছিল। এ কারিগরি কৌশলসমূহের প্রবর্তনের ফলে কীভাবে সামন্ত অর্থনীতির ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের উদয় ঘটেছিল, 'মানুষের ইতিহাসে'র পরবর্তী খণ্ডে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে আমরা শুধু মধ্যযুগের ইউরোপে কি কি কারিগরি ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রচলন হয়েছিল তার উল্লেখ করব।

মধ্যযুগের ইউরোপের অর্থনীতি ছিল গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিনির্ভর। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপে প্রাচীন যুগের কতকগুলো যান্ত্রিক আবিষ্কার বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পানিকল (Watermill) ও বায়ুকল (Windmill)। পানিকলের ব্যবহার রোমান যুগেও ছিল। নদীর পানির স্রোতের সাহায্যে একটা বড় চাকাকে ঘোরানো হত এবং এ ঘূর্ণায়মান চাকার শক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালিয়ে গম ভাঙানো হত বা অন্য কাজ করা হত। রোমান

www.pathagar.com

যুগে পানিকলের সংখ্যা ছিল খুব কম; কারণ, দাসরাই সেখানে সব কাজ করত বলে যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন রোম সাম্রাজ্যে ছিল না।

পানিকল ছাড়াও ১১৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইউরোপে বায়ুকলের প্রসার ঘটে। বায়ুকল সম্ভবত প্রাচীনকালে পারস্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে প্রায় প্রতিটি ম্যানরেই একটা করে পানিকল বা বায়ুকল থাকত। এ সকল বায়ুকল বা পানিকলের সাহায্যে গমকল, করাতকল, কামারশালার বড়বড় হাপর প্রভৃতি চালানো হত। পানিকল এবং বায়ুকলকে তাই মধ্যযুগের যন্ত্র বলেই গণ্য করা যায়, যদিও প্রাচীনকালেই এগুলোর আবিষ্কার ঘটেছিল।

ঘোড়ার নতুন ধরনের সাজ এবং লোহার খুরের প্রবর্তনের ফলে মধ্যযুগের ইউরোপের অর্থনীতিতে গভীর পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। রোমান যুগে ঘোড়ার গলায় যেভাবে দড়ি বাঁধা হত তাতে শ্বাসনালীতে চাপ পড়ত বলে ঘোড়া ভারী মাল বা গাড়ি টানতে পারত না। এদিকে মধ্যযুগের চীনে ঘোড়ার নতুন সাজ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাতে ঘোড়ার কাঁধের উপর দিয়ে একটা বলয় পরানো হত। এর ফলে ঘোড়া অনেক ভারী বোঝা টানতে পারত। এমনিভাবে ঘোড়ার লাঙলের প্রবর্তনও সম্ভব হয়েছিল। নতুন ঘোড়ার সাজের ফলেই পাকা সড়কে মালবাহী ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে মধ্যযুগের ইউরোপে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল।

ত্রয়োদশ শতকে চীন থেকে কম্পাস যন্ত্র ইউরোপে এসে পৌঁছানোর ফলে সমুদ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছিল। এ সময়ে নতুন ধরনের জাহাজের হালও প্রবর্তিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপে যান্ত্রিক ঘড়ির প্রচলন হয়েছিল। তখন সব শহরেই 'টাওয়ার' ক্লক থাকত। পানিকল, বায়ুকল এবং যান্ত্রিক ঘড়ির মেরামতির কাজে নিয়োজিত কারিগররা ক্রমে যন্ত্র কৌশলের বিকাশের পথ উন্মোচন করে।

মধ্যযুগের বাণিজ্য

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে পশ্চিম ইউরোপের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের অবলুপ্তি ঘটে। বর্বরদের আক্রমণ রোমান সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করে দেয়।

স্বনির্ভর সামন্ত অর্থনীতিতে প্রতিটি ম্যানর নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করত। একটি ম্যানরের সাথে আরেকটি ম্যানরের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুযোগ বিশেষ ছিল না। অন্যদিকে রোমের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও ভেঙে পড়ে। মধ্যযুগের ইউরোপে ক্রুসেডের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন বিকাশ ঘটে নি। যদিও পূর্বদিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য তার বিশাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, তথাপি পশ্চিম ইউরোপের সাথে তার বাণিজ্য যোগাযোগ ছিল অতিশয় ক্ষীণ। দশম শতাব্দী থেকে শহরগুলি গড়ে ওঠার সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। শহরগুলিতে প্রস্তুত সামগ্রী বণিকেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেত।

www.pathagar.com

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যপথগুলি হস্তগত করা ছিল ক্রুসেডের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রুসেডের মাধ্যমে এই বাণিজ্যপথগুলি ইতালির বণিকদের হাতে আসে। জেনোয়া, ভেনিস, পিসা ও মিলানের সমৃদ্ধির কারণ তাদের বাণিজ্য। এ সব শহরের বণিকেরা তাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করত আরব বণিকদের কাছ থেকে এবং সেগুলো পৌঁছে দিত ইউরোপের বন্দরে বন্দরে।

মধ্যযুগের ইউরোপের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মূলত দুটি পথে পরিচালিত হত—স্থলপথ ও জলপথ। উভয় পথেই বাণিজ্য পরিচালনা ছিল কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল।

স্থলপথে বাণিজ্য পরিচালনার প্রধান অন্তরায় ছিল পথঘাট ও পরিবহন ব্যবস্থার ত্রুটি। রোমান যুগে নির্মিত রাস্তাঘাটগুলি দীর্ঘ দিনের অযত্নের ফলে ধসে পড়েছিল। মধ্যযুগের রাস্তাঘাটগুলি ছিল প্রধানত ম্যানরের মধ্য দিয়ে তৈরি কাঁচা পায়েচলার পথ। রাস্তার দুদিকে খাদ না থাকার ফলে বর্ষাকালে সেগুলি থাকত কর্দমাক্ত এবং শুষ্ক মৌসুমে থাকত ধূলিপূর্ণ। উপরন্তু রাস্তার মধ্যে খানাখন্দক থাকার ফলে শকটগুলি গর্তে গিয়ে পড়ত। শকট ভেঙে মাল রাস্তায় পড়ে গেলে সেগুলি রাস্তার মালিকের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত; সেগুলি তুলে নেয়ার অধিকার শকট মালিকের ছিল না। রাস্তার মালিকানা থাকত কোনো-না কোন-জমিদারের। ইচ্ছাকৃতভাবে তারা এজন্যই অনেক সময় রাস্তা মেরামত করত না, যদিও পথ ব্যবহারের জন্য বণিকদের কাছ থেকে টোল বা কর জমিদাররা ঠিকই আদায় করত।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে বণিককে প্রায়ই নদী বা খাল পেরুতে হত। নদীর উপর পুল খুব কমই নির্মিত হত। ফলে বণিককে নৌকা বা ফেরির সাহায্য নিতে হত। এজন্যও প্রতিক্ষেত্রে তাকে অর্থ ব্যয় করতে হত। পুল পেরুলেও খাজনা দিতে হত। এভাবে প্রতি পদক্ষেপে অর্থ ব্যয় করতে হত বলে বণিকরা মালের দাম বাড়িয়ে সেটা পুষিয়ে নিত। এ জন্য প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের দামই ছিল চড়া—সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে।

মাল পরিবহনের জন্য সাধারণত অশ্ব বা খচ্চর ব্যবহৃত হত। স্বল্পবিত্তের বণিকরা নিজের পিঠেই মাল বহন করত। পশুচালিত শকটের প্রথম ব্যবহার হয়েছিল ইতালিতে। সেখানকার শহর কর্তৃপক্ষই রাস্তাঘাট চলাচলের উপযোগী করে রাখার চেষ্টা করত। পরবর্তীকালে ফ্রান্স ও জার্মানিতে শকটের প্রচলন হয়। যদিও রাস্তার মালিকেরই দায়িত্ব ছিল নিজের এলাকার রাস্তাঘাট চলাচলের উপযোগী রাখার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই সে দায়িত্ব পালন করত না। বরং অনেক সময় চার্চ এবং মঠগুলি সে দায়িত্ব কিছুটা পালন করত। দেশের সরকারের পক্ষ থেকেও অনেক সময় এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হত। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম হেনরি একবার এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, পদগুলি এমনভাবে প্রশস্ত করতে হবে যাতে দুটি শকট অনায়াসে পাশাপাশি চলতে পারে। পরবর্তীকালে রাস্তার দুই পাশের দুই শত ফুট এলাকার ঝোপজঙ্গল কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। রাস্তাঘাটগুলি দুর্বৃত্তদের হাত থেকে নিরাপদ রাখাই ছিল এ নির্দেশের উদ্দেশ্য। সংঘবদ্ধ ব্যারন, ডাকাত, ভাড়াটে সৈন্যদল ও সাধারণ অপরাধীরা প্রায়ই বণিকদের উপর হামলা করত। মধ্যযুগের শেষের দিকে নিঃস্ব নাইটদের পেশাই ছিল পথের দুধারের ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে অতর্কিতে বণিকদের কাফেলার উপর আক্রমণ করে তাদের সর্বস্ব লুট করা। এ জন্য সাধারণত বণিকেরা দলবদ্ধভাবে ও সাথে সশস্ত্র রক্ষীদল নিয়ে চলাফেরা করত। দীর্ঘপথের মাঝে মাঝে সরাইখানা থাকলেও সেগুলি খুব নিরাপদ ছিল না। চার্চগুলির পক্ষ থেকে কিছু কিছু সরাইখানা স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে সাধারণত বণিকরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সারাইখানা স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছিল।

www.pathagar.com

বিপদসঙ্কুল ভাঙাচোরা পথঘাট, যানবাহনের অপ্রতুলতা ও অন্যান্য কারণে মধ্যযুগের বাণিজ্য স্বভাবতই শ্লথ গতিতে পরিচালিত হত। এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক শহর থেকে আরেক শহরে পণ্য নিয়ে যেতে সময় লাগত অনেক, ফলে পণ্য হয়ে উঠত মহার্ঘ। মধ্যযুগে নদী বা সমুদ্রপথে বাণিজ্য কষ্টকর হলেও স্থলপথ অপেক্ষা তা সহজতর ছিল।

মধ্যযুগে নদীপথে মাল পরিবহনের জন্য নৌকা বা বার্জ এবং সমুদ্রপথে জাহাজ ব্যবহৃত হত। ইতালি, জার্মানি ও ফ্রান্সের শহরগুলিতে নৌকা মালিকদের (keelman) গিল্ড ছিল। সাধারণত যে জমিদারের এলাকার সামনে দিয়ে নদী বয়ে যেত তিনি সে অঞ্চল দিয়ে চলাচলকারী নৌকা বা বার্জ থেকে কর আদায় করতেন। প্রায় প্রতি ছয় মাইল এলাকা পার হলেই কর দিতে হত। কিন্তু জমিদাররা যেহেতু তাদের এলাকার নদীপথ নৌকা চলাচলের উপযোগী রাখত না সেহেতু পরবর্তীকালে বিভিন্ন শহরের নৌকা বা বার্জ মালিকদের সমিতিগুলি এ কর আদায়ের ভার নিয়ে নদীপথ ও পোতাশ্রয়গুলি নৌ চলাচলের উপযোগী করে তুলত।

সাধারণত সমুদ্র পথে জাহাজগুলি উপকূলকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে রেখে চলাচল করত। বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেয়ার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কেউ গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার ঝুঁকি নিত না। কেননা, তাতে দিকভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে কম্পাস প্রচলিত হওয়ার পরই কেবলমাত্র গভীর সমুদ্রে জাহাজ চলাচল শুরু হয়।

সমুদ্রে প্রথম প্রথম হাল্কা ওজনের জাহাজ চলাচল করত। একাদশ শতাব্দীতে বিজয়ী উইলিয়াম ৩০ টন মাল বহনকারী জাহাজ নিয়ে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান। তৃতীয় এডোয়ার্ডের সময় অধিকাংশ ব্রিটিশ জাহাজ ২০০ টন মাল বহন করতে পারত। সবচেয়ে বড় জাহাজের মাল বহন ক্ষমতা ছিল ৩০০ টন। উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগরের পোতাশ্রয়গুলি অগভীর থাকার ফলে সেখানকার তুলনায় ভূমধ্যসাগরে চলাচলকারী জাহাজগুলি ছিল আকারে বড়। ক্রুসেডের সময় কোনো কোনো ভেনিসীয় জাহাজ খোলের মধ্যে ৫০০ টন ওজনের মাল বহন ছাড়াও পাটাতনের উপরে অতিরিক্ত ওজনের মাল বহন করত।

মধ্যযুগের জাহাজগুলি দাঁড়ের সাহায্যে চলত। বাতাস অনুকূল থাকলে পাল তুলে দেয়া হত। কোন কোন জাহাজে প্রায় দুশ জন দাঁড়ী থাকত। এ সমস্ত দাঁড়ীরা অধিকাংশই ছিল ক্রীতদাস। মধ্যযুগে ক্রীতদাসপ্রথা লুপ্ত হয়ে গেলেও জাহাজে দাঁড় টানার কাজে ক্রীতদাস নিয়োগ করা হত। তাদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হত; তাদের শিকল দিয়ে তক্তার সাথে বেঁধে রাখা হত। ভূমধ্যসাগরের জাহাজগুলিতে বণিকরা অনেক সময় নিজেরাই দাঁড় টেনে জাহাজ চালিয়ে নিত।

জাহাজে মাল পূর্ণ করার জন্য ভেনিসের বণিকরা বিশেষ কৌশল উদ্ভাবন করেছিল। খালগুলির দুই তীরে বিভিন্ন ধরনের মালের গুদাম সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত ছিল। যে জাহাজটি বাণিজ্যে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হত তাকে টেনে নিয়ে এক একটা গুদামের সামনে উপস্থিত করা হত। গুদাম থেকে সরাসরি সে জাহাজে মাল তোলা হত। জাহাজটি যখন গুদামের সারির শেষপ্রান্তে পৌঁছাত ততক্ষণে সেটি পুরোপুরি মালে ভরে যেত। এ পদ্ধতিতে অল্প সময়ে সুশৃঙ্খলভাবে জাহাজে মাল তোলা সম্ভব হত।

সমুদ্রপথে জাহাজে মাল পরিবহনে ঝুঁকিও কম ছিল না। জলদস্যুদের দ্বারা জাহাজগুলি প্রায়ই আক্রান্ত হত। সে জন্য জাহাজগুলি একসাথে সারিবদ্ধভাবে যাত্রা করত। সাথে থাকত অস্ত্রবাহী জাহাজ। নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তারা এ-ভাবেই গড়ে তুলত। সমুদ্রের আবহাওয়া জাহাজ চলাচলের অনুকূল থাকলেই কেবল জাহাজ চালানো হত। মজার ব্যাপার হল, যে-সমস্ত বন্দরনগরী নিজেদের জাহাজগুলিকে জলদস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে সদাসর্বদা সতর্ক থাকত

www.pathagar.com

তারাই আবার শত্রুদেশগুলির জাহাজের উপরে সুযোগ পেলেই আক্রমণ করত। কিন্তু এর ফলে কারও কোনো উপকার হত না। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথে এ উপলব্ধি জন্মালো যে, জলদস্যুদের দমন করার জন্য সর্বাংশে চেষ্টা করা প্রয়োজন —অন্তত নিজ নিজ সমুদ্র এলাকায়। অতঃপর ভেনিস নগর আড্রিয়াটিক সাগরের উপর তার দাবি স্থাপন করল এবং সেখানকার জলদস্যুদের সফলতার সাথে নির্মূল করল। জার্মানির হেনসিয়াটিক লিগ উত্তরসাগর ও বাল্টিক সাগরকে জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করল।

সমুদ্রে জলদস্যুদের অত্যাচার কমলেও জাহাজডুবির ভয় থেকেই গেল। বিশেষত জাহাজডুবি সংক্রান্ত আইন ছিল অদ্ভুত। কোনো জাহাজ ভেঙে গেলে বা ডুবে গেলে অথবা কোন জাহাজ পথিমধ্যে অচল হয়ে গেলে সে জাহাজের সমস্ত মাল ঐ এলাকার উপকূলস্থ মালিকের প্রাপ্য বলে গণ্য হত। জমিদারের লোকজনরা ইচ্ছা করেই এমনভাবে বাতিঘরগুলিকে স্থাপন করত যে নাবিকরা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে জাহাজডুবির কবলে পড়ত। অবশ্য পরবর্তীকালে এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে জাহাজ মালিকরা প্রতিবাদ জানায় এবং হেনসিয়াটিক লিগ এ রীতি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় যে, ডুবে যাওয়া জাহাজের মাল তার মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে।

সমুদ্রপথে যেহেতু কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না তাই সামুদ্রিক জাহাজগুলি বেশি বেশি করে মাল বহন করত। দিন দিন সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। পরবর্তীকালে জাহাজে ঘোড়াও পরিবহন করা হত। ঘোড়াগুলিকে জাহাজের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হত। সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটা সত্ত্বেও এটা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং সেই সাথে ব্যয়সাপেক্ষ। ফলে দূর দূরান্ত থেকে কোনো দ্রব্য এসে যখন ইউরোপের বন্দরে ভিড়ত তখন স্বভাবতই সেটা হয়ে উঠত অত্যন্ত দামি।

মধ্যযুগের বিভিন্ন শহর বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। হেনসিয়াটিক লীগের অন্তর্ভুক্ত শহরগুলি রাশিয়া থেকে আনত চামড়া, শস্য, ফার, মোম ও চর্বির তৈরি মোমবাতি; নরওয়ে ও সুইডেন থেকে নিয়ে আসত লোহা, তামা, লবণযুক্ত মাছ ও মাংস; ডেনমার্ক থেকে অশ্ব ও গবাদিপশু এবং বাল্টিকের উপকূল অঞ্চল থেকে হেরিং মাছ। এর পরিবর্তে লীগ বিক্রয় করত শস্য, মদ, বিয়ার, লবণ, মশলা, বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট ধাতব দ্রব্য। ফ্ল্যান্ডার্স-এর শহরগুলির অবস্থান ছিল হেনসিয়াটিক লীগ ও দক্ষিণ ইউরোপের শহরগুলির মধ্যস্থলে। উভয়ের সাথে তাদের বাণিজ্য চলত। তাদের নিজস্ব দক্ষতা ছিল উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্র উৎপাদনে। ইতালির শহরগুলি ব্যবসা করত প্রাচ্যদেশীয় সামগ্রী নিয়ে। আরব বণিকদের কাছ থেকে তারা কিনত প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে আনা বিভিন্ন ধরনের মশলা; যেমন, গোলমরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, আদা ইত্যাদি। এছাড়া তারা কিনত অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী, যথা, হাতির দাঁতের নির্মিত দ্রব্যাদি, বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, মুক্তা, রঙ, রেশম, সার্টিন ও মসলিন বস্ত্র, সুগন্ধি, কাচ ও চীনামাটির দ্রব্যাদি। ইউরোপের ধনীদের গৃহে বিলাস সামগ্রী তারাই পৌঁছে দিত। এছাড়া ভেনিসের নিজস্ব কাচশিল্প, মিলানের তৈরি মেয়েদের টুপি ও ঘোড়ার জিন এবং ফ্লোরেন্সের পশমীবস্ত্র অত্যন্ত মহার্ঘ্য পণ্য রূপে বিক্রীত হত।

হেনসিয়াটিক লিগ

মধ্যযুগের বণিকরা বিদেশী শহরগুলিতে নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একতাবদ্ধ হয়ে সমিতি গঠন করত। একইভাবে কয়েকটি শহর দলবদ্ধভাবে সমিতি গঠন করে বিদেশী শহরে নিজেদের বণিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হত। এমনিভাবে ত্রয়োদশ

www.pathagar.com

শতাব্দীতে জার্মানির উত্তরের শহরগুলি কলোন, লিউবেক, ডানজিগ ও হামবুর্গকে সাথে নিয়ে 'হেনসিয়াটিক লিগ' (Hanseatic League) নামে একটি সংঘ গঠন করে। ক্রমশ লিগের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলে অন্যান্য নদীতীরস্থ শহরগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

হেনসিয়াটিক লীগ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তার স্থায়ী বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। লন্ডন ব্রুজেস এবং রাশিয়ার নভ্গরোদে এ ভাবে স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়।

জার্মান সরকার যেহেতু ছিল দুর্বল, হেনসিয়াটিক লিগ তার নিজস্ব নৌবাহিনী গড়ে তুলে নিজেদের বাণিজ্যকে জলদস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। এই বাণিজ্য স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে লিগ ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়। লিগের নিজস্ব প্রতিনিধি সভা ডায়েট সদস্য শহরগুলির বাণিজ্যিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করত। হেনসিয়াটিক লিগের সম্পদের উৎস ছিল বাল্টিক সাগরের মাছের একচেটিয়া বাণিজ্য এবং রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ড্স্-এর সাথে বাণিজ্য। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই লিগ ছিল বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিপতি এবং উত্তর ইউরোপের দেশগুলির একমাত্র জোগানদার।

বাণিজ্য মেলা

মধ্যযুগের সবচেয়ে বেশি মাল ক্রয়-বিক্রয় হত মেলাতে। বাৎসরিক মেলাগুলি ছিল মাল কেনা-বেচার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। প্রায় প্রত্যেক বড় শহরেই মেলা বসত, তবে ফ্রান্সের শ্যাম্পেনের মেলার খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। সেখানকার স্থানীয় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মেলার আয়োজন করা হত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকরা তাদের মাল নিয়ে এই মেলায় সমবেত হত ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। এই মেলার গুরুত্ব ছিল এত বেশি যে, কোনো বিদেশী বণিক তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে বা চুক্তি ভঙ্গ করলে তাকে দলবল সমেত মেলা থেকে বহিষ্কার করা হত।

শ্যাম্পেন ছাড়াও জার্মানির লাইপজিগ ও ফ্রাঙ্কফুর্টে, ইতালির ভেনিস ও জেনোয়াতে, নেদারল্যান্ডস-এর ইপ্রেস ও লিলিতে, স্পেনের সেভিলে এবং ইংল্যান্ডের সেন্ট আইভিসিতে মেলা অনুষ্ঠিত হত। মেলাগুলি শুধুমাত্র মাল বিক্রয়ের কেন্দ্রই ছিল না। মেলায় বিভিন্ন জাতির লোকজনের সমাবেশ পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানে সহায়তা করত। সমগ্র ইউরোপের বণিকদের মিলনকেন্দ্র এই মেলাগুলি শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তারের কাজেও সহায়তা করত। মেলাগুলি মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি আবার চালু করেছে। মেলাগুলির মধ্য দিয়েই স্বনির্ভর ম্যানরগুলি ক্রমশ তাদের বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি কাটিয়ে শহরগুলির সাথে একাত্ম হয়েছে।

শ্যাম্পেন শহরের মেলা প্রায় সমগ্র শহর জুড়ে অনুষ্ঠিত হত। প্রকাণ্ড হলঘরগুলি মেলার জন্যই বিশেষভাবে নির্মিত হত। এ ছাড়া তৈরি হত অনেক ছোটবড় মালগুদাম। শ্যাম্পেন ছাড়া অন্যান্য শহরগুলিতে চক্রাকারে একের পর এক যে মেলা বসত সেগুলি সারা বছর ধরেই ইউরোপের বণিকদের ব্যতিব্যস্ত রাখত।

মেলা শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই বণিকরা তাদের মালসামগ্রী নিয়ে হাজির হত এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করত। প্রতিদিন ঘণ্টা বাজিয়ে মেলার আরম্ভ ও সমাপ্তি ঘোষণা করা হত; মধ্যবর্তী সময়ে মাল বেচাকেনা চলত। মেলার প্রথম দশদিন শুধুমাত্র পোশাক ও পশমীবস্ত্রের বিকিকিনি হত। পরবর্তী দশদিনে কেনাবেচা হত চামড়া এবং চামড়ার তৈরি দ্রব্যের। মাসের শেষ দশদিনে মাল ক্রয়-বিক্রয় হত শুধুমাত্র ওজন ও পরিমাপ করে। মেলা শেষ হলেও বণিকদের পাঁচ

www.pathagar.com

দিন অতিরিক্ত সময় দেয়া হত তাদের অবশিষ্ট মালের তালিকা তৈরি করার জন্য এবং মেলার পৃষ্ঠপোষক জমিদারের প্রাপ্য খাজনা মেটানোর জন্য। মেলায় যে সকল দ্রব্য কেনা-বেচা হত তা থেকে মধ্যযুগের ইউরোপের দ্রব্যসামগ্রীর একটা পরিচয় পাওয়া যায় : প্রাচ্য থেকে আনা লিনেন, রাশিয়া ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি থেকে আনা ফার, জার্মানির লোহা ও চামড়ার তৈরি দ্রব্য এবং ফ্রান্স ও স্পেনের তৈরি বিভিন্ন ধরনের মদ।

মধ্যযুগের মেলাগুলিতে বণিকরা ছাড়াও আর এক ধরনের লোকের বিশেষ আধিপত্য ছিল! এরা হল পোদ্দার বা মুদ্রা বিনিময়কারী। এরা ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের মুদ্রা বিনিময় করত। মেলায় এরা একটা টেবিল ও বাক্স নিয়ে বসত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকরা তাদের নিজস্ব মুদ্রা নিয়ে এসে এদের কাছ থেকে প্রয়োজনমতো মুদ্রা বিনিময় করে নিত। অনেকে আবার এ মুদ্রা বিনিময়কারীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব টাকা গচ্ছিত রাখত। তাছাড়াও, অনেকে এদের কাছে মূল্যবান মাল বন্ধক রেখে প্রয়োজন মতো টাকা ধার নিত।

ইউরোপের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সূত্রপাত এই মেলাগুলিতেই প্রথমে ঘটে। ইতালিতে প্রথম হুন্ডি (Bill of Exchange) প্রথার প্রচলন ঘটে মূল্যবান ধাতু পরিবহনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য। পরে পোপের দালালরা সারা ইউরোপে এ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায়। হুন্ডি ব্যবস্থাটি মোটামুটি এ রকম : যদি মিলান শহরের 'ক'নামক ব্যক্তিটি ফ্লোরেন্সের 'খ' নামক ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিতে চায় এবং ফ্লোরেন্সের 'গ' ব্যক্তিটি যদি মিলানের 'ঘ' ব্যক্তিকে একই পরিমাণ অর্থ দিতে চায় তা হলে এই দুই শহরের মধ্যে টাকা পাঠানোর কোনো প্রয়োজন হয় না। মিলান শহরের 'ক' একই শহরের 'ঘ'কে টাকা দেবে এবং ফ্লোরেন্সের 'গ' ঐ শহরেরই 'খ' কে টাকা দেবে। তাহলেই পুরো ব্যাপারটির ঠিকমতো সমাধান হবে। ক্রমে নগদ টাকার পরিবর্তে চেকে টাকা প্রদানেরও প্রচলন ঘটে। আবার, যাদের কাছে বণিকরা টাকা গচ্ছিত রাখত তারা অনেক সময় এ টাকা অন্যকে আবার ধারও দিত! অবশ্য এর বিনিময়ে তারা সুদ হিসাবে কিছু লাভ করত। এ ভাবে ক্রমশ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিস্তৃতি ঘটে। ক্রমে ক্রমে ইনসিওরেন্স ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। মালগুলির নিরাপত্তার জন্যই ইনসিওর বা বীমা করা হত। এভাবে বণিকের মালের হেফাজতের দায়িত্ব তার নিজের কাঁধ থেকে অন্যদের উপরেও অর্পিত হয়।

এবারে সুদ প্রথা সম্বন্ধে কিছু কথা বলা আবশ্যক। মধ্যযুগে একমাত্র ইহুদিরাই টাকা ধার দিয়ে তার বিনিময়ে সুদ গ্রহণ করত। ইউরোপের খ্রিস্টান সম্প্রদায় সুদ গ্রহণ করাকে অধার্মিক কাজ বলে বিবেচনা করত। ইউরোপের গির্জা সুদ গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ইহুদিদের উপর বাড়তি কর আরোপ করা হত।

কালক্রমে ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তৃতির ফলে খ্রিস্টানরাও ধর্মের বাধা প্রত্যক্ষভাবে অমান্য না করেও পরোক্ষভাবে সুদ গ্রহণের অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করে। এক হাজার টাকা ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজন ন'শ টাকা গ্রহণ করত এবং এভাবে সে আসল ও সুদ উভয়ই পরিশোধ করত। কখনও নির্দিষ্ট তারিখে ইচ্ছা করে ঋণ পরিশোধ না করে ঋণগ্রহীতা জরিমানার ছদ্ম আবরণে সুদ প্রদান করত। এভাবে পরবর্তীকালে ইতালির খ্রিস্টানদের মধ্য থেকেই ব্যাঙ্কারদের আবির্ভাব ঘটে। ফ্লোরেন্সের মেডিসি পরিবার বিশিষ্ট ব্যাঙ্কাররূপে আবির্ভূত হয়। আধুনিক বন্ধকি দোকানগুলিতে প্রতীক চিহ্ন হিসেবে যে তিনটি সোনার গোলক রাখা হয় সেগুলি ফ্লোরেন্সের মিডিসি পরিবারের অনুকরণে করা হয়ে থাকে। এই পরিবারটি ফ্লোরেন্সের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কেবলমাত্র ব্যাঙ্কার হিসেবেই পরিচিত ছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইহুদিদের

www.pathagar.com

ব্যাপকভাবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেন থেকে বিতাড়নের ফলে ইউরোপের মহাজন শ্রেণীর পদগুলি ইতালীয়দের দখলে আসে। কালক্রমে রোমের পোপরাও নিজেদের রাজস্ব আদায়ের জন্য ইতালির ব্যাঙ্কারদেরই নিয়োগ করেন। মধ্যযুগে যদিও জেনোয়ার সেন্ট জর্জ ব্যাঙ্কই ছিল একমাত্র বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য শহরেও কিছু কিছু ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছিল, তথাপি ফ্লোরেন্সের ব্যাঙ্ক পরিবারদেরই পোপরা সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

মধ্যযুগে সুদের হার ছিল অত্যন্ত চড়া। বাণিজ্য ও শিল্প বিনিয়োগের জন্য সুদের হার ছিল শতকরা পনেরো ভাগ অথবা তার চেয়ে বেশি। ব্যক্তিগত কারণে নেয়া ঋণের জন্য সুদের হার ছিল অত্যন্ত বেশি; অনেকক্ষেত্রে শতকরা আশি এমন কি একশভাগ ছিল সুদের হার। শেষ পর্যন্ত চার্চকে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এ ব্যাপারে গ্রহণ করতে হয়। যথা, ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসী দল ব্যাঙ্কগুলির পাশাপাশি বন্ধকি দোকান খুলেছিল। সেখান থেকে দরিদ্র লোকজন জিনিসপত্র বাঁধা রেখে খুব কম হারের সুদে ব্যক্তিগত কারণে টাকা ধার করতে পারত।

বাণিজ্যপথ

মধ্যযুগের ইউরোপের হস্তশিল্প ও কারিগরি উৎপাদনের বিকাশ এবং ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইউরোপের নানা স্থানে নগর গড়ে উঠেছিল, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। আবার ব্যবসার প্রসার এবং নগরসমূহের বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটার সাথে সাথে বাণিজ্য ও নগর একে অপরকে প্রভাবিত করতে থাকে। এর ফলে বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সাথে সাথে নতুন বাণিজ্য-পথের বিস্তার ঘটে।

ইতালির ভেনিস নগরীর বণিকরা সপ্তম শতাব্দী থেকেই পশ্চিম এশিয়ার সাথে বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের নৌশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কনস্টান্টিনোপল ও এশিয়া মাইনরের সাথে ইতালির বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ভেনিস নগরীর বিকাশের ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। পঞ্চম শতকে মধ্য ইউরোপের একদল লোক হুনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অড্রিয়াটিক সাগরের উত্তর উপকূলে কাদা-মাটিতে ঘেরা কতগুলি দ্বীপে আশ্রয় নেয়। ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১১৭টি দ্বীপ নিয়ে ভেনিস শহরটি গড়ে ওঠে। প্রায় ৪০০ পুল দিয়ে এ দ্বীপগুলিকে যুক্ত করা হয়েছিল। ভেনিসের লোকেরা অবশ্য 'গন্ডোলা' নামক নৌকা দিয়েই যাতায়াত করে। প্রথমে ভেনিসের অধিবাসীরা লবণ তৈরির ব্যবসা শুরু করেছিল। শত শত বছর ধরে ইউরোপের লবণের ব্যবসার উপর ভেনিসের ছিল একচেটিয়া অধিকার। ক্রমশ ভেনিস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে; বাণিজ্যের মাধ্যমে ভেনিস প্রভূত ধন ও ক্ষমতা অর্জন করে। এগার শতকের মধ্যেই ভেনিস একটি বিশাল বাণিজ্যিক নৌ-বহরের অধিকারী হয়েছিল। ১০০২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যপথটি মুসলমানদের হাত থেকে ভেনিসের কর্তৃত্বে চলে যায়।

ইতালিতে যে কেবলমাত্র ভেনিস নগরীর উদয় ঘটেছিল তা নয়। তার পাশাপাশি মধ্যযুগে মিলান, পিসা, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি ইতালীয় নগরও বাণিজ্যের মাধ্যমে বিকাশ ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ভেনিসের সাথে এসব নগরীর বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতাও চলত। ইতালির এ সকল নগরীর বণিকরা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে এবং মুসলমানদের সাথে বাণিজ্য করত। ইরাকের বাগদাদ, সিরিয়ার দামেস্ক, মিশরের কায়রো প্রভৃতি বিখ্যাত মুসলিম নগর ও বন্দরগুলির সাথে ইতালির বণিকদের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্রুসেডের পূর্বপর্যন্ত ভেনিস, জেনোয়া

www.pathagar.com

প্রভৃতি নগরীর বণিকরা বাইজেন্টাইন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করত। ক্রুসেডের সময়ে ইতালির বণিকদের কার্যকলাপ আরও বৃদ্ধি পায়।

ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ

মধ্যযুগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে প্রধানত ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যকার বাণিজ্যকে বোঝানো হয়। ইউরোপের বা ইতালির বণিকরা সরাসরি পূর্ব-এশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে প্রয়োজনীয় বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে আসত না। চীন, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে গোলমরিচ, আদা প্রভৃতি মশলাপাতি এবং নানাপ্রকার মূল্যবান বিলাসদ্রব্য প্রধানত তিনটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ দিয়ে এসে জড়ো হত কনস্টান্টিনোপল, দামেস্ক, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি নগর ও বন্দরে। এ বাণিজ্যপথগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন বাইজেন্টাইন সম্রাট ও আরব বণিকরা। আরব বণিকদের কাছ থেকে এশিয়ার মশলাপাতি ইতালির বণিকরা কিনত দশগুণ দাম দিয়ে। ইতালীয় বণিকরা তারপর প্রাচ্যের পণ্যদ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন শহরে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করত। তাই দেখা যায় যে, এশিয়া থেকে ইউরোপে যে পণ্যদ্রব্য আসত সে বাণিজ্য পথগুলির উপর একচেটিয়া অধিকার ছিল আরব বণিক ও বাইজেন্টাইন সম্রাটের আর ইউরোপের অভ্যন্তরীণ বাজারে যে পথ ধরে এশিয়া ও প্রাচ্যের পণ্যসম্ভার যেত সে পথের উপর একচেটিয়া অধিকার ছিল ইতালির বণিকদের।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ

পনের শতক পর্যন্ত প্রধানত তিনটি বাণিজ্যপথ দিয়ে প্রাচ্য তথা এশিয়ার পণ্যদ্রব্য ইউরোপে গিয়ে পৌঁছাত। এর মধ্যে সবচেয়ে দক্ষিণের পথটি ছিল প্রধানত জলপথ। চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জলপথে এবং মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্থলপথে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য প্রথমে এসে জড়ো হত ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল বা মালাবার উপকূলে। অতঃপর মালাবার উপকূলের বাণিজ্য বন্দরসমূহ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে বাণিজ্য জাহাজসমূহ ভারত মহাসাগর দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হত এবং লোহিত সাগরের পশ্চিম প্রান্তে এসে থামত। সেখান থেকে উটের ক্যারাভানে করে এসব পণ্য নিয়ে যাওয়া হত কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায়।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথটি ছিল কিছুটা উত্তরে অবস্থিত। এটিও শুরু হয়েছিল মালাবার উপকূলে। সেখান থেকে জাহাজে করে পণ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়া হত আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের ভিতর দিয়ে। পারস্য উপসাগরের উত্তর প্রান্ত থেকে এ সকল বাণিজ্যসম্ভার উটের ক্যারাভানে বা কাফেলায় নিয়ে যাওয়া হত কৃষ্ণসাগরের তীরে বা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে।

তৃতীয় পথটি ছিল সবচেয়ে উত্তরের এবং এটি ছিল মূলত স্থলপথ। এ পথটি চীন থেকে শুরু করে গোবি মরুভূমি পার হয়ে সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি মুসলিম নগরী পার হয়ে কাস্পিয়ান সাগরের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। এখান থেকে একটি শাখা কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিয়ে অগ্রসর হয়ে সিরিয়া এ এশিয়ামাইনর হয়ে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে গিয়ে পৌঁছায়। তার থেকে আরেকটি শাখা বেরিয়ে আবার উত্তরে গিয়ে রাশিয়াতে পৌঁছেছিল। দেখা যাচ্ছে, এশিয়া থেকে ইউরোপের দিকে যে বাণিজ্যপথগুলি গিয়েছিল সেগুলি শেষ হত ভূমধ্যসাগরের ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলে। সেখান থেকে ইতালীয় বণিকরা পণ্য নিয়ে গিয়ে ইউরোপের অভ্যন্তরে পাঠাতো।

www.pathagar.com

ইউরোপের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথ

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের বন্দরসমূহ এবং কনস্টান্টিনোপল থেকে ইতালির বণিকরা জাহাজে করে পণ্য নিয়ে আসত ইতালির বিভিন্ন বন্দরে ও নগরে। জার্মানির বণিকরা আল্পস পর্বতের ব্রেনার গিরিপথ দিয়ে এ সকল পণ্য জার্মানির নুরেমবার্গ, আউসবুর্গ, উল্‌ম, রিজেন্সবার্গ প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যেত। আবার ইতালির পো নদীর অববাহিকা দিয়ে এবং সেন্ট গোটহার্ড গিরিপথ দিয়ে বাণিজ্য সম্ভার যেত রাইন নদীর তীরবর্তী রাইনল্যান্ডে এবং বেলজিয়াম, হল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে।

ভেনিসের বণিকরা অবশ্য প্রধানত জলপথে বাণিজ্য করত। কনস্টান্টিনোপল ও অন্যান্য বন্দর থেকে কেনা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এবং প্রাচ্যের পণ্যদ্রব্য নিয়ে ভেনিসের বাণিজ্যবহর জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে চলে যেত বেলজিয়ামের ব্রুজেস বন্দরে। এ বন্দরটি ছিল উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র। ভেনিসের বণিকরা স্পেন, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডেও যেত। জলপথে যেত বলে ভেনিসের বণিকদের মাল পরিবহনে খরচ হত কম। এরা জাহাজে করে নিয়ে যেত প্রাচ্যের মশলাপাতি ও বিলাসদ্রব্য এবং ফেরার পথে পশ্চিম ইউরোপ থেকে নিয়ে আসত পশম, চামড়া প্রভৃতি। ইতালিতে এনে এ সকল কাঁচামাল দিয়ে তারা নানাপ্রকার মূল্যবান ও শৌখিন পণ্য তৈরি করত এবং সেগুলি প্রাচ্যে রপ্তানি করত।

ক্রমে বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরের বাণিজ্যপথও ভূমধ্যসাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। নর্মানদের বাণিজ্য সাম্রাজ্য দশম ও একাদশ শতকেই রাশিয়ার কিয়েভ নভ্‌গরোদ থেকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বার শতকে বিশাল বাণিজ্য অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে ছিল বর্তমান ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের অন্তর্গত ফ্ল্যান্ডার্স অঞ্চল। এ অঞ্চলের সাথে সমুদ্রপথে এবং নদীপথে সমগ্র উত্তর ইউরোপ, মধ্য ইউরোপ ও ইতালির যোগাযোগ ছিল। নর্মানরা নদীপথে বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত একটি বাণিজ্যপথ প্রতিষ্ঠা করেছিল; এ পথে তারা প্রাচ্যের পণ্য নিয়ে যেত। এটা তাই আশ্চর্য নয় যে, বার-তের শতকে ফ্রান্স-বেলজিয়ামের অন্তর্গত ফ্ল্যান্ডার্স অঞ্চল এবং ইতালির অন্তর্গত লম্বার্ডি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি নগর গড়ে উঠেছিল। লম্বার্ডি অঞ্চল আল্পস্ পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত হলেও, সিম্‌প্লন, সেন্ট গোটহার্ড, বার্নিনা এবং স্প্লুজেন গিরিপথ এ অঞ্চলকে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের সাথে যুক্ত করেছে। তাই ইতালির সাথে বাকি ইউরোপের বাণিজ্য সংযোগ লম্বার্ডির উপর দিয়েই বিস্তৃত হয়েছিল। প্রাচ্য থেকে যে সব পণ্যসম্ভার ইতালিতে এসে জড়ো হত সেগুলো লম্বার্ডি অতিক্রম করে আল্পস্-এর বিভিন্ন গিরিপথের মধ্য দিয়ে চলে যেত ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের রোন নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, মধ্য ইউরোপের রাইন অববাহিকায় এবং মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দানিয়ুব অববাহিকায়। এ সময়ে নতুন করে রোমান আমলের প্রতিষ্ঠিত রাস্তা ও পথঘাটগুলি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। তের-চৌদ্দ শতকে তাই মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের স্থলপথে বণিকদের কাফেলা, নদীপথে বার্জ-এর বহর, ভূমধ্যসাগর, বাল্টিক সাগর ও উত্তরসাগরে এবং ইংলিশ চ্যানেলে বাণিজ্য জাহাজের চলাচলের পথের উপর গড়ে উঠেছিল অজস্র নগর।

তের শতকে আন্তর্জাতিক ও ইউরোপের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারা কনস্টান্টিনোপল জয় করে সেখানে গ্রিক গির্জার পরিবর্তে ল্যাটিন বা রোমান গির্জা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এর পরে ফ্রান্সের রাজাও ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে মার্সেই এবং বার্সেলোনা নগর দুটো এশিয়া মাইনরের সাথে বাণিজ্য শুরু করে। জার্মানির অন্তর্গত প্রুশিয়া অঞ্চলের টিউটনিক নাইটরা

www.pathagar.com

পূর্বদিকে বাল্টিক সাগরের তীরে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বিস্তৃত করে এবং লিবাউ, মেমেল ও রেভাল নামক বন্দরনগরী স্থাপন করে। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলরা রাশিয়ার কিয়েভ নগরকে ধ্বংস করলে কৃষ্ণসাগর ও বাল্টিক সাগরের মধ্যবর্তী বাণিজ্যপথটি ভেঙে যায়। এ সুযোগে রাশিয়ার নভ্গরোদ নগরটি এস্তোনিয়া ও লাটভিয়ার বিভিন্ন বন্দরের সাথে এবং তাদের মাধ্যমে উত্তর জার্মানির সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলরা বাগদাদ ধ্বংস করার পর এশিয়ার বাণিজ্যপথটি ভূমধ্যসাগরে আসার পরিবর্তে কৃষ্ণসাগরের তীরস্থ ট্রেবিজন্ড-এ এসে শেষ হয়। সেখান থেকে কৃষ্ণসাগরের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যসম্ভার কনস্টান্টিনোপল-এ ও ভূমধ্যসাগরের দিকে প্রবাহিত হত। ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে সিসিলি অধিকার করার পর আরাগনের নগরগুলি ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে।

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কিরা বাইজেন্টাইন সম্রাটকে পরাজিত করে কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে। এশিয়ার যে সকল বাণিজ্যপথের উপর এতকাল বাইজেন্টাইন সম্রাট এবং আরব বণিকদের অধিকার বজায় ছিল, এখন অটোমান তুর্কিরা সে সব পথের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ অবস্থায়, কনস্টান্টিনোপল-এর পতনের পরে প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের বাণিজ্যপথগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ইউরোপীয়রা তখন ভারতবর্ষ ও চীনে যাওয়ার জন্য নতুন জলপথ খুঁজতে থাকে। এ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শেষপর্যন্ত ইতালীয় নাবিক কলম্বাস আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকা যাওয়ার জলপথ আবিষ্কার করেন এবং পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কোডাগামা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে যাওয়ার জলপথ আবিষ্কার করেন। নতুন জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুরাতন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথগুলি অবলুপ্ত হয়।

বাইজেন্টাইন সভ্যতা

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন প্রাচীন গ্রিক উপনিবেশ বাইজেন্টিয়ামে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাটের নামের অনুকরণে নতুন রাজধানীর নামকরণ করা হল কনস্টান্টিনোপল। কৃষ্ণসাগর ও মারমারা সাগরের মধ্যে সংযোজক প্রণালী বসফরাসের পশ্চিম তীরে অর্থাৎ ইউরোপীয় তীরে অবস্থিত কনস্টান্টিনোপল বর্তমানে ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে এই কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য যখন অভ্যন্তরীণ গোলযোগে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বর্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত, তখন কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করেই টিকে ছিল ইউরোপীয় সভ্যতা।

রোমান সম্রাটদের বিলাসিতা,অত্যাচার ও নিপীড়ন, অর্থনৈতিক ভাঙ্গন, দাসবিদ্রোহ ও সম্রাটের করভারে জর্জরিত কৃষককুলের জমি থেকে উৎখাত হয়ে পলায়ন প্রভৃতির ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে উপনীত, ঠিক তখনই দলে দলে বিভিন্ন বর্বরজাতি একে একে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থান দখল করতে শুরু করল। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। অন্যদিকে বহুদিন পর্যন্ত বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে

www.pathagar.com

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য টিকে রইল আশ্চর্যরূপে। কিন্তু পশ্চিম ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য চিরকালের জন্য বিভক্ত হয়ে গেল। মূল কথা হল, পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটল। আর পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকেও তখন আর রোমান সাম্রাজ্য বলা চলে না, কারণ সেখানে রোমান সভ্যতা অপেক্ষা গ্রিক সভ্যতারই প্রাধান্য বেশি। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমগ্র এশিয়ামাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর। এ দেশগুলি এক সময়ে ছিল গ্রিক উপনিবেশ। কাজেই নামে রোমান সাম্রাজ্য হলেও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ছিল প্রকৃতপক্ষে গ্রিক সভ্যতারই ধারক ও বাহক। ধর্মের দিক দিয়েও এটা ছিল গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের অন্তর্ভুক্ত। আর এর অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির মধ্যে গ্রিক প্রভাব ছিল পরিস্ফুট। তবে একথা মনে করা ভুল যে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে গ্রিক সভ্যতার পুনরুত্থান ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে হেলেনীয় সভ্যতার পতনের পর কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করেই গ্রিক সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকু টিকে ছিল।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একটি বিরাট অংশ ছিল এশিয়ার অন্তর্গত। ফলে স্বভাবতই প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতার প্রভাব এখানে পড়েছিল। বাইজেন্টাইন অধিবাসীদের মধ্যে ছিল পারসিক, ইহুদি, সিরীয়, আর্মেনীয়, গ্রিক ও মিশরীয়। এ ছাড়াও স্লাভ ও মঙ্গোল জাতির একটি বড় অংশ এখানে বাস করত।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রথম দিকের ইতিহাস শুধুমাত্র বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। প্রায় দু'শ বছর ধরে বাইজেন্টাইন সম্রাটগণ সফলভাবে বৈদেশিক আক্রমণ ঠেকিয়ে এসেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল বাইজেন্টাইনের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন। কনস্টান্টিনোপলের ভৌগোলিক অবস্থান একে করে তুলেছিল দুর্ভেদ্য। তিনদিকে সমুদ্র ও অন্যদিকে উঁচু ও সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে এই নগরী সর্বদা নিজকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এসেছে। এ ছাড়া রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলেও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের কোন ক্ষতি হয়নি। পূর্বের মতোই অপ্রতিহত গতিতে কনস্টান্টিনোপল ও অন্যান্য বন্দরগুলি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে গেছে। উপরন্তু, এই বাণিজ্যের ফলেই রাজকোষ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল বিপুল অর্থে, যার দ্বারা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল বিরাট সামরিক বাহিনী। এই সামরিক সাফল্যই সম্রাট জাস্টিনিয়ানকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য জয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

জাস্টিনিয়ানের প্রধান পরিকল্পনা ছিল বর্বরদের দ্বারা অধিকৃত পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করা। তাঁর প্রথম অভিযান প্রেরিত হয়েছিল উত্তর আফ্রিকার ভ্যান্ডাল রাজ্যের বিরুদ্ধে। ভ্যান্ডালরা উত্তর আফ্রিকার জলবায়ুর প্রভাবে ও প্রাচীন পিউনিক জাতির সংস্পর্শে এসে অনেক আগেই তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছিল। তারা এর আগে সেখানে কোনোমতে একটি রাজ্য গড়ে তুলেছিল কিন্তু তাদের নিজস্ব কোন সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে নি। ভ্যান্ডাল রাজা জেলিমার-এর নৌবাহিনীর প্রধান অংশ ও সেনাবাহিনীর একটি অংশ ইতালির সার্ডিনিয়াতে (এটা ভ্যান্ডাল রাজ্যের অংশ ছিল) বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হয়েছিল। জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি বেলিসারিয়াস এই সুযোগে তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে কার্থেজ অভিমুখে রওনা হলেন। কার্থেজে পৌঁছানোর পর সেখানকার ক্যাথলিক ও রোমান জনগণ তাঁকে স্বাগত জানায়। ভ্যান্ডাল রাজা তাঁকে বিশেষ বাধা দিতে পারেন নি। বেলিসারিয়াস দুটি যুদ্ধে ভ্যান্ডাল রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও ধ্বংস করেন। সকল ভ্যান্ডাল নেতাদের নির্বাসিত করা হয়। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্য এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ক্রীতদাস বানানো হয়। রোমান ও ক্যাথলিকদের সেখানে পুনর্বাসিত করা

www.pathagar.com

হয়। এর পরে জাস্টিনিয়ানের দৃষ্টি ইতালির প্রতি নিবদ্ধ হল। সেখানকার অস্ট্রোগথ রাজার প্রতি জাস্টিনিয়ানের নির্দেশ প্রেরিত হল যে, অস্ট্রোগথদের বাইজেন্টাইন সম্রাটকে বাৎসরিক কর দিতে হবে, বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীর জন্য তিন হাজার গথ সৈন্য পাঠাতে হবে, ক্যাথলিক চার্চকে গথদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দিতে হবে, সিনেটের সকল সদস্যের নিযুক্তি দেবেন বাইজেন্টাইন সম্রাট এবং গথ রাজ্যকে বাইজেন্টাইন সম্রাটের আনুগত্য মেনে নিতে হবে।

নিরুপায় গথরাজা জাস্টিনিয়ানের সাথে যখন আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত তখন সেনানায়ক বেলিসারিয়াস গথ রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে নেপলস অধিকার করেন, পরে রোম শহরও অধিকার করে নেন। গথরা কুড়ি বছর ধরে বাইজেন্টাইন বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে অবশেষে নেপলস (৫৪৩ খৃঃ) ও রোম (৫৪৬ খৃঃ) পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু সর্বশেষে ট্যাজিনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হওয়ার পরে (৫৫২ খৃঃ) তাদের সকল শক্তির অবসান ঘটে।

জাস্টিনিয়ানের সর্বশেষ অভিযান ছিল স্পেনের ভিসিগথদের বিরুদ্ধে। ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে জাস্টিনিয়ান স্পেনের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ক্রমে ক্রমে সেভিল, মালাগা, কার্থাজেনা ও কর্ডোভা শহরগুলি অধিকার করে নেন।

পশ্চিমের অভিযানের সাফল্য জাস্টিনিয়ানের পূর্বদিকের রাজ্যগুলির জন্য প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে। জাস্টিনিয়ানের রাজ্যের পূর্বাংশে ছিল বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য। সাসানি রাজবংশের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট প্রথম খসরু (৫৩১–৫৭৯ খৃঃ) তখন পারস্য সম্রাট।

জাস্টিনিয়ান যখন পশ্চিম অভিযানে ব্যস্ত, তখন পারস্য সম্রাট একে একে জাস্টিনিয়ানের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দররা, সিরিয়া ও এন্টিওক দখল করে নেন। একই ভাবে জাস্টিনিয়ানের দুর্বলতার সুযোগে তাঁর বল্কান উপদ্বীপ এলাকায় অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে স্লাভ, বলগেরিয়ান ও অ্যাভারদের।

প্রকৃত পক্ষে জাস্টিনিয়ানের উচিত ছিল পশ্চিম অভিযানে নিয়োজিত না হয়ে তাঁর পূর্ব সাম্রাজ্য ও বল্কান উপদ্বীপ রক্ষা করা। তাঁর অধিকৃত পশ্চিমের রাজ্যগুলিও বেশিদিন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর ইতালি লম্বার্ডদের হাতে এবং উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন মুসলমানদের দখলে চলে যায়। উপরন্তু, বিপুল সামরিক ব্যয়ভার বহন করার জন্য তিনি প্রজাদের উপর যে বিপুল করের বোঝা চাপিয়ে দেন তার ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এতে উভয় সাম্রাজ্যই বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আরবদের আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে দেয়। অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের আক্রমণে একমাত্র এশিয়ামাইনর ছাড়া বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এশিয়াস্থ বাকি অংশটুকু হাতছাড়া হয়ে যায়। আরবদের শক্তিতে ভাঁটা পড়লে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য আবার তার শক্তি সঞ্চয় করে এবং সিরিয়া, ক্রিট, ইতালির উপকূলস্থ ও বল্কান উপদ্বীপের কিছু অংশ পুনরায় উদ্ধার করে নিতে সক্ষম হয়।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বৈভব

এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত কনস্টান্টিনোপল ছিল তৎকালীন পৃথিবীর সর্বপ্রধান বাণিজ্য বন্দর। সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে সম্রাট জাস্টিনিয়ান নতুন নতুন বাণিজ্যপথ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু পারস্যের উপর দিয়ে যাতে বাণিজ্যপথ তৈরি না হয়, জাস্টিনিয়ান সেদিকে বিশেষ নজর দেন। তার

www.pathagar.com

ফলে দূর প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কনস্টান্টিনোপলকেই উপযুক্ত স্থানরূপে নির্বাচন করা হয়। উত্তরে স্ক্যান্ডিনেভীয় অঞ্চল, পশ্চিমে ইংল্যান্ড ও স্পেন, পূর্বে চীন ও দক্ষিণে আরব উপদ্বীপ সকল দেশের সাথেই কনস্টান্টিনোপলের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। কনস্টান্টিনোপলের বণিকরা দক্ষিণ দিকে সিরিয়ার সমুদ্রোপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমে ক্রমে লোহিত সাগর ও মিশর অতিক্রম করে পূর্ব দিকে যাত্রা করত। আরেক দল স্থলপথে মেসোপটেমিয়ার উপর দিয়ে, তাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা অতিক্রম করে পারস্য উপসাগর পার হয়ে দূর প্রাচ্যে যাত্রা করত। অন্যদল আবার উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চল ছাড়িয়ে বাল্টিক সাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছাতো। আরেক দল পশ্চিমদিকে ফ্রান্সের মার্সেই, বোর্দো, অর্লি প্রভৃতি বন্দর ছাড়িয়ে আরও অভ্যন্তরে পশ্চিম ইউরোপের দিকে অগ্রসর হত। চতুর্দিকে এই বাণিজ্যপথগুলিকে প্রহরা দিত বাইজেন্টাইনের বিশাল রাজকীয় নৌবাহিনী, যার ফলে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য অপ্রতিহত গতিতে পৃথিবীব্যাপী তার বাণিজ্যাভিযান চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। বাইজেন্টাইনের এই নৌবাহিনীর প্রহরার ফলেই বহুদিন পর্যন্ত বাণিজ্যপথগুলি আরবদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এই বাণিজ্যপথগুলি দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে দ্রব্যসামগ্রী এসে জমা হত কনস্টান্টিনোপলের বন্দরে। চীন ও ভারত থেকে আসত রেশম, মূল্যবান পাথর, সুগন্ধিদ্রব্য, রঙ, মশলা, কারুকার্যখচিত বস্ত্রাদি ও ঔষধপত্র ; উত্তর ইউরোপ থেকে ফার, চামড়া, অশ্ব, শন, মোম ইত্যাদি; আরব দেশগুলি ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসত মূল্যবান কাঠ, কার্পেট কারুকার্যখচিত বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, অলঙ্কার ও ধাতব দ্রব্য; মিশর থেকে আসত শস্যাদি। এভাবে বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট পণ্যে কনস্টান্টিনোপলের বন্দর ভরে যেত। কিছু পরিমাণ আমদানি করা দ্রব্য, বিশেষত বিলাস দ্রব্য আবার পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে রপ্তানি করা হত। এভাবে সংগৃহীত হত প্রচুর অর্থ। কনস্টান্টিনোপল ছাড়াও বিখ্যাত বাইজেন্টাইন নগর ও বন্দর সমূহ–আলেকজান্দ্রিয়া, এন্টিওক, স্যালোনিকা, দামেস্ক, টায়ার প্রভৃতি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সে যুগে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় একমাত্র বাইজেন্টাইন মুদ্রারই প্রচলন ছিল, আর পশ্চিম ইউরোপের ফ্রাঙ্কদের সম্রাটরা বাইজেন্টাইন মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা তৈরি করতেন। প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে বাইজেন্টাইনের বণিকরা মহাজনীবৃত্তি গ্রহণ করে অন্যদের টাকা ধার দিতে শুরু করে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বহুলাংশে বিদেশীদের হাতে চলে যায় এবং এটা পরে বাইজেন্টাইনের বাণিজ্যের তথা সমগ্র সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বহির্বাণিজ্যে বাইজেন্টিয়ামের খ্যাতি ছিল যেমন জগৎব্যাপী, তেমনি অভ্যন্তরীণ শিল্প ও বাণিজ্যেও এর কোন জুড়ি ছিল না। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শিল্পের প্রসারের অন্যতম কারণ এর বিপুল খনিজ সম্পদ। খনিজ সমৃদ্ধ বল্কানের পার্বত্যাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হত প্রচুর লোহা, তামা,ও সিসা এগুলোর সাহায্যে প্রস্তুত হত যুদ্ধাস্ত্র ও বর্মরাজি। এছাড়া সোনা,রূপা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার হত কারুকার্যময় সুন্দর সুন্দর বিলাসদ্রব্য প্রস্তুতের কাজে, আর হাতির দাঁতের দ্রব্যাদির ব্যবহারও বহুল প্রচলিত ছিল। রেশম বস্ত্র নির্মাণে বাইজেন্টাইনের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত সুতি ও রেশম বস্ত্র অনেক সময় সূক্ষ্ম স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্যে অলঙ্কৃত থাকত। এসব বিলাস দ্রব্যের বিপুল চাহিদা ছিল সমাজের উঁচুতলার নাগরিকদের কাছে, বিশেষত সম্রাটের রাজদরবারে ও তাঁর পাত্রমিত্র অমাত্যবর্গের নিকট।

www.pathagar.com

শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে বাইজেন্টিয়ামের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। প্রত্যেক শিল্পের জন্য ছিল এক-একটি গিল্ড, যার হাতে ছিল সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে , প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের অধীনে। বাইজেন্টাইন সম্রাটের ক্ষমতা ছিল একচ্ছত্র। তাঁর অধীনস্থ বিরাট আমলাতন্ত্র সকল সরকারি কার্যের তদারক করত। শিল্পোৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করত। জিনিসপত্রের দাম এমন কি শ্রমিকের মজুরি পর্যন্ত নির্ধারণ করত সরকার। কারখানার মালিকের কোন স্বাধীনতা ছিল না—কি পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করা হবে, কতখানি দ্রব্য উৎপাদন করা হবে এবং কোথায় কীভাবে বিক্রি করা হবে–সবই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত। এমনকি অনেক সময়ে একজন শ্রমিক ইচ্ছামত নিজের পেশা বেছে নিতে পারত না, সেটাও গিল্ডের দ্বারা নির্ধারিত হত। অনেক শিল্পও আবার সরকার কর্তৃক পরিচালিত হত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিউরেক্স (রক্ত-বেগুনি রঙ প্রদানকারী) মাছের চাষ, খনি, অস্ত্রনির্মাণ কারখানা ও বয়নশিল্প প্রভৃতি। এক সময়ে রেশম শিল্পও সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়; কিন্তু চাহিদামত উপযুক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম না হওয়ায় পুনরায় তা ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করা হয়।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে রোমের মতো ব্যাপক ভিত্তিক দাসতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। রোমে যে সব কাজ দাসেরা করত, বাইজেন্টাইনে তা করা হত পানিস্রোত চালিত কলের সাহায্যে। বাইজেন্টিয়ামের অর্থনীতি প্রধানত শিল্পভিত্তিক হলেও সেখানে কৃষিরও প্রাধান্য ছিল। সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় কৃষিকার্য ছিল মোটামুটি স্বাধীন কৃষকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে; কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীন কৃষকরা লোপ পেতে থাকে। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে পর পর কয়েকবার ফসল নষ্ট হওয়ায় এই সমস্ত কৃষকদের স্থলে আবির্ভাব হয় ভূমিদাসের। পশ্চিম ইউরোপের মতো ক্রমে ক্রমে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেও সামন্তপ্রথা শিকড় গেড়ে বসে। সরকারও এই ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করে। পঞ্চম শতাব্দীতে সম্রাট আনাস্তাসিয়াস এক আইন জারি করেন যার দ্বারা কোন কৃষক একটি জমিতে ত্রিশ বছর বাস করলে তার পক্ষে সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বাস করা নিষিদ্ধ করা হয়। এ ভাবে কৃষকদের জমির সাথে বেঁধে ফেলা হল—এ ছাড়াও নানা রূপ কর ধার্য করে স্বাধীন কৃষকদের একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হল। সম্রাটের এ সকল আইন জারির উদ্দেশ্য ছিল প্রতি বছরে জমি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ফল হল স্বাধীন কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করা এবং সমাজের পরগাছা রূপে একটি ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা যারা অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করে জীবন অতিবাহিত করত।

কৃষকরা ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে কয়েকবার বিদ্রোহ করে। এর মধ্যে টমাস-এর নেতৃত্বে সংঘটিত ৮২১ সালের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহে কৃষক ছাড়াও শহরের শ্রমজীবী জনগণের কিছু অংশ যোগদান করে। সরকারি সৈন্যের সাহায্যে এ বিদ্রোহ দমনের পর সামন্ত প্রভুরা সৈন্যদের মধ্যে জমি বিতরণ করে নিজেরা সৈন্য মোতায়েন করে রাখতে শুরু করে। এছাড়াও সম্রাটের সেনাবাহিনীতে সামন্তপ্রভুরা উচ্চপদ দখল করে রাখত। ফলে এরা সম্রাটের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। সম্রাটও নিজের ক্ষমতা হারিয়ে ক্রমে ক্রমে সামন্তপ্রভুদের অনুগ্রহভাজনে পরিণত হলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে রোমান সাম্রাজ্যের মতো সংগঠিত দাসপ্রথা ছিল না। সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক দাস ছিল, কিন্তু তারা ছিল প্রধানত কৃষিকার্যে ও গৃহকর্মে নিযুক্ত। সপ্তম শতাব্দীতে স্লাভদের আক্রমণের পর থেকে ক্রমশ দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটতে থাকে। স্লাভরা প্রথমে বল্কান উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল অধিকার করে এবং

www.pathagar.com

পরে মেসিডোনিয়া ও গ্রিসে প্রবেশ করে ঈজিয়ান সাগরের উপকূল পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে। স্লাভদের আক্রমণে এসকল অঞ্চলের দাস মালিকদের সম্পত্তি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর ফলে বহুক্ষেত্রে দাসরা মুক্ত হয়ে মালিকদের জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়; কোন কোন ক্ষেত্রে দাস মালিকরা নিজেরাই দাসদের মুক্ত করে দিয়ে তাদের মধ্যে জমি বিতরণ করে তাদের ভূমিদাসে পরিণত করে। এভাবে দাসপ্রথা ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে এবং দাসরা অর্ধ স্বাধীন কৃষক ও ভূমিদাসে পরিণত হয়।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের আরেকটি শক্তি ছিল এর চার্চ, মঠ ও পুরোহিত গোষ্ঠী। এ সমস্ত পুরোহিতের অধীনে ছিল প্রচুর জমি। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরোহিত দল তাদের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করত। এছাড়া নানারূপ দুর্যোগ দুর্বিপাকে সাধারণ লোকেরা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের সাধনায় তাদের সব কিছু উৎসর্গ করে চার্চ ও মঠকে তাদের সমস্ত জমিজমা দান করত। কিন্তু এদের দিয়েই আবার পুরোহিত দল সে জমি চাষ করাত। এ সমস্ত চার্চ ও মঠ বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করত। জাতীয় আয়ের একটি বিরাট অংশ এদের হস্তগত হত। এ ছাড়াও পুরোহিত দল বিভিন্ন উপায়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করে নাগরিকদের একটি বিরাট অংশকে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য পেশা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগাত। এর ফলে দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

বাইজেন্টাইন সমাজে পরস্পরবিরোধী উপাদানের প্রাবল্য বর্তমান ছিল। সেখানে ছিল একদিকে বিপুল ধন-বৈভব ও অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য একদিকে জ্ঞানের অপার বিস্তার ও অন্যদিকে বিরাট অজ্ঞতা; একদিকে প্রবল ন্যায়নিষ্ঠা এবং পার্থিব জগতের প্রতি সকল বৈরাগ্য ও অন্যদিকে চরম অনৈতিকতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও জগতের সকল সুখ-সম্ভোগের প্রতি একান্ত অনুরাগ।

বাইজেন্টাইন সম্রাট ও তাঁর পারিষদবর্গ, ধনী সামন্তপ্রভুর দল, উচ্চশ্রেণীর পুরোহিত গোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী ধনিকশ্রেণী বাস করত বিপুল বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে। তাদের প্রাসাদোপম বাসগৃহ, কারুকার্যখচিত বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য-পানীয়, চিত্ত বিনোদনের বিপুল উপকরণ প্রভৃতি দেখে বিস্মিত হতে হয়। এদের সময় কাটত কাব্য ও শিল্পকলার চর্চা করে এবং দুরূহ ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করে। কিন্তু ধনসম্পদের প্রাচুর্য এদের নৈতিক জীবনের অবক্ষয়ের সূচনা করেছিল। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল অলসতা ও কর্মবিমুখতা, যার পরিণতিতে দেখা দিয়েছিল পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও নিরন্তর গৃহযুদ্ধ।

এদেরই পাশাপাশি বাস করত আরেকটি শ্রেণী — বাইজেন্টাইনের অগণিত দরিদ্র শহরবাসী, শ্রমিক ও কৃষক। আকণ্ঠ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়ে এরা বেঁচে থাকত ছিন্নমলিন বস্ত্র পরিধান করে; অর্ধাহারে, অনাহারে, মনুষ্যবাসের অনুপযোগী আলো-বাতাসহীন ক্ষুদ্র কুটিরে অথবা উন্মুক্ত আকাশের নিচে বাস করে; শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে। বাইজেন্টাইনের বিপুল সম্পদ এদের কোন ভোগেই আসত না।

এই দুই শ্রেণীর জনগণের সমন্বয়ে গঠিত ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। রাষ্ট্রীয় খরচে প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি হয়েছিল বিরাট বিরাট মল্লমঞ্চ। সেখানে আয়োজন করা হত মল্লযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, পশুর সাথে যুদ্ধ প্রভৃতির, যা শেষপর্যন্ত পরিণত হত লাল ও সাদা, নীল ও সবুজ প্রভৃতি স্মারক চিহ্ন সম্বলিত বিভিন্ন গোত্রের লোকের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায়। আর দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিলে বাইজেন্টাইন সম্রাট জনগণের দৃষ্টিকে অন্যত্র নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রায়ই 'বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য' যুদ্ধের আহ্বান করতেন।

www.pathagar.com

বাইজেন্টাইন সভ্যতার অবদান

ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও আইন

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বাইজেন্টাইনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন হয়েছে, শিল্পকলার চর্চা হয়েছে। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি যখন বর্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য তার জ্ঞান প্রদীপের শিখা প্রজ্বলিত করে রেখেছিল। যখন পশ্চিম ইউরোপের মঠগুলিতে কেবলমাত্র ধর্মীয়শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তখন কনস্টান্টিনোপলের বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রিক বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে। সে যুগে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচর্যা হয়েছে। আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানচর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেখানকার কিছু সংখ্যক গ্রিক পণ্ডিত এথেন্স ও কনস্টান্টিনোপলে পালিয়ে যান। কিছুদিন পরে এথেন্সের বিদ্যাপীঠও বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন সমগ্র ইউরোপে কনস্টান্টিনোপলই ছিল জ্ঞানচর্চার একমাত্র কেন্দ্র।

বাইজেন্টাইনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল প্রাচীন গ্রিক মনীষীদের অমূল্য গ্রন্থসমূহ। সরকারি কাজে এবং সকল স্তরে গ্রিক ভাষার ব্যবহার জনগণকে গ্রিক সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। জ্ঞানের প্রতি বাইজেন্টাইনের জনগণের একটি স্বাভাবিক স্পৃহা ছিল। আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী প্রত্যেক পিতামাতাই তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বাইজেন্টাইন পণ্ডিতদের নিজেদের অবদান বিশেষ কিছু ছিল না। তাঁদের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল গ্রিক পণ্ডিতদের রচনা সঙ্কলন ও সংরক্ষণে। এঁদের মধ্যে প্রোসোপিয়াস, ফটিয়াস, সেলাস, সাইমন মেটাফ্রাস্টাস ও এরেথাসের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অবদান ছিল ইতিহাসে, সাহিত্যে ও দর্শনে।

বাইজেন্টাইনের পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যায় তিনি হলেন ঐতিহাসিক প্রোসোপিয়াস। প্রোসোপিয়াস ছিলেন সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সমসাময়িক ও জাস্টিনিয়ানের প্রধান সেনাপতি বেলিসারিয়াসের একান্ত সচিব। বেলিসারিয়াসের অনেক সামরিক অভিযানে, বিশেষত পারস্য, আফ্রিকা ও ইতালি অভিযানে তিনি সঙ্গী হয়েছিলেন। তাই তাঁর রচনায় এসকল অভিযানের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রোসোপিয়াসের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন ফটিয়াস (৮২০-৮৯১ খৃঃ)। তাঁর কৃতিত্ব ছিল সাহিত্যে। সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠতম। শুধু তাই নয়, প্রাচীন লেখকদের রচনা সঙ্কলনেও তাঁর অবদান ছিল প্রচুর। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Bibliotheca বা Myriobiblon প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত ২৮০টি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ। ফটিয়াসের সঙ্কলনের ফলেই আমরা মেম্নন্, কনন, টেসিয়াস, ডায়োডোরাস, সিকুলাস ও এরিয়ানের রচনার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করি। কারণ এ সকল প্রাচীন লেখকদের প্রায় সমস্ত রচনাই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

একাদশ শতাব্দীর মাইকেল কনস্টানটাইন সেলাস ছিলেন একাধারে দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। কনস্টান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সেলাসের রচনায় দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিবরণ-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক রচনার জন্য তাঁর খ্যাতি রয়েছে। সাইমন মেটাফ্রাস্টাসের রচনাবলী সাধু-সন্ত ও মহাত্মাদের জীবন কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

www.pathagar.com

এরেথাস ছিলেন ফটিয়াসের ছাত্র। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। তিনি নিজ উদ্যোগে প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতদের অনেক রচনা নকল করেন। এর মধ্যে রয়েছে প্লেটো ও ইউক্লিডের গ্রন্থসমূহ।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বাইজেন্টাইন পণ্ডিতদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি, যদিও সমসাময়িক আরবদের তুলনায় এটা ছিল খুবই সামান্য। সাম্রাজ্যের প্রথম দিকেই অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন দি গ্রামারিয়ান, ইটিয়াস এবং ট্রালেসের আলেকজান্ডার ছিলেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাবিদ। জন দি গ্রামারিয়ান ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী—তৎকালে প্রচলিত গতি ও মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত তত্ত্বের তিনিই প্রথম বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু যে বস্তুর জড়ত্ব (inertia) সম্বন্ধে তিনি ধারণা করতে পেরেছিলেন তাই নয়, উপরন্তু পতনের গতি উক্ত বস্তুর ওজনের উপর নির্ভরশীল—এরিস্টটলের এ ভ্রান্ত তত্ত্বকেও তিনি খণ্ডন করেছিলেন; এবং শূন্যতা সৃষ্টি অসম্ভব এ কথা মানতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন।

ইটিয়াস ছিলেন সম্রাট জাস্টিনিয়ানের দরবারের চিকিৎসক। তিনি এবং ট্রালেসের আলেকজান্ডার উভয়েই প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস ও গ্যালনের অনুসারী ছিলেন। ইটিয়াসের অবদান ছিল বেশি মৌলিক। তিনিই প্রথম ডিপথিরিয়া রোগের বিবরণ প্রদান করেন এবং চক্ষু রোগ সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনা ছিল ঐ সময় পর্যন্ত প্রকাশিত বিবরণসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে প্রায় কয়েকশত বছর পর্যন্ত বাইজেন্টাইনে আর কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়নি। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সম্রাট সপ্তম কনস্টান্টাইন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রধানত মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে বাইজেন্টাইনের বিজ্ঞান চর্চা পুনরায় আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে অন্যতম বৈজ্ঞানিক ছিলেন সিমনসেথ। তাঁর অবদান ছিল চিকিৎসাবিদ্যায়। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব ছিল : চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিধান প্রণয়ন। এতে তিনি ভারতীয় ও আরব বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন ঔষধের বিবরণ প্রদান করেন।

ইউরোপের ইতিহাসে বাইজেন্টাইন পণ্ডিতদের অবদান অপরিসীম। প্রাচীন গ্রিক জ্ঞানভাণ্ডার তাঁরা সংরক্ষণ করতে পেরেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা এই জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পরে বাইজেন্টাইনের গ্রিক পণ্ডিতগণ ইতালিতে পালিয়ে যান। ইতালির রেনেসাঁর পশ্চাতে এ পণ্ডিতদের অবদান অন্য কারো চেয়ে কম ছিল না।

বাইজেন্টাইনের বিশ্বজোড়া খ্যাতির অন্যতম কারণ এর শিল্পকলা। হেলেনীয় শিল্প, প্রাচ্যদেশীয় শিল্প ও খ্রিস্টান শিল্প—এই তিনের সংমিশ্রণে তৈরি বাইজেন্টাইনের শিল্প। এই শিল্প সৃষ্টির পশ্চাতে শুধু সৌন্দর্যানুভূতিই ছিল না, এটা ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতিচ্ছবি। ধর্মীয় জীবনের প্রতি নিষ্ঠা, বিশেষত ইহলৌকিক জীবনের প্রতি প্রচণ্ড বৈরাগ্য বাইজেন্টাইনের জনগণের একটি বিরাট অংশের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল; ফলে, ভাস্কর্য শিল্প, যার মধ্যে মানব সৌন্দর্যের প্রাধান্যই মূল উদ্দেশ্য, তা বাইজেন্টাইনের শিল্পকলায় কোনো স্থান পায়নি। বাইজেন্টাইনের প্রধান শিল্প ছিল স্থাপত্যশিল্প, যার মধ্যে মূর্ত হয়েছিল একটি ভাববাদী ও মরমীরূপ।

বাইজেন্টাইনের সর্বত্র এই স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন বর্তমান। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কনস্টান্টিনোপলের সান্টা সোফিয়া চার্চ। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের উদ্যোগে প্রায় ১০,০০০ লোকের পাঁচ বছরের পরিশ্রমে এটি তৈরি হয়েছিল। এর প্রধান শিল্পী ছিলেন মাইলেটাস-এর ইসিডোরাস এবং ট্রালেসের এথেমিয়াস। রোমান স্থাপত্যের পরিকল্পনায় ও বাইজেন্টাইন

www.pathagar.com

স্থাপত্যের অলঙ্কারে সমৃদ্ধ এ সৌধটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্প। মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য বা ইহলৌকিক কামনা-বাসনাকে প্রাধান্য না দিয়ে শুধুমাত্র অন্তরের সমৃদ্ধি ও আত্মার উন্নতি যে প্রতিটি ধার্মিক খ্রিস্টানের একান্ত কাম্য তা প্রকাশ করা হয়েছে এ সৌধটির মধ্য দিয়ে, যার জন্য এ প্রাসাদটির বহিঃসৌন্দর্যের দিকে কোনো নজর না দিয়ে অভ্যন্তর ভাগ অলঙ্কৃত করা হয়েছে অপরিসীম শিল্প-সৌন্দর্যে।

বাইজেন্টাইন সভ্যতার আর একটি বিশেষ অবদান এর সঙ্কলিত আইনসমূহ। রোমান আইনের সঙ্কলন ও পরিমার্জন করে সম্রাট জাস্টিনিয়ান ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এই সঙ্কলিত আইনসমূহের নাম Corpus Juris Civilis। এই সঙ্কলন তৈরির কাজে তিনি ট্রিবোনিয়ানের নেতৃত্বে একদল সুশিক্ষিত আইনবিদকে নিযুক্ত করেন। চৌদ্দমাস কঠোর পরিশ্রমের পর এই আইনগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। Corpus Juris Civilis চার অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ Code দশটি খণ্ডে সমাপ্ত। এতে রয়েছে সম্রাটের নির্দেশাবলী ও সিনেটের উপদেশসমূহ। দ্বিতীয় খণ্ড Institutes-এ আছে রোমান আইনের মূল নীতিসমূহ। প্রধানত আইনের ছাত্রদের জন্য এটি প্রণীত হয়। তৃতীয় অংশের নাম ফৌজদারি আইনসমূহ যা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। বিখ্যাত আইনবিদদের অভিমতগুলিও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চতুর্থ অংশের নাম Novels। এটি গ্রিক ভাষায় রচিত। জাস্টিনিয়ানের নিজস্ব আইনগুলি এই অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। Corpus Juris Civilis শুধুমাত্র রোমান আইনের জটিলতাই দূরীভূত করে নি, আইনগুলিকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধরূপে সঙ্কলিত করেছে।

বাইজেন্টাইন সভ্যতার বিকাশের কারণ

প্রবল পরাক্রমশালী রোম সাম্রাজ্য যখন অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে এবং বর্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, ঠিক সে সময়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য কি ভাবে সভ্যতার শিখরে আরোহণ করল, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে এই দুই সভ্যতার অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করা দরকার।

যে কোন সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত হচ্ছে তার বৈষয়িক উৎপাদন, যার মাত্রা স্থিরীকৃত হয় তৎকালীন কারিগরি আবিষ্কারসমূহ ও তাঁর প্রয়োগ দ্বারা। সে দিক দিয়ে বিচার করলে গ্রেকো রোমান সভ্যতার থেকে বাইজেন্টাইন সভ্যতার কারিগরি ভিত্তি খুব যে ভিন্নতর ছিল তা নয়। উপরোক্ত সব কয়টি নগরভিত্তিক সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল তাম্র-প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ এবং লৌহযুগের বিভিন্ন কারিগরি আবিষ্কারসমূহকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু যে কোন সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য সমাজের মানুষদের মধ্যে কতগুলি সামাজিক সম্পর্কের ও উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন হয়। কারণ উৎপাদনকারীদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ভিন্ন কোন উৎপাদন ব্যবস্থা চলতে পারেনা। উক্ত উৎপাদন সম্পর্ককে কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক ভাবাদর্শ প্রচলনেরও প্রয়োজন হয়। প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের ন্যায্যতা সম্বন্ধে সমাজের সদস্যদের মনে বিশ্বাস, আস্থা ও প্রত্যয় উৎপাদনই এই ভাবাদর্শের কাজ।

উৎপাদনব্যবস্থা যতদিন অনুন্নত ছিল উৎপাদন সম্পর্কে ততদিন ছিল প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের পক্ষে নির্যাতনমূলক। ব্রোঞ্জযুগের কারিগরি ভিত্তি এতই নিম্নমানের ছিল যে, দাস শ্রমের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া এ যুগের সভ্যতা টিকতেই পারত না। কিন্তু সমাজে দাসের উপস্থিতি অর্থনৈতিক বিকাশ এবং কারিগরি আবিষ্কারের জন্য কোন সামাজিক প্রেরণা সৃষ্টি করত না। অপরদিকে

www.pathagar.com

প্রাথমিক উৎপাদনকারী দাস ও অর্ধ-দাসদের ক্রয়ক্ষমতা সঙ্কুচিত থাকার ফলে অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগও ছিল না। এই মূল অসঙ্গতির দরুনই প্রাচীনকালের কোন সভ্যতাই স্থায়ী হয়নি। উৎপাদন ক্ষেত্রে এই মূল অসঙ্গতির তাড়নাতেই ব্রোঞ্জযুগে দেখা দিয়েছিল সাম্রাজ্য নিয়ে হানাহানি। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ মূল সঙ্কটের সমাধান করতে পারে নি, বরং ধ্বংসের মাধ্যমে লোকক্ষয় ও সম্পদহানি ঘটিয়ে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার পতনকে ত্বরান্বিতই করেছিল। বাস্তবিকই ব্রোঞ্জ যুগের শেষ দিকে সভ্যতার পরিধি নিদারুণভাবে কমে গিয়েছিল।

লৌহযুগে নতুন কারিগরি আবিষ্কারের ভিত্তিতে নতুন লৌহযুগীয় সভ্যতার উদয় হয়েছিল। গ্রিক ও রোমান সভ্যতা তারই পরিণত রূপ। কিন্তু গ্রিক ও রোমান যুগের এই সভ্যতাও ছিল দাসভিত্তিক। অথচ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আয়োনীয় যুগে এবং খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত আলেকজান্দ্রীয় যুগে যে সকল কারিগরি আবিষ্কার ও উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার ভিত্তিতে স্বাধীন শ্রমভিত্তিক অর্থনীতি নির্মাণ করা সম্ভব ছিল; কিন্তু এর পক্ষে বড় বাধা ছিল তৎকালে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক ও ভাবাদর্শ।

গ্রেকো-রোমান যুগে প্রাথমিক উৎপাদন এবং দৈহিক পরিশ্রমের কাজ দাসদের দিয়ে করান হত বলে স্বাধীন নাগরিকগণ সকল পরিশ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখত। ফলে, দাসযুগের ভাবাদর্শ সমাজের একটি বড় অংশকে, স্বাধীন জনগণকে কার্যত উৎপাদনমূলক কাজ থেকে বিরত রেখে অর্থনীতির ক্ষতি সাধন করেছিল। গ্রেকো-রোমান যুগে মুদ্রাভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি আন্তর্জাতিক বিশ্বজনীন ভাবাদর্শের। কিন্তু দাসতন্ত্রের ফলে তা কখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কিন্তু দাসতন্ত্রের সমর্থনে সৃষ্টি হয়েছিল মানবতাবিরোধী তত্ত্ব আর (এরিস্টটলের স্বাভাবিক দাসতত্ত্ব ইত্যাদি)। গ্রেকো-রোমান জগতে যে বিশ্বজনীন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছিল, সে চাহিদা পূরণ করতে পারত খ্রিস্টধর্ম। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের আদর্শ ছিল দাস সমাজের পরজাতি-বিদ্বেষ ও মানববিদ্বেষের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণেই রোমান আমলের শেষ দিকে খ্রিস্টধর্মকে নির্মমভাবে দমন করার চেষ্টা হয়েছিল।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ দুটি: এক, অর্থনীতিতে অনাবশ্যক দাসশ্রমের উপস্থিতি; দুই, একটি অসামঞ্জস্য অকেজো ভাবাদর্শ—দাসতান্ত্রিক ভাবাদর্শ। এ ভাবাদর্শ, এ সামাজিক সম্পর্ক মুদ্রানির্ভর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতির সুষ্ঠু পরিচালনাকে ব্যাহত করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের এই হল মূল কারণ। এ কারণ দুটো দূর করতে পারলে তৎকালীন কারিগরি আবিষ্কারসমূহের ভিত্তিতেই নতুন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ সম্ভব ছিল। বাইজেন্টাইন সভ্যতার বিকাশ তার বাস্তব প্রমাণ। বাইজেন্টাইন সমাজে সংগঠিত দাসতন্ত্রের অনুপস্থিতি এবং কনস্টান্টাইন কর্তৃক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ এবং থিওডসিয়াস কর্তৃক খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি দান রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণকে দূরীভূত করেছিল। এরই ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল প্রাচীন এবং গ্রেকো-রোমান যুগের উৎপাদন প্রথাকে অবলম্বন করেই সুউচ্চ সভ্যতা গড়ে তোলা।

বাইজেন্টাইন সভ্যতার অবসান

পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ-শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ছিল ধন-বৈভবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্প-সৌন্দর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এরপর থেকে শুরু হয় পতন। এর পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে, বাইজেন্টাইন সভ্যতা মূলত

www.pathagar.com

ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহযুগের কারিগরি আবিষ্কারসমূহকে অবলম্বন করেই বিকাশ লাভ করেছিল এবং প্রাচীন উৎপাদন প্রথা ও ভাবাদর্শের সংস্কার সাধন করে তার ভিত্তিতে স্থিতিশীল বাইজেন্টাইন সমাজ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এ সমাজ যে চিরস্থায়ী হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। কারণ ঐ অনুন্নত কারিগরি ভিত্তির উপর নির্মিত সমাজের পক্ষে (সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং সাম্রাজ্যের বহির্ভূত বিভিন্ন অঞ্চলের) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপোষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। ফলে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে দুটো পন্থার আশ্রয় নিতে হয়েছে —যুগসঞ্চিত ধনভাণ্ডার থেকে ব্যয় এবং প্রাথমিক উৎপাদনকারী অর্থাৎ কৃষক ও কারিগরদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ। কিন্তু এ পন্থায় সাময়িক ফল পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত এটাই তার ধ্বংসেরও কারণ হয়েছিল। কৃষক ও কারিগরদের দমনের ফলে পণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। কৃষকদের অবদমিত রাখার ফলে বাইজেন্টাইনের সামরিক শক্তিও ক্ষুণ্ন হয়েছিল, কারণ ভূমিদাসদের সেনাবাহিনীতে নেয়া হত না এবং দরিদ্র কৃষকদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র কেনার মতো ক্ষমতা ছিল না। রাষ্ট্র সংগঠনের ক্রমাবনতির ফলে রাজকীয় নৌবাহিনীও বিপুলভাবে অবহেলিত হয়েছিল এবং এই অক্ষম নৌবাহিনী শেষপর্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়নি। শেষপর্যন্ত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য সুবিশাল রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি; এবং নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে স্থানীয় ভিত্তিক সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীয় রাজশক্তিকে দুর্বল করে তুলছিল। অথচ এ সামন্ত ব্যবস্থা ছিল পশ্চিম ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে নিকৃষ্ট। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে ইউরোপে ক্রমে ক্রমে যে সামন্ত অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল তাকে কোন বিশাল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রযন্ত্রের ভার বহন করতে হয়নি, তার প্রয়োজনও ছিল না। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য যখন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবিরাম বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যস্ত থেকেছে তখন ইউরোপ, বিশেষত পশ্চিম ইউরোপ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে ম্যানর অর্থনীতির ভিত্তিতে সুদৃঢ় অর্থনীতি গড়ে তুলেছে এবং নির্মাণ করেছে পরবর্তী বিকাশের ভিত। সামন্ত ইউরোপের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত সম্পদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ইতালির বাণিজ্য জগৎ। মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপের নতুন নতুন কারিগরি ও অন্যান্য আবিষ্কারের (যথা, অশ্বসজ্জা ও লোহার খুর, হাল ও কম্পাস, কাগজ ও ছাপাখানা প্রভৃতির) প্রচলনের ফলে যেমন ইউরোপীয় অর্থনীতির রূপান্তর ঘটেছিল, রক্ষণশীল বাইজেন্টাইন সমাজে তেমন হয়নি। ইউরোপের দৃঢ় ভিত্তিসম্পন্ন অর্থনীতির প্রতিযোগিতা তাই বাইজেন্টাইনকে শক্তিহীন করেছিল।

তদুপরি, অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে পরিচালনা করার উপযুক্ত বিশাল রাষ্ট্রযন্ত্রকে বজায় রাখা যখন ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠেছিল, সে অবস্থায় ক্ষয়িষ্ণু দুর্নীতিপরায়ণ, বিলাসী আমলাতন্ত্রের হাতে পড়ে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ধ্বংসের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিল। শিল্পোৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ শেষ অবধি বাইজেন্টাইন শিল্পের অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিরন্তর করবৃদ্ধি জনগণের অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। দেশের চরম অর্থনৈতিক দুর্দিনেও সম্রাটদের বিলাসিতা ও তাঁদের আমলাদের সীমাহীন ব্যয়-বাহুল্য এতটুকুও কমে নি। অভ্যন্তরীণ কারণে অবক্ষয়িত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত ইউরোপের নবোদিত বাণিজ্য শক্তির প্রতিযোগিতা এবং বৈদেশিক আক্রমণের আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারল না। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কিদের আক্রমণের ফলে এশিয়ামাইনরের কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যায়। দশম শতাব্দীতে নর্মানদের আক্রমণের

www.pathagar.com

ফলে থিব্‌স্ ও করিন্থ-এর রেশম শিল্প কারখানাগুলি সিসিলি দ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। এর পরপরই সংঘটিত হয় প্রথম তিনটি ক্রুসেড যার ফলে সিরিয়ার বাণিজ্য পথগুলি কনস্টান্টিনোপলের হাত থেকে ইতালির দখলে চলে যায়। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যপথগুলির উপর ইতালি বহুদিন যাবৎ লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, ইতালির বণিক দল কর্তৃক এই বাণিজ্য পথগুলি দখলের চেষ্টা ক্রুসেডের পশ্চাতে অন্যতম প্রধান কারণ। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেডের সময় ক্রুসেডারগণ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করে সমগ্র নগরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। নাগরিকদের হত্যা করে এবং তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়েই ক্রুসেডাররা ক্ষান্ত হয় নি, তারা নগরের গ্রন্থাগার ও দলিলপত্র সংরক্ষণাগারগুলিকেও পুড়িয়ে দেয়। সুন্দর সুন্দর ইমারতগুলি তারা ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে এবং সান্তা সোফিয়া চার্চে রক্ষিত বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পের নিদর্শনগুলিও সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। ধর্মোন্মাদ ক্রুসেডারদের হাতে বাইজেন্টাইন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার এরূপ নিদারুণ পরিণতি ঘটল। ক্রুসেডারগণ এরপর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেখানে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এ শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কনস্টান্টিনোপলে কিছু কাল পরে পুনরায় বাইজেন্টাইন সম্রাটের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। জনগণের কাছ থেকে কর আদায়ও আর সম্ভব হচ্ছিল না। সর্বত্র অরাজকতা যখন এত ব্যাপক ঠিক তখনই অটোমান তুর্কিরা একে একে বাইজেন্টাইনের বিভিন্ন প্রদেশগুলি দখল করে নেয়। অবশেষে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কিদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতন হয় এবং সে সাথে বাইজেন্টাইন সভ্যতার চির অবসান ঘটে।

স্লাভ জাতির ইতিহাস

পশ্চিম ইউরোপের বর্বর সংস্কৃতির জার্মান জাতির ইতিহাস আগেই বলা হয়েছে। জার্মানদের পূর্বদিকে অর্থাৎ মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে জার্মানদেরই সমসাময়িক আরেকটি বর্বর সংস্কৃতির জাতি বাস করত। তাদের নাম ছিল স্লাভ জাতি। পশ্চিমে এলবে নদী থেকে পূর্বে ভোলগা ও ডন নদী পর্যন্ত এবং উত্তরে বাল্টিক সাগর থেকে দক্ষিণে দানিয়ুব নদী ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত যে বিশাল ভূভাগ সেখানেই ছয়ের শতকে স্লাভরা বাস করত।

স্লাভদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। তবে তারা পশুপালনেও অভ্যস্ত ছিল। এছাড়া তারা প্রয়োজন মতো শিকার করত এবং মাছ ধরত। বন থেকে মৌচাকের মধুও তারা নিয়মিত সংগ্রহ করত। স্লাভরা মূলত ছিল নতুন পাথর যুগের কৃষি সংস্কৃতির মানুষ। তবে স্লাভ কারিগররা লোহার লাঙলের ফলা, ছুরি, ও কাস্তে তৈরি করতে পারত। তারা শন জাতীয় গাছের আঁশ থেকে কাপড় তৈরি করত এবং কুমারের চাকের সাহায্যে মাটির পাত্র তৈরি করত। এ সকল কলাকৌশল, বিশেষত ধাতুর ব্যবহার তারা নানা সূত্রে সভ্য জাতিদের কাছ থেকে শিখেছিল।

স্লাভরা গ্রামে বাস করত। গ্রামের চারদিকে কাঠের খুঁটি দিয়ে কিংবা কাদামাটির দেয়াল দিয়ে বেড়া দিত এবং চারদিকে পরিখা খুঁড়ে গ্রামকে সুরক্ষিত করত। স্লাভরা ক্ল্যান ও ট্রাইবে বিভক্ত ছিল। ট্রাইবের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ সভায় আলোচনা হত এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হত।

www.pathagar.com

একজন সমসাময়িক সভ্য ঐতিহাসিক শ্লাভদের সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, 'তাদের কোন রাজা বা শাসনকর্তা নেই। তারা সবাই মিলে নিজেদের কার্যক্রম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।' আমরা প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা কালে দেখেছি যে, আসলে প্রস্তর যুগে এটাই ছিল সাধারণ রীতি। (দ্রঃ মানুষের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ) শ্লাভদের মধ্যে প্রাচীন গোষ্ঠী ও ক্ল্যান প্রথা টিকে ছিল এবং তারা নতুন পাথর যুগের বর্বর সংস্কৃতির গণ্ডির ভিতরেই বাস করত। অপর পক্ষে সভ্য সমাজে শ্রেণী বিভাগ এবং শাসক-রাজা উদিত হওয়ার পর সভ্য মানুষরা ট্রাইবের গণতন্ত্রের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাই সভ্য সমাজের মানুষ শ্লাভ ও জার্মান বর্বর সমাজের গণতন্ত্র দেখে বিস্মিত হত।

সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে শ্লাভরা (তাদের প্রতিবেশী জার্মান বর্বরদের মতই) শ্রেণী বিভক্ত সভ্য সমাজের অনুকরণ করতে শিখেছিল। আদিম কালের অর্থাৎ প্রথম আমলের নতুন পাথরের যুগের কৃষকরা ছিল শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী। ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগের সভ্য মানুষদের আক্রমণের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করে। শ্লাভরা এ ভাবেই যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিল। শ্লাভদের একটা শাখা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল। বাইজেন্টাইনের সংস্পর্শে এসে শ্লাভরা সৈন্যবাহিনী গঠন করে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করার রণকৌশল আয়ত্ত করেছিল। শ্লাভরা নগর ও দুর্গ দখল করার কৌশলও আয়ত্ত করেছিল। মই ব্যবহার করে তারা দুর্গের দেওয়াল ডিঙাত, ঢেঁকির আকারের যন্ত্র দিয়ে আঘাত করে করে নগরের দেওয়াল ভাঙত। বলা বাহুল্য, এ সকল কৌশল তারা সভ্য জাতির সংস্পর্শে এসেই শিখেছিল। কারণ তারা নিজেরা ছিল মূলত গ্রামবাসী।

সভ্যদের কাছ থেকে উন্নত রণকৌশল শেখার আগেও শ্লাভরা ছিল প্রাণবন্ত, স্বাধীনতা প্রিয়, শক্তিমান জাতি। শ্লাভদের নিজেদের রণকৌশল কখনই নিকৃষ্ট ছিল না। তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে গভীর বনে, ঢালুপাহাড় ও গিরিখাতের পাশে যুদ্ধ করত। ফাঁদ পাতা ও আকস্মিক আক্রমণ করায় তারা ছিল ওস্তাদ। এ বিষয়ে তারা নিত্যনতুন উদ্ভাবনী কৌশলের পরিচয় দিত। বড় বড় গাছের গুঁড়িতে খোঁড়ল করে তারা হাল্কা ডোঙা নৌকা তৈয়ার করত এবং তাতে চড়ে নদী পার হত। বাইজেন্টাইন বা রোমান সৈন্যরা হঠাৎ আক্রমণ করলে তারা বাড়িঘর ছেড়ে এক মুহূর্তের মধ্যে পানির তলায় অদৃশ্য হয়ে যেত। বিশেষ ভাবে তৈরি নলখাগড়ার নল মুখে পুরে তার ভিতর দিয়ে তারা শ্বাস নিত এবং এ ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানিতে ডুবে থাকতে পারত। শ্লাভরা ছিল কষ্টসহিষ্ণু। তারা খালি গায়ে শীত, বৃষ্টি, গরম সহ্য করতে পারত। এ কারণেই রোমানরা পরাক্রমশালী শ্লাভদের কখনও দাসে পরিণত করতে পারেনি। একজন বাইজেন্টাইন লেখক বলেছেন,' শ্লাভদেরকে কখনও তাদের স্বদেশে দাসত্ব বা অধীনতায় বাধ্য করা যায় না।

শ্রেণীবিভক্ত সভ্য সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে শ্লাভদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ দেখা দেয়। আমরা আগে দেখেছি যে, জার্মান বর্বর সমাজেও এ রকম ভাবে সভ্য সমাজের প্রভাবে শ্রেণী বিভাগের সূত্রপাত ঘটেছিল। শ্লাভরা যখন সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় নতুন জমির সন্ধানে অভিযানে বের হত তখন নতুন জায়গায় বসতি স্থাপন করার পর আর সাধারণত একই ক্ল্যান বা ট্রাইবের লোক পাশাপাশি অবস্থান করত না। বিভিন্ন ট্রাইবের মানুষ পাশাপাশি বাস করে নতুন ধরনের প্রতিবেশী সমাজ গড়ে তুলত। এ প্রতিবেশী সমাজ থেকে প্রত্যেক পরিবারকে প্রয়োজন অনুসারে জমি বরাদ্দ করা হত। নতুন দেশে এসে সম্পত্তি লুণ্ঠনের ফলে শ্লাভদের সমাজে সর্দার ও সামরিক নেতাদের হাতে বেশি বেশি সম্পদ জড়ো হল। এ নেতারা ক্রমশ ছোটখাট রাজায় পরিণত হল। এদের অধীনে অশ্বারোহী সৈন্য থাকত। শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সকল রাজা বেশি পরিমাণে ধনসম্পদ সংগ্রহ করতে সমর্থ হল।

www.pathagar.com

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই বিশাল স্লাভ জাতি তিনটি বড় শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এ তিনটি শাখা হল : পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ স্লাভ।

পূর্ব স্লাভরা ভিস্টুলা ও নিস্টার নদীর পূর্ব দিকে বাস করত। এদের থেকে উদ্ভব হয়েছে রাশিয়ান, ইউক্রেনীয় এবং বাইলোরাশিয়ান– এ কয়টি প্রধান জাতির।

পশ্চিম স্লাভরা ভিস্টুলা, ওডের এবং এলবে নদীর অববাহিকায় বাস করত। এদের মধ্য থেকেই চেক, পোলিশ, প্রভৃতি জাতির উদ্ভব হয়েছে। এ ছাড়া এদের মধ্যে মোরাভিয়া, পোলাব, পোমোর প্রভৃতি জাতিও ছিল।

দক্ষিণ স্লাভরা ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে বল্কান উপদ্বীপে বাসস্থাপন করেছিল। এসব অঞ্চল ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে। কিন্তু স্লাভরা দলে দলে এসে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের জমিতে বসবাস করতে শুরু করে। প্রথমে তারা বল্কান উপদ্বীপের উত্তরাংশ অধিকার করে, তারপর ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রিস পর্যন্ত চলে যায়। স্বাধীন, সতেজ, রণনিপুণ, স্লাভদের সাথে বাইজেন্টাইনের ভাড়াটে সৈন্যরা যুদ্ধ করে পরাজিত হয়। একজন বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'স্লাভরা একের পর এক নগর ও দুর্গ অধিকার করে এবং গ্রামে গ্রামে এমন ভাবে নির্ভয়ে বাস করতে শুরু করে যেন এটা তাদের নিজের দেশ।' স্লাভরা ইজিয়ান সাগরের নানাস্থানে এবং এশিয়ামাইনরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

দক্ষিণ স্লাভদের যে অংশ বল্কান উপদ্বীপে বাসস্থাপন করেছিল তাদের মধ্য থেকেই পরে বুলগেরিয়ান, সার্বিয়ান, ক্রোটিয়ান প্রভৃতি জাতির উদ্ভব হয়েছিল।

মধ্যযুগে জার্মান জাতিদের মত স্লাভদের মধ্যেও সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে স্লাভদের অনেকগুলি বড় বড় সামন্ত রাজ্যও গড়ে উঠেছিল। তবে স্লাভদের ক্ষেত্রে এ সবই ঘটেছিল জার্মানদের তুলনায় অনেক দেরিতে। পশ্চিম ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের প্রভাবেই স্লাভদের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের উদয় হয়েছিল। জার্মান সামন্ত রাজারা স্লাভদের জায়গা জমি দখল করার জন্য বারবার স্লাভদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। স্লাভরা তাই ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের প্রভাবের বাইরে ছিল না।

দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মান সামন্ত রাজারা এলবে নদী পার হয়ে পশ্চিম স্লাভদের আক্রমণ করেন। জার্মানরা অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নিষ্ঠুর অভিযান চালায় এবং নারী, পুরুষ ও শিশুদের দাসে পরিণত করে। জার্মানরা অবাধে বিশ্বাসঘাতকতারও আশ্রয় নেয়। একবার একজন জার্মান সামন্ত রাজা ৩০ জন স্লাভ দলপতিকে আমন্ত্রণ জানায়। তারপর ভোজ সভায় অতর্কিত আক্রমণ করে ঐ তিরিশ জন স্লাভ নেতাকে হত্যা করে।

পোলাব এবং পোমোর স্লাভরা জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে লড়াই করে। কিন্তু এ সব ট্রাইব বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করত বলে জার্মান সামন্ত রাজাদের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

পরাজিত স্লাভ জাতিদের প্রভূত পরিমাণে কর দিতে হত। স্লাভদের উপর জার্মানরা জোর করে খ্রিস্টধর্ম চাপিয়ে দেয়। এর আগে স্লাভরা প্রকৃতি পূজক ছিল অর্থাৎ তারা চাঁদ, সূর্য, বাতাস, ঝড়-বৃষ্টি, গাছপালা, পাহাড়, বন ইত্যাদির পূজা করত। স্লাভদের খ্রিস্টান করার পর গির্জা তাদের কাছ থেকে জোর করে টাইথ নামক কর (অর্থাৎ শস্য ও পশু সম্পদের দশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করতে থাকে। জার্মান সামন্ত রাজারা স্লাভদের জমি দখল করে তার উপর দুর্গ ও মঠ নির্মাণ করে। স্লাভদের জমি থেকে উৎখাত করে সেখানে জার্মান কৃষকরা আবাদ করতে শুরু করে। এভাবে স্লাভদের ভূমিতে জার্মানরা সামন্ত প্রথার আমদানি করে।

www.pathagar.com

দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে স্লাভরা জার্মান দখলকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। স্লাভরা দুর্গ ও মঠসমূহ ধ্বংস করে এবং সামন্ত জমিদার ও গির্জার বিশপদের মেরে ফেলে। জার্মান রাজার সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়।

পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত রাজ্যসমূহের প্রভাবে স্লাভদের মধ্যেও ক্রমশ সামন্ত রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

নবম শতাব্দীতে পশ্চিম স্লাভরা মোরাভিয়া নামে একটা বড় রাজ্য গড়ে তোলে। কিন্তু এ রাজ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কারণ ৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এ রাজ্য পশ্চিমে জার্মানদের এবং পূর্ব দিকে পশুপালক যাযাবর জাতিদের চাপের সম্মুখীন হয়। মোরাভিয়ার একটা অংশের নাম ছিল বোহেমিয়া। বোহেমিয়া রাজ্য অনেকদিন পর্যন্ত জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখে। মোরাভিয়া এবং বোহেমিয়া উভয় রাজ্যই ছিল বর্তমানে চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত।

পশ্চিম স্লাভদের অন্তর্ভুক্ত পোলিশ ট্রাইবসমূহ দশম শতাব্দীতে একটা বড় পোলিশ রাজ্য স্থাপন করেছিল। পোমোর এবং পোলাব জাতিরাও ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেছিল কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি।

দক্ষিণ স্লাভদের অঞ্চলে ৭ম-৮ম শতাব্দীতে বুলগেরিয়া নামে একটি বড় রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বুলগার বা বুলগেরিয়া কোন স্লাভ নাম নয়। ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগে বুলগার নামে একটি তুর্কি জাতি দক্ষিণ -স্লাভদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এ বুলগাররা ক্রমশ স্লাভদের মাঝে মিশে যায় কিন্তু তাদের নামটা কোনক্রমে রয়ে যায়। ৯ম শতাব্দীতে বল্কান উপদ্বীপের অধিকাংশ অঞ্চল বুলগেরিয়া রাজ্যের অধীনে ছিল। এগার শতকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বুলগেরিয়াকে পরাজিত করে। বার শতকে বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনে। কিন্তু চৌদ্দ শতকে অটোমান তুর্কিরা বুলগেরিয়া অধিকার করে। মাত্র উনিশ শতকে বুলগেরিয়া আবার স্বাধীন হয়। বর্তমানে বুলগেরিয়ার জনসংখ্যার অধিকাংশই অবশ্য স্লাভ জাতীয়।

দক্ষিণ-স্লাভদের মধ্যে সার্বিয়ান, ক্রোটিয়ান প্রভৃতি উপজাতি বল্কান উপদ্বীপের মধ্যভাগে সার্বিয়া, ক্রোটিয়া প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন করে। এগার শতকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এ রাজ্যগুলি জয় করে নেয়। বার শতকে সার্বিয়া রাজ্য আবার একটি শক্তিশালী রাজ্যরূপে উদিত হয়। কিন্তু চৌদ্দ শতকে অটোমান তুর্কিরা এ অঞ্চলের সব স্লাভ রাজ্য জয় করে নেয়। সার্বিয়া ও ক্রোটিয়া বর্তমানে যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য।

পূর্ব-স্লাভরা নবম শতাব্দীতে কিয়েভ রুশ রাজ্য গড়ে তোলে। এটাই ছিল প্রথম রুশ রাজ্য। পূর্ব-স্লাভরাই পরবর্তীকালে কেন্দ্রীভূত রাশিয়া রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল।

স্লাভদের বিভিন্ন রাজ্যের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। এ সব কটি রাজ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা এখানে সম্ভব হবে না। ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা কেবল রাশিয়া রাষ্ট্রের ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনা করব। রাশিয়ার ইতিহাস থেকেই অবশ্য স্লাভদের রাজ্য নির্মাণ পদ্ধতি ও তাদের মধ্যে সামন্ত ব্যবস্থার উৎপত্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের রাশিয়ার ইতিহাস

স্লাভদের একটা অংশ ছিল পূর্ব-স্লাভ। এরাই রাশিয়াতে বাসস্থাপন করেছিল—একথা 'মানুষের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ' গ্রন্থে বলা হয়েছে। প্রাচীন কালের স্লাভরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত নতুন পাথর যুগের কৃষি সভ্যতার গণ্ডির ভিতরে আটকে ছিল। খ্রিস্টীয় ছয় শতকে তাদের সমাজে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এর অল্প আগে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল এবং পশ্চিম ইউরোপে তখন ক্রমশ জার্মানদের সামন্ত রাজ্য গড়ে উঠছিল। স্লাভদের জীবন ও সমাজে এর ফলে পরিবর্তন ঘটেছিল। ক্রমশ তারা অনেক নগর ও দুর্গ গড়ে তোলে। নদীর তীরে এবং বাণিজ্যপথগুলির ধারে এ সব নগর গড়ে উঠেছিল। স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ সব বাণিজ্যপথ। নভ্‌গরোদ, কিয়েভ প্রভৃতি শহর ঐ সব বাণিজ্যপথের ধারে নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল।

রাশিয়ার ইতিহাসে নর্মানদেরও কিছু ভূমিকা আছে। লোকশ্রুতি অনুসারে, নভ্‌গরোদের স্থানীয় অধিবাসীরা নর্মানদের ডেকে এনেছিল নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ দূর করার উদ্দেশ্যে। বলা হয়ে থাকে যে, নভ্‌গরোদের প্রথম জার ছিলেন রুরিক। রুরিক ছিলেন নর্মান। ৮৬২ খ্রিস্টাব্দে রুরিকের আগমন ঘটেছিল বলে ধরা হয়ে থাকে। রুরিকের পরবর্তী রাজা ওলেগ (৮৭৯–৯১২ খৃঃ) কিয়েভ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন কিয়েভ ও নভ্‌গরোদ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং কিয়েভ নতুন রাশিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী হয়। পরবর্তী তিনশ বছর ধরে রাশিয়াতে কিয়েভের রাজার প্রাধান্য বজায় ছিল। কালক্রমে কিয়েভের নর্মান রাজ্যাংশ রুশদেশের সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল।

কিয়েভের একজন রাজা ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এ রাজার নাম ভ্লাদিমির। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল রাশিয়ার। ভ্লাদিমির তাই স্বভাবতই বাইজেন্টাইন শাখার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এ খ্রিস্টধর্ম গ্রিক অর্থডক্স চার্চ-ভুক্ত খ্রিস্টধর্ম। ঐ সময় থেকে রাশিয়ার মানুষ বাইজেন্টাইন চার্চ বা গির্জার অনুসারী রয়েছে। তাই রাশিয়া কখনও পশ্চিম ইউরোপে অনুসৃত রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনুসারী হয়নি। এ কারণে মধ্যযুগের ইউরোপের রিফর্মেশন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন রাশিয়ার উপর কোন প্রভাব ফেলেনি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাশিয়ার রাজা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর রাশিয়ার স্লাভরা আদিম প্রকৃতি পূজা পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

কিয়েভ নগরের আধিপত্য বজায় থাকার সময়েই রাশিয়াতে নভ্‌গরোদ এবং মস্কো শহর দুটো ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ সব শহর ছিল এক একজন সামন্ত রাজার রাজধানী। তের শতকে রাশিয়া মঙ্গোল বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল অধিনায়ক খান বাতু কিয়েভ অবরোধ করেন। একই সময়ে 'টিউটনিক নাইট' নামে পরিচিত জার্মান জঙ্গীগোষ্ঠী এবং সুইডেনের রাজা রাশিয়া আক্রমণ করেন। রাশিয়ার নভগরোদ অঞ্চলে রাজা আলেকজান্ডার নেভ্‌স্কি ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সুইডেনের বাহিনীকে এবং ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে টিউটনিক নাইটদের পরাজিত করেন। আলেকজান্ডার নেভ্‌স্কির প্রকৃত নাম আলেকজান্ডার ইয়ারোস্লাভিচ (১২২০–১২৬৩)। নেভা নদীর তীরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে সুইডেনের রাজাকে পরাজিত করার দরুন তিনি নেভ্‌স্কি নামে পরিচিত হন।

রুশরা জার্মান ও সুইডেন আক্রমণকারীদের সহজে পরাজিত করতে পারলেও, মঙ্গোলদের পরাজিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মঙ্গোলরা ১২৪০ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার প্রভু হয়ে বসেছিল। মঙ্গোলরা সরাসরি রাশিয়া দখল করে নেয়নি। তবে রাশিয়ার সব সামন্ত

www.pathagar.com

রাজারা মঙ্গোলদের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। রুশ অঞ্চলের মঙ্গোল সম্রাট ছিলেন খান বাতু। তাঁর সাম্রাজ্য ও সৈন্যবাহিনীর নাম ছিল 'গোল্ডেন হোর্ড'বা 'সোনালি দল'। মঙ্গোলরা রুশ রাজাদের মাধ্যমেই রাশিয়ার উপর কর্তৃত্ব আরোপ করেছিল। রুশ রাজারা তখন মঙ্গোলদের করদ রাজায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁরা মঙ্গোল খানদের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, বিনিময়ে মঙ্গোলদের পক্ষ হয়ে কর সংগ্রহ করার অধিকার পেয়েছিলেন। মঙ্গোলদের পদানত এসব রুশ রাজাদের মধ্যে মঙ্গোলদের কৃপালাভের জন্য রেষারেষির অন্ত ছিল না।

মঙ্গোলদের আধিপত্যর কালেই মস্কোর রাজারা ক্রমশ অন্য রুশ রাজাদের তুলনায় শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। বস্তুত, মঙ্গোল সম্রাটের সহযোগিতায়ই মস্কোর রাজারা শক্তিশালী হয়েছিলেন। বিনিময়ে তাঁরা রুশ প্রজাদের নিকট থেকে উচ্চ হারে কর আদায় করে মঙ্গোল খানদের হাতে তুলে দিতেন।

মঙ্গোলদের আধিপত্যের কালে মস্কোর রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন আলেকজান্ডার নেভ্স্কির ছেলে দানিল আলেকজান্দ্রোভিচ (১২৬১–১৩০৩ খৃঃ)। দানিল বা ডানিয়েল মস্কোর রাজ্য তথা জমিদারির আয়তন বৃদ্ধি করেন। তাঁর ছেলে গ্রেগরিও মস্কো রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেন।

কিছুকাল পরে মস্কো বা মাস্কোভি রাজ্যের রাজা হন ১ম আইভান (রাজত্বকাল ১৩২৮–১৩৪১)। আইভান তাঁর মঙ্গোল প্রভুদের সন্তুষ্ট রেখে মস্কো রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঙ্গোল রাজারা রুশ প্রজাদের উপর এত উৎপীড়ন করতেন এবং এত অসহনীয় করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, রুশরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। অবশ্য মঙ্গোলদের তরফ থেকে রুশ জমিদার ও রাজারাই রুশ জনসাধারণের নিকট থেকে বলপূর্বক কর আদায় করতেন। তবে রুশ জমিদাররাও স্বভাবতই মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উন্মুখ থাকতেন। মঙ্গোল সর্দার তেভার-এর জমিদার আলেকজান্ডারকে (১৩০১–১৩৩৯ খৃঃ) 'রাশিয়ার গ্র্যান্ড প্রিন্স' বা প্রধান জমিদার রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলরা কর আদায় করতে এলে তেভার-এর মানুষরা বিদ্রোহ করে এবং মঙ্গোলদের হত্যা করে। মঙ্গোল সর্দার তখন বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করেন এবং আইভানকে ঐ দলের নেতা নিয়োগ করেন। তেভারকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এর পুরস্কার স্বরূপ আইভানকে পরবর্তী গ্র্যান্ড প্রিন্স রূপে ঘোষণা করা হয় (১৩২৮ খৃঃ)। এভাবে স্বজাতির অন্য রাজাদের দমন করে মস্কোর রাজারা শক্তিবৃদ্ধি করেন। মস্কো তখনই একটি বর্ধিষ্ণু সুন্দর শহর রূপে গড়ে ওঠে।

প্রথম আইভান-এর পর যে রাজারা মস্কো বা মাস্কোভি রাজ্যের অধিপতি হন তাঁরা হলেন : সিমিয়ন (১৩৪১-১৩৫৩ খৃঃ) ২য় আইভান (১৩৫৩-১৩৫৯ খৃঃ), দিমিত্রি (১৩৬২-১৩৮৯ খৃঃ), ১ম বাসিল (১৩৮৯-১৪২৫ খৃঃ) ২য় বাসিল (১৪২৫-১৪৬২ খৃঃ), ৩য় আইভান (১৪৬২-১৫০৫ খৃঃ), ৩য় বাসিল (১৫০৫-১৫৩৩খৃঃ) এবং ৪র্থ আইভান বা ভয়ঙ্কর আইভান (১৫৩৩-১৫৮৪ খৃঃ)। এঁরা সকলেই ক্রমাগত মাস্কোভি বা মস্কো রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেছেন। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল মস্কো নগরী। মাস্কোভি রাজ্য যে সমস্ত রাশিয়াকে নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করছিল, এ প্রবণতাকে রুশ গির্জাও সমর্থন করে। এর ফলে মস্কোর রাজারা তাদের উপাধি পরিবর্তিত করেন এবং নিজেদেরকে শুধুমাত্র 'মস্কোর গ্র্যান্ড ডিউক' না বলে তার সাথে 'সারা রাশিয়ার গ্র্যান্ড ডিউক' উপাধিটিও যোগ করলেন।

মস্কোর রাজাদের শক্তি যত বাড়তে লাগল তাঁরা ততই মঙ্গোলদের অধীনতা থেকে মুক্ত

www.pathagar.com

হওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন। অবশ্য সমস্ত রাশিয়ার মানুষই মঙ্গোলদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। অনেক স্থানেই মঙ্গোল সর্দারদের কর দেওয়া বন্ধ করে দেয় স্থানীয় জনসাধারণ। মস্কোর রাজারা যখন মঙ্গোলদের নির্দেশ অমান্য করতে শুরু করে তখন মঙ্গোল সেনাপতি মামাই ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে মস্কোর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু মস্কোর তৎকালীন রাজা দিমিত্রি আইভানোভিচ মঙ্গোল বাহিনীকে পরিপূর্ণভাবে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধে অন্যান্য রুশ রাজা এবং সাধারণভাবে রুশ জনগণ মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে এবং মস্কোর রাজার পক্ষে একজোট হয়ে লড়াই করেছিলেন। অবশ্য এর পরেও রাশিয়ার উপর মঙ্গোলদের কর্তৃত্ব আরো একশ বছর টিকে ছিল।

তৃতীয় আইভান (রাজত্বকাল ১৪৬২-১৫০৫ খৃঃ)

পনের শতকের শেষ দিকে মঙ্গোলরা ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং মাস্কোভি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তৃতীয় আইভানের রাজত্বকালে (১৪৬২-১৫০৫ খৃঃ) রুশরা মঙ্গোলদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা বন্ধ করে দেয়। ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে রুশরা মঙ্গোলদের কর প্রদান করা বন্ধ করে। ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল রাজা রাশিয়াকে পদানত করার উদ্দেশ্যে বিশাল সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হন। অপর পক্ষে ৩য় আইভানও সুবিশাল রুশ বাহিনী নিয়ে মঙ্গোলদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ওকা নদীর তীরে উপস্থিত হন। কিন্তু মঙ্গোলরা অনেকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেও রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার মতো সাহস অর্জন করতে পারে না। তারপর যুদ্ধ না করেই মঙ্গোল বাহিনী ফিরে যায়। রাশিয়ার উপর মঙ্গোলদের আধিপত্য এ ভাবে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে চিরকালের মতো লোপ পায়।

তৃতীয় আইভান মাস্কোভি রাজ্যের অধীনে বিশাল রুশ দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। তিনি নভ্‌গরোদ শহর এবং তার অধীনস্ত এলাকাসমূহকে মাস্কোভি রাজ্যের অধীনে আনয়ন করেন। রুশ রাজাদের মধ্যে ৩য় আইভানই সর্বপ্রথম নিজেকে জার বা সম্রাট রূপে ঘোষণা করেন। প্রাচীন রোমান সম্রাটদের উপাধি সিজার-এর অনুকরণে তিনি জার উপাধি গ্রহণ করেন। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য তথা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের নিকট থেকে রুশ রাজারা এসকল প্রথা অবগত হয়েছিলেন।

তৃতীয় বাসিল (রাজত্বকাল ১৫০৫-১৫৩৩ খৃঃ)

তৃতীয় আইভানের ছেলে তৃতীয় বাসিল (জন্ম ১৪৭৯ মৃত্যু ১৫৩৩ খৃঃ) ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৃতীয় আইভান তখনও যে দু'একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রুশ রাজ্য অবশিষ্ট ছিল তাদের করায়ত্ত করেন। এ ভাবে পিসকভ ও রায়াজানকে নিজের অধীনে এনে তিনি ঐক্যবদ্ধ রুশ রাজ্যকে অধিকতর সম্পূর্ণতা দান করেন। তিনি স্মলেন্‌স্ক নগরকেও দখল করে নিয়েছিলেন।

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় বাসিলের মৃত্যুকালে তাঁর ছেলে চতুর্থ আইভানের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। চতুর্থ আইভান সাবালকত্ব লাভ করে জারের আসন লাভ করেন আরো চৌদ্দ বছর পরে। এ চৌদ্দ বছরে মাস্কোভি রাষ্ট্র আয়তনে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।

www.pathagar.com

চতুর্থ আইভান বা ভয়ঙ্কর আইভান (রাজত্বকাল ১৫৩৩-১৫৮৪)

তৃতীয় বাসিলের পুত্র চতুর্থ আইভানের জন্ম হয়েছিল ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি তিন বছর বয়সে নাবালক অবস্থায় সিংহাসনের অধিকারী হন। তবে তিনি প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করেন ১৭ বছর বয়সে। যদিও তৃতীয় আইভান সর্বপ্রথম জার উপাধি গ্রহণ করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ আইভানই যথাযোগ্য জাঁকজমকের সাথে গির্জার মাধ্যমে রাজমুকুট গ্রহণ করে নিজেকে 'সকল রাশিয়ার জার' (সম্রাট) রূপে ঘোষণা করেন। চতুর্থ আইভান তাঁর অধীনস্থ সামন্ত রাজা ও জমিদারের ক্ষমতা খর্ব করে কঠোর হাতে নিজের কর্তৃত্ব সারা রুশ রাজ্যের উপর আরোপ করেছিলেন। নির্মম পদ্ধতিতে চতুর্থ আইভান সারা দেশে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তিনি "ভয়ঙ্কর আইভান" নামে পরিচিত হয়েছেন।

চতুর্থ আইভানের আমলে রুশ রাজ্য বিশাল ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হলেও, তার অভ্যন্তরে তখনও আগেকার সামন্ত রাজারা তাঁদের ক্ষমতা নিয়ে বিরাজ করছিলেন। বড় জমিদার বা বয়াররা ছিল সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। অন্যান্য সামন্ত রাজা এবং অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরাও নিজেদেরকে জারের সমগোত্রীয় বলে মনে করতেন। এ রাজা ও বড় জমিদাররা জারের কর্তৃত্বের কাছে মাথা নত করতে সম্মত ছিলেন না। এ জমিদার ও বয়াররা ঐক্যবদ্ধ রুশ রাজ্যের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সম্রাট চতুর্থ আইভান বয়ার ও সামন্ত-রাজাদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য নতুন এক ধরনের জমিদার দলের সহায়তা গ্রহণ করলেন। এ জমিদার বয়ারদের মতো পৈত্রিক সূত্রে জমিদার হতেন না, বরং সম্রাটের নিকট থেকে জমি পেতেন এবং সম্রাটের অনুগত থাকতেন। এঁদের জমির পরিমাণও ছিল কম। এঁরা সম্রাটের উপর নির্ভরশীল ছিলেন কারণ সম্রাট ইচ্ছা করলেই এঁদের জমি ফিরিয়ে নিতে পারতেন। বয়াররা ও সাবেক রাজারা পৈত্রিক সূত্রে জমিদার হতেন বলে সম্রাটের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। আবার তাঁরা বিশাল জমিদারির মালিক বলে শক্তিশালীও ছিলেন। তাঁদের প্রজারা তাঁদেরকেই প্রভু বলে মানতেন, সম্রাটকে নয়।

এ পরিস্থিতি বদলানোর জন্য অর্থাৎ বয়ার ও সামন্ত রাজাদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য সম্রাট ৪র্থ আইভান এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি অকস্মাৎ ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে মস্কো ছেড়ে অল্প দূরে অন্য একস্থানে চলে গেলেন এবং বয়ারদের নিকট ঘোষণা করলেন যে, তিনি আর তাঁদের সম্রাট থাকতে চান না। তার পরিবর্তে তিনি দাবি করলেন যে, রুশ রাজ্যকে দুভাগ করে এক ভাগ তিনি নেবেন অন্যভাগে অন্যকেউ সম্রাট হবেন। তাঁর নিজের অংশের রাজ্যের নাম হল অপ্‌রিচ্‌নিনি? বয়াররা বাধ্য হয়ে এটা মেনে নিলেন। ৪র্থ আইভান নিজের অংশে রাজ্যের সেরা অঞ্চলসমূহ—নগর, বন্দর, নদীনালা বাণিজ্যপথসহ সবকিছু নিয়ে নিলেন এবং অপর অংশে নিজের আজ্ঞাবহ এক ব্যক্তিকে সম্রাট হিসেবে নিযুক্ত করলেন। তারপর তিনি নিজ অংশ থেকে বয়ার ও সামন্ত জমিদারদের উৎখাত করলেন। অন্য অংশেও আসলে ৪র্থ আইভানেরই কর্তৃত্ব বজায় ছিল, কারণ ঐ অঞ্চলের জার-সম্রাট ছিলেন ৪র্থ আইভানেরই আজ্ঞাবহ একব্যক্তি। এভাবে ৪র্থ আইভান তাঁর রাজ্য থেকে বয়ারদের ও সামন্ত জমিদারদের উৎখাত ও শক্তিহীন করলেন। তাঁর আমলে কৃষকরাও তাদের অধিকার হারিয়ে ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। ভূমিদাস হওয়ার অর্থ হল কৃষকরা জমিদারের সম্পত্তিতে পরিণত হল এবং তারা এক জমিদারের এলাকা থেকে অন্য জমিদারের অধীনে যাওয়ার অধিকারও হারালো।

চতুর্থ আইভান যখন রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রাশিয়ার আয়তন সে যুগের হিসাবে বিশাল হলেও এখনকার তুলনায় খুব বেশি ছিল না। বস্তুত ভলগা নদী তখনও রাশিয়ার পূর্ব সীমানার কিছু পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হত। পুরো ভলগা নদীর উপর তখনও রুশ রাজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আবার মঙ্গোলদের 'সোনালী দল' ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর মঙ্গোলরা ভলগার

www.pathagar.com

তীরবর্তী কাজান ও আস্ত্রাখান নগরকে কেন্দ্র করে দুটো রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ আইভান কাজান আক্রমণ করে দখল করে নেন। তার চার বছর পর তিনি আস্ত্রাখান রাজ্যও অধিকার করেন। এভাবে সম্পূর্ণ ভলগা অববাহিকা রুশ সম্রাটের করায়ত্ত হয়। দক্ষিণ দিকে রাশিয়ার অধিকার কেশাস পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু উরাল পর্বতের পূর্বদিকে সাইবেরিয়াতে ছিল মঙ্গোল সরদার খান কুচুমের রাজ্য। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট চতুর্থ আইভানের আদেশে ঐ অঞ্চলের রুশরা পশ্চিম সাইবেরিয়া অধিকার করার চেষ্টা করে এবং আংশিকভাবে সফল হয়। (পূর্ব সাইবেরিয়া পরবর্তীকালে সতের শতকে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল)

পরবর্তী সম্রাটগণ

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৪র্থ আইভানের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ফিয়োদর জার হন। কিন্তু ফিয়োদর দুর্বল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাই রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন তাঁর এক আত্মীয় বরিস গদুনভ্। বরিস যোগ্য শাসক ছিলেন এবং তিনি ৪র্থ আইভানের নীতিই অনুসরণ করেন। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফিয়োদর-এর মৃত্যু হলে বরিস গদুনভ্ই জার হন। বরিসও সম্রাট ৪র্থ আইভানের মতো বয়ারদের ক্ষমতা খর্ব করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু বরিস ফিয়োদর-এর বৈধ উত্তরাধিকারী ছিলেন না বলে বয়াররা অন্য একজনকে জাল উত্তরাধিকারী সাজিয়ে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেন। এরমধ্যে. ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে বরিসের মৃত্যু ঘটলে ভাসিলি শুইস্কি নামে একজন প্রভাবশালী বয়ার জারের পদে আসীন হন। তিনি ১৬০৬ থেকে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এভাবে মাস্কোভির প্রাচীন রাজবংশ এক প্রকার লুপ্ত হয়ে যায়।

ভাসিলি শুইস্কি বয়ারদের শক্তি খর্ব করবেন না বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে বয়ারদের শক্তি আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ততদিনে রাজার অনুগত ক্ষুদ্র জমিদাররা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে বয়ার এবং ক্ষুদ্র জমিদাররা একযোগে ভাসিলিকে সিংহাসনচ্যুত করেন। এরপর তিন বছর মস্কোর সিংহাসন শূন্য থাকে এবং ১৬১০ থেকে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ায় ঘোর অরাজকতা বিরাজ করে।

অশান্তি ও অরাজকতার কাল (১৬১০-১৬১৩খৃঃ)

১৬১০ থেকে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অশান্তি ও অরাজকতার কাল নামে অভিহিত করা হলেও রাশিয়াতে দুঃখ, দুর্দশা ও অশান্তি অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল। ফিওদর-এর রাজত্বকালেই (১৫৮৪-১৫৯৮ খৃঃ) দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকরা বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিল। বরিস গদুনভ্ -এর রাজত্বকালে (১৫৯৮-১৬০৫খৃঃ) রাশিয়াতে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী কৃষকরা মস্কোর বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। বিদ্রোহ দমন করতে অপারক হয়ে জার ভাসিলি শুইস্কি সুইডেনের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুইডেনের সৈন্য এসে নভ্গরোদ প্রদেশ অধিকার করে। সুইডেনের শত্রু পোল্যান্ড এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাশিয়া আক্রমণ করে। ফলে রাশিয়ার বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের কবলিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ অবস্থায় রাশিয়ায় জাতীয় ভাবধারা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং মস্কো থেকে পোল্যান্ডের সৈন্যদের বিতাড়িত করা হয়। অবশেষে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে মস্কোতে নতুন রুশ সম্রাটরূপে মাইকেল রোমানভকে জারের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। মাইকেল রোমানভ দিলেন রাশিয়ার শেষ রাজবংশ রোমনভ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট। এ রোমানভ রাজবংশ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রোমানভ আমলের ইতিহাস আধুনিক যুগের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের চীনের ইতিহাস

চীনের ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগ ও মধ্য যুগের মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন। চীনে প্রাচীন যুগের শেষ দিকে হান রাজবংশের অবসান ঘটেছিল (২২০ খ্রিস্টাব্দে)– এ কথা 'মানুষের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ' গ্রন্থে বলা হয়েছে। হান বংশের পতনের পর চীনে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। এ সময় অর্থাৎ তিনের এবং চারের শতকে চীনে সামন্ততন্ত্রের উদয় ঘটতে শুরু করেছিল। চীনে নতুন করে কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথমে সুই রাজবংশের আমলে (৫৮৯–৬১৮ খৃঃ) এবং তারপর তাং রাজবংশের আমলে (৬১৮–৯০৭ খৃঃ)। এ আমলে চীনে সামন্ততন্ত্রের বিস্তার ঘটেছিল।

বিশ্ব ইতিহাস এবং ইউরোপের ইতিহাসের সাথে সঙ্গতি রেখে হিসাব করলে বলতে হয় যে, চীনে মধ্যযুগের শুরু হয়েছিল সুই রাজবংশের আরম্ভকাল (৫৮৯ খৃঃ) এবং তাং রাজবংশের আরম্ভকাল (৬১৮খৃঃ) থেকে; কারণ ঐ সময় চীনে সামন্ততন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল এবং আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সামন্ততন্ত্রকে মধ্যযুগের একটা প্রধান লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়। আবার চীনে মধ্যযুগের শেষ কখন হয়েছিল সে বিষয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে যখন মিং যুগের অবসান এবং মাঞ্চু রাজবংশের আগমন ঘটে, তারপরেও চীনে সামন্ততন্ত্র টিকে ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মাঞ্চু রাজবংশের পতনের কাল পর্যন্ত চীনে সামন্ততন্ত্র প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। এ হিসাবে বলা চলে যে, চীনে ৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, অনেক ঐতিহাসিক মিং বংশের পতনের কালকে অর্থাৎ ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দকে মধ্যযুগের অবসান কালরূপে গণ্য করেন। এর কারণ হচ্ছে, বিশ্ব পরিসরে তখন মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের আগমন ঘটেছে। মিং যুগের শেষ পর্যায়ে পনের শতকের মধ্যভাগ থেকেই চীনে আধুনিক যুগের ইউরোপীয়দের যাতায়াত ও বসবাস শুরু হয়েছিল? সে কারণে ষোল শতকেই চীন বিশ্ব পর্যায়ের আধুনিক যুগের সাথে পরিচিত হয়।

আমরা মনে করি, চীনে চারের শতক থেকে অথবা সুই রাজবংশের শুরু (৫৮৯ খৃঃ) থেকে মাঞ্চু রাজবংশের পতনের কাল (১৯১১ খৃঃ) পর্যন্ত মধ্যযুগ বিদ্যমান ছিল। তথাপি বর্তমান গ্রন্থে আমরা মিং রাজবংশের অবসান কাল (১৬৪৪ খৃঃ) পর্যন্ত চীনের ইতিহাস বিবৃত করব। ১৬৪৪ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ইতিহাসও চীনের দিক থেকে বিচার করলে মধ্যযুগের অন্তর্গত। তথাপি এ সময়ের ইতিহাস বিশ্ব ইতিহাসের আধুনিক যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে ১৬৪৪ খৃঃ থেকে ১৯১০ খৃঃ পর্যন্ত কালের চীনের ইতিহাস এ গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে অর্থাৎ 'মানুষের ইতিহাস : আধুনিক যুগ' গ্রন্থে বিবৃত হবে।

চীনে মধ্যযুগ : ৫৮৯–১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ/১৯১০ খ্রিস্টাব্দ

সুই রাজবংশ (৫৮৯–৬১৮ খ্রিঃ)

চীনে সাড়ে তিনশ বছর স্থায়ী বিভেদ ও অরাজকতার পরে চীন ৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে আবার সুই রাজবংশের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। সুই রাজবংশ অবশ্য স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। এর পর ৬১৮ খ্রিস্টাব্দে চীনে তাং রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

তাং আমল (৬১৮–৯০৬ খ্রিঃ)

দুর্বল সুই রাজবংশকে উৎখাত করে তাং-এর জমিদার ৬১৮ খ্রিস্টাব্দে তাং রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। নয় বছর পরে তিনি তাঁর মেজ ছেলের হাতে সিংহাসনের দায়িত্বভার তুলে দেন।

এ ছেলে তাইৎসুং নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তাইৎসুং (৬২৭–৬৫০ খ্রিঃ)

তাইৎসুং ছিলেন চীনের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের মধ্যে একজন। তিনি একজন বড় যোদ্ধাও ছিলেন। তিনি তুর্কি আক্রমণকারীদের পরাজিত করেন এবং হান সাম্রাজ্যের পতনের পরে যে সব অঞ্চল স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল সে সব অঞ্চল পুনরায় অধিকার করেন। তাইৎসুং এরপর দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোনিবেশ করেন। জ্ঞানের বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি কনফুসিয়াস প্রণীত তেরটি সুগ্রন্থ (থারটিন ক্লাসিকস্) প্রকাশ করেন। তিনি ইতিহাস অধ্যয়নের উপকারিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, 'আয়নায় প্রতিফলন দেখে যেমনভাবে মাথার পাগড়িকে ঠিকমতো বসান যায়, তেমনিভাবে অতীতের ইতিহাসকে আয়না রূপে ব্যবহার করে ভাবীকালের সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন সম্পর্কে আগে থেকেই জানা যায়'। তাইৎসুং অপরাধ বিদ্যার বিকাশ সাধন করেছিলেন। একবার ২৯০ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীকে তিনি দূরাঞ্চলে ফসল কাটার জন্য প্রেরণ করেন এবং কাজ শেষ করে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। এরা সকলেই স্বেচ্ছায় ফিরে এলে তিনি তাদের মুক্তিদান করেন এবং নিয়ম করেন যে-কোনো সম্রাট কখনই তিন দিন উপবাস না করে কোন মৃত্যুদণ্ডকে অনুমোদন করবেন না। কোনো প্রজা যাতে সাময়িক ক্রোধের শিকার না হয় সে উদ্দেশ্যেই এ নিয়ম করা হয়েছিল।

তাইৎসুং কনফুসিয়াসের দর্শনের উপর আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতিও উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং অন্য ধর্মের প্রজাদের চীনে এসে তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে বা তার দু'এক বছর পরে নেস্টোরিয়ান সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানরা চীনে আসে। ঐ সময়েই মুসলমান ধর্মপ্রচারকরা চীনে গিয়ে অনেক চীনা নাগরিককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। চীনে ঠিক কোন বছরে বা কোন পথ দিয়ে প্রথম মুসলিমরা গমন করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে, সপ্তম শতকের শুরুতে সমুদ্রপথে মুসলমানরা চীনে গমন করতে শুরু করেছিলেন। এরকম অনুমানের কারণ হচ্ছে, ঐ সময় অর্থাৎ তাং যুগের শুরুতে, আরব বণিকরাই চীনের সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক বড় অংশকে নিয়ন্ত্রিত করত। প্রকৃত প্রস্তাবে, চীনের রাজধানী ক্যান্টন শহরে তখন আরবরাই ছিল বিদেশীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। এমনকি ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে আরব থেকে দূত এসেছিলেন চীনের রাজধানীতে। আধুনিক কালেও পিকিং-এ ১৫টি মসজিদ ছিল। ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে তাইৎসুং-এর প্রজ্ঞা ও সহনশীল নীতির প্রশংসা করে থাকেন।

তাং আমলের প্রশাসন ব্যবস্থা

তাইৎসুং চীনের প্রশাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছিলেন। অচৈনিক জাতিসমূহ যাতে নিজেদের রাজাকে নিজেদের শাসক হিসাবে রাখতে পারে তিনি তার ব্যবস্থা করেছিলেন। চীনা অধ্যুষিত অঞ্চলকে তিনি রাজকর্মচারীর দল তথা আমলাদের সাহায্যে শাসন করতেন। কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজকর্মচারীদের সংগ্রহ ও নিয়োগ করা হত। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ছিল।

www.pathagar.com

কোনো বিদ্যাহীন ব্যক্তি যদি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতেন তবে সম্রাট তাঁকে উচ্চ পদে বহাল করতে দ্বিধা করতেন না।

তাইৎসুং তাঁর সাম্রাজ্যকে ১৫টি তাও বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলোকে আবার চাউ বা বিভাগে ভাগ করেন। এসকল প্রশাসনিক বিভাগের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করতেন রাজকর্মচারীরা। আবার খরা, বন্যা প্রভৃতি বিশেষ সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য সম্রাটের প্রতিনিধি সরাসরি নিযুক্ত হতেন।

বিভাগগুলোকে পুনরায় জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার তথা সম্রাট তাই সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলের সংবাদ রাখতে পারতেন। এরকম প্রশাসন ব্যবস্থা স্বভাবতই ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত এবং এর পরিচালনার জন্য প্রচুর পরিমাণে সরকারি কর্মচারী প্রয়োজন হত। রাজধানীতে অবস্থিত রাজকীয় মহাবিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিদ্বান ও পণ্ডিতদের মধ্য থেকে বাছাই করে রাজকর্মচারীদের সংগ্রহ করা হত। এ আমলাতন্ত্রকে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার বিস্তার সাধন করা হয়েছিল।

সম্রাটকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য একটি পরামর্শদাতা পরিষদ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ অভিজাত কর্মচারী ছাড়াও এ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কর্মকর্তারা। এ বিভাগগুলো হল: সরকারি আমলাতন্ত্র, অর্থ ও কর, ধর্মকর্ম, প্রতিরক্ষা, শান্তিবিধান (ও অপরাধসংক্রান্ত আইন), এবং গণপূর্ত বিভাগ। জেলাসমূহে অবস্থানরত কর্মচারীরা এ সকল বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তাদের কাছে সরাসরি প্রতিবেদন ও খবর পাঠাতেন। জেলার প্রধান কর্তা তাঁর এলাকার গ্রামসমূহের তদারকি করতেন। তাঁর তিনটি কর্তব্য ছিল : খাজনা আদায়, পূর্ত কর্মের তদারকি ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

কর সংগ্রহ ব্যবস্থা

কর সংগ্রহের প্রধান উৎস ছিল কৃষিজ উৎপাদন। কৃষিকাজের সুব্যবস্থাপনায় তাই সরকার আগ্রহী ছিল। নগরবাসী ও সরকারি কর্মচারীদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট জনসাধারণকে বয়স অনুসারে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ১৮ বছরের বেশি বয়সের বালক ও বয়স্কদের চাষের জমি দেয়া হত। তারা রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে জমি চাষ করত। প্রজাদের দুটো কর্তব্য পালন করতে হত–খাজনা প্রদান ও বেগার খাটা। কর বা খাজনা হিসাবে দিতে হত চাল, রেশম, কাপড় বা রুপা আর রাষ্ট্রের কাজে বছরে ২০ দিন বেগার খাটতে হত। যে বছর ফসল হানি ঘটত সে বছর সরকার খাজনা মকুব করত।

জমির পরিমাপ করা হত মু'র মাপে! দৈর্ঘ্যে ১ কদম আর প্রস্থে ২৪০ কদম —এই ছিল ১ মু-এর মাপ। এরকম ১০০ মু-কে বলা হত চিং। একজন বয়স্ক কৃষককে ১ চিং পরিমাণ জমি চাষের জন্য দেওয়া হত। শহরের বণিকরা শহরে তাদের যে সম্পত্তি থাকত সে অনুপাতে কর প্রদান করত। শহরে কুলি-মজুররা কোন কর দিত না কারণ তাদের কোন সম্পত্তি ছিল না।

কর হিসাবে যে শস্য কৃষকরা দিত সেই শস্যকে শেষ পর্যন্ত রাজধানী চানগান-এ নিয়ে যাওয়া হত। নদীপথে অনেক ছোট ছোট জলপ্রপাত বেয়ে রাজধানীতে পৌঁছাতে হত। এ অসুবিধার জন্যই হয়তো তাং আমলের পরে রাজধানী হিসাবে চানগান শহরটি পরিত্যক্ত হয়। লোহা, নুন, মুদ্রা তৈরি এবং পরবর্তীকালে তামার উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। এ থেকে রাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ কর সংগ্রহ করত। ধান, মদ এবং চায়ের উপরও কর আরোপিত হয়েছিল। তাং আমলে সরকারি কাজকর্ম দক্ষতার সাথে পরিচালিত হত এবং জনসাধারণও সন্তুষ্ট ছিল।

www.pathagar.com

তাং আমলের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ

তাইৎসুং ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে চীন বিষয়-সম্পদে এবং মননশীলতার দিক দিয়ে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে। চীন ঐ যুগে প্রচুর পরিমাণে চাল, রেশম, শস্য ও মশলা রপ্তানি করত।

নাটক ও সাহিত্য

তাইৎসুং নাটক ও অভিনয়কে উৎসাহিত করতেন। ঐ যুগে সাহিত্যচর্চার রেওয়াজ ছিল। তখন প্রায় সব মানুষই কবিতা লিখতেন বলে পণ্ডিতরা বলে থাকেন। তাং আমলে রাজকীয় গ্রন্থাগারে ৫৪ হাজার বই ছিল। তখন রাজধানী শহরে জ্ঞানচর্চা, সাহিত্যচর্চা, শিল্পচর্চা অব্যাহত ছিল। অবশ্য পল্লীবাসী কৃষকরা জমি চাষ করে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করত এবং চীনের সনাতন ঐতিহ্য অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলত।

শিল্পকলা

তাং যুগে চীনে চিত্রশিল্পের উন্নতি ঘটেছিল। এযুগের চিত্রকলায় ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতির প্রভাব পড়েছিল। তবে এযুগে বিশিষ্ট চীনা রীতির শিল্পকলায়ও বিকাশ ঘটেছিল। তাং যুগের ভাস্কর্যেরও বিকাশ ঘটেছিল। এযুগে এত সুন্দর মাটির পাত্র ও চীনামাটির পাত্র নির্মিত হত যে, সমসাময়িক কবিরা তাঁদের কবিতায় এসকল পাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

মুদ্রণ কৌশলের আবিষ্কার

তাং যুগের একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার হল মুদ্রণ পদ্ধতির আবিষ্কার। বৌদ্ধ পুরোহিতরা এ আবিষ্কারের পশ্চাতে মূল প্রেরণা সঞ্চারকারী শক্তি রূপে কাজ করেছেন বলে মনে হয়। সম্ভবত আটের শতকের প্রথম ভাগে কাঠ খোদাই করে তার থেকে ছাপ দিয়ে লেখা ছাপানোর কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল। চীনা ভাষায় এক ধরনের চিত্রলিপি ব্যবহৃত হত বলে তাদের পক্ষে কাঠের বা ধাতুর ব্লক থেকে ছাপানোই বিশেষ উপযোগী ছিল। চীনে যে প্রাচীনতম ছাপানো বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে তার নাম 'হীরক সূত্র'। ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে তারিখে এটি ছাপানো হয়েছিল। তবে তার আগের একটি ছাপানো পৃষ্ঠার নমুনা জাপান থেকে পাওয়া গেছে। ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে সেটি ছাপানো হয়েছিল। ঐ সময়েই সম্ভবত চীন থেকে জাপানে মুদ্রণ পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছিল।

বই ছাপানো ছাড়াও চীনে দশের শতকে কাগজের নোট এবং খেলার তাস ছাপানোর প্রক্রিয়ায় প্রচলন ঘটে। চৌদ্দ শতকে চীন থেকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ইউরোপে খেলার তাসের বিস্তার ঘটে। চৌদ্দ অথবা পনের শতকে চীন বা কোরিয়াতে পৃথক পৃথক অক্ষর সাজিয়ে বই ছাপানোর পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল। ইউরোপে জার্মান আবিষ্কারক গুটেনবার্গ ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে পৃথক পৃথক অক্ষর সাজিয়ে বই ছাপানোর কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন বলে কথিত আছে। গুটেনবার্গ হয়তো বই ছাপানোর এ পদ্ধতি সম্পর্কে চীন বা কোরিয়া থেকে পরোক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজবংশ (৯০৬-৯৬০খৃঃ)

তাং রাজবংশের পতন ঘটে ৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। তারপর চীনে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দেয় এবং বৈদেশিক আক্রমণও ঘটতে শুরু করে। এ সময়ে চীন খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে এবং চীনের বিভিন্ন অংশে সামরিক নেতারা ক্ষমতা দখল করে। ৯০৬ থেকে ৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একে একে

www.pathagar.com

পাঁচটি রাজবংশ চীনে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে কিন্তু এসকল প্রচেষ্টা স্থায়ী হয়নি। কারণ ঐ রাজবংশগুলো ছিল খুবই দুর্বল। ঐ সময়ে চীনের উত্তর ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত দিয়ে খিতান তাতার ও অন্যান্য বর্বর জাতি দলে দলে প্রবেশ করে চীন সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে। অবশেষে ৯৬০ খ্রিস্টাব্দে সুং রাজবংশ নামে একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চীনে অরাজকতা দূর হয়।

সুং রাজবংশ (৯৬০-১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ)

সুং কোন রাজার নাম নয়, এটি হোনান প্রদেশের একটি ছোট এলাকার নাম। এ বংশের প্রথম রাজা সুং অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন।

একজন সামরিক সেনাপতি এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সুং রাজবংশের প্রথম রাজা ১৬ বছর রাজত্ব করে ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে পরবর্তী রাজা তিন বছরের মধ্যে সমগ্র চীনকে সুং রাজবংশের অধীনে আনয়ন করেন। সুং সম্রাটদের একটা প্রধান সমস্যা ছিল বৈদেশিক আক্রমণ তথা যুদ্ধবাজ বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা। সুং সম্রাটরা দুই প্রকারে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন : যুদ্ধ করে অথবা ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়ে অর্থাৎ উৎকোচ দিয়ে।

৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সুং রাজবংশের যে নতুন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনিই বর্বর তাতারদের উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট করার কুপ্রথার প্রবর্তন করেন। তাতাররা প্রথমে খিতান তাতার নামে পরিচিত ছিল। খিতানরা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় রাজ্য স্থাপন করেছিল। খিতান শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল ক্যাথে 'Cathay' শব্দটি। মধ্যযুগে ইউরোপে চীনদেশ 'ক্যাথে' নামেই পরিচিত হয়েছিল। খিতান তাতাররা কালক্রমে লিয়াও তাতার বা লৌহ তাতার নামে পরিচিত হয়। উপঢৌকন দিয়ে বর্বরদের সন্তুষ্ট রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দিন দিন তাদের দাবি বাড়তেই থাকে। ১০৪৩ সালে চীন প্রতি বছর তাতারদের আড়াই লক্ষ আউন্স (প্রায় সোয়া ছয় লক্ষ ভরি বা ৬৮০০ কেজি) রুপা এবং আড়াই লক্ষ খণ্ড সিল্কের কাপড় ও চায়ের বাক্স উপহার দিতে স্বীকৃত হয়।

বার শতকে সুং রাজবংশের একদল সম্রাট যিন তাতার বা সোনার তাতার নামক অন্য একজন বর্বর জাতির সাহায্যে লৌহ তাতারদের উৎখাত করার চেষ্টা করেন। যিন তাতাররা লিয়াও তাতারদের উৎখাত করল ঠিকই কিন্তু তার পরই তারা সুং রাজ্যের দিকে হাত বাড়াল। এর ফলে ১১২৭ খ্রিস্টাব্দের পর ইয়াংসি নদীর উত্তরাংশ সুং সম্রাটদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল; যিন তাতাররা ঐ রাজ্য দখল করল। যে সুং সম্রাট যিন তাতারদের ভাড়া করে এনেছিলেন তাঁর ছেলে উত্তরের রাজ্য হারিয়ে দক্ষিণে নানকিং নামক স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। কিছুকাল পরে হ্যাং-চাও এ স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী একশ বছর চীনে প্রকৃতপক্ষে দুটো সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল–উত্তরে যিন তাতারদের রাজ্য, দক্ষিণে সুং সম্রাটদের রাজ্য। এরপর তের শতকে তাতারদের অন্য একটা শাখা উত্তর ও দক্ষিণ চীন অধিকার করে। তাতারদের এ শাখাটা মঙ্গোল নামে পরিচিত হয়েছে।

মঙ্গোল-তাতারদের নেতা ছিলেন চেঙ্গিস খান (১১৫৫-১২২৭)। যিন-তাতারদের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে মঙ্গোল নাম ধারণ করে। চেঙ্গিস খান বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করে সমগ্র মঙ্গোলদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং নিজের অসাধারণ সামরিক প্রতিভার বলে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মঙ্গোলিয়ার সমস্ত অঞ্চল ও অধিবাসীদের নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। অল্পকালের মধ্যেই চেঙ্গিস খানের ভয়ঙ্কর নৃশংস রূপ আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে তিনি যিন তাতারদের বিতাড়িত করে

www.pathagar.com

উত্তর চীন আক্রমণ করেন এবং ১২১৪ খ্রিস্টাব্দে পিকিং আক্রমণ করে সেখানকার নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করেন। চেঙ্গিস খান এরপর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মধ্য এশিয়া, রাশিয়া, প্রভৃতি দেশ আক্রমণ করেন এবং ইউরোপের দানিয়ুব নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খানের মৃত্যু হয় কিন্তু মঙ্গোল অভিযান অব্যাহত থাকে। কালক্রমে মঙ্গোল বিজয়ের ভিত্তিতে চীন থেকে ইউরোপের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। মঙ্গোলদের সাম্রাজ্য স্থাপনের বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

চেঙ্গিস খানের অনুচররা চীন বিজয়ের কাজ সমাপ্ত করেন। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর অন্যান্য মঙ্গোল নেতারা প্রথমে উত্তর চীন সাম্রাজ্য তথা যিন-সাম্রাজ্য এবং তারপর দক্ষিণ চীন সাম্রাজ্য অধিকার করেন। চেঙ্গিস খানের নাতি কুবলাই খান ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে সুং সম্রাটকে পরাজিত করেন কিন্তু শেষ সুং সম্রাটকে উৎখাত করতে আরো কুড়ি বছর লেগেছিল। এভাবে ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে সুং রাজবংশের অবসান ঘটে এবং চীনে মঙ্গোলদের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। কুবলাই খান ছিলেন সমগ্র চীন সাম্রাজ্যের প্রথম মঙ্গোল বংশীয় সম্রাট।

সুং যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

সুং যুগে চীন অনেক রাজনৈতিক দুর্বিপাকের শিকার হলেও এ যুগে চীনে শিল্প সাহিত্যেও দর্শনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল।

দর্শন

সুং যুগের দর্শনকে নব-কনফুসিয়াসবাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। নতুন দর্শনে কনফুসিয়াসের দর্শনের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের কোনো কোনো দার্শনিক চিন্তাকে যুক্ত করা হয়েছিল। কনফুসিয়াসের দর্শন ছিল প্রকৃতপক্ষে নৈতিক দর্শন–প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উপযোগী নীতিমালা এ দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কালক্রমে, কনফুসিয়াসের অনুসারীরা বিশ্বজগতের নিয়ম সম্পর্কেও অভিমত প্রদান করতে শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব জগতের নিয়ম সম্পর্কে বুদ্ধের দর্শনকেই কনফুসিয়াসের দর্শনের সাথে সংযুক্ত করে নব-কনফুসীয় দর্শন নির্মাণ করা হয়েছিল।

চিত্রকলা

সুং যুগে চীনে চিত্রশিল্প অভূতপূর্ব বিকাশ লাভ করেছিল। সম্রাট হুইসুং (রাজত্বকাল ১১০১–১১২৬ খৃঃ) নিজে একজন উঁচু মানের চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি প্রায় পাঁচ হাজার চিত্রকর্ম সংগ্রহও করেছিলেন কিন্তু তাতাররা সেগুলো ধ্বংস করেছিল। সুং যুগের প্রায় ৮০০ চিত্রশিল্পীর নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

চীনের চিত্রশিল্পীরা রেশমের কাপড়ের উপর কালি দিয়ে ছবি আঁকতেন। দীর্ঘদিনের সাধনার দ্বারা এ কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হত। চীনা শিল্পীরা বাস্তবধর্মী ছবি আঁকতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, কোনো দৃশ্য দেখে তা আঁকলে ঐ ছবিতে অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী বাস্তবতার প্রকাশ ঘটে। কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে হলে শিল্পী দিনের পর দিন ঐ দৃশ্য দেখতেন এবং ঐ বিষয়ে চিন্তা করতেন। তারপর শিল্পীর মনের মধ্যে ঐ দৃশ্য সম্পর্কে যে স্থায়ী ছাপ পড়ত সে ভিত্তিতে তাঁরা ছবি আঁকতেন। চীনা শিল্পীরা মনে করতেন যে, এভাবে ছবি আঁকলে তাতে প্রকৃতির স্থায়ী রূপের প্রকাশ ঘটে।

www.pathagar.com

দার্শনিক ওয়াং আন-শি (১০২১-১০৮৬ খৃঃ)

সুং যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এ আমলে চীনের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও সমাজবাদী রাজনীতিবিদ ওয়াং আন-শি'র উদয় ঘটেছিল। ওয়াং আন-শি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি যাবতীয় বই পড়া শেষ করে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা গড়ে তোলেন এবং চীনে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মানসে চীনের প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ও অর্থহীন রীতিনীতি বাতিল করার পরিকল্পনা করেন। ১০৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্রাটের পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হন। তখন তিনি তাঁর চিন্তা ও ধারণাসমূহকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। ওয়াং আন-শি বলেন যে, প্রজাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা রাজার দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালন করতে হলে সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষিকাজের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে; তা না হলে ধনীদের অত্যাচারে কৃষক-মজুররা নিষ্পিষ্ট হবে। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটানোর প্রথাকে বন্ধ করেন এবং বৃদ্ধ, দরিদ্র ও বেকারদের জন্য ভাতা প্রদানের পরিকল্পনা করেন। তিনি বন্যা রোধ করার জন্য কারিগরি প্রকল্পের উদ্ভাবন করেন। চীনের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন করেন। তিনি সব জেলায় মজুরি ও জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কমিটি নিয়োগ করেন। তিনি ধনীদের কর প্রদান করতে বাধ্য করেন এবং গরিবদের কর প্রদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

ওয়াং আন-শি'র এ সকল অসাধারণ প্রকল্পসমূহ অবশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে নি। ধনীদের বাধা, প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারা এবং অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রভৃতি কারণেই তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তবে, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রায় এক হাজার বছর আগে ওয়াং আন-শি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ পরিচালনার কথা ভাবতে পেরেছিলেন।

ইউয়ান বা মঙ্গোল রাজবংশ (১২৭৯-১৩৬৮ খৃঃ)

১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল নেতা কুবলাই খান চীনের সম্রাট হন। তাঁর স্থাপিত রাজবংশ ইউয়ান বা মঙ্গোল রাজবংশ রূপে পরিচিত হয়েছে। কুবলাই খান বেইজিং বা পিকিং-এ চীনের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

তের শতকে ইতালির বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলো তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের সাথে ভেনিস থেকে চীনে গিয়েছিলেন। মার্কো পোলো চীন সম্রাট কুবলাই খানের রাজসভায় দীর্ঘকাল থেকেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে কুবলাই খানের রাজত্ব কালের অনেক ঘটনা ও তৎকালীন চীনের অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে।

কুবলাই খান সুং সম্রাটকে ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত করে চীনের সম্রাট হয়েছিলেন। কিন্তু সর্বশেষ সুং সম্রাটকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে আরো কুড়ি বছর লেগেছিল। এ কারণে ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে কুবলাই খানের রাজত্বকাল গণনা করা হয়।

মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, কুবলাই খান একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁর আমলে মঙ্গোলদের রাজ্য পূর্ব দিকে চীন থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে সমস্ত মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কুবলাই খান চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতার মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং চীনের সভ্যতার বিকাশ সাধনে কিছু পরিমাণে অবদানও রেখেছিলেন। তিনি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পঞ্জিকার সংস্কার করেছিলেন, উদ্বৃত্ত খাদ্য সংরক্ষণের জন্য শস্যের গুদাম নির্মাণ করেছিলেন এবং অসুস্থ, অনাথ ও বৃদ্ধ পণ্ডিতদের সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করেছিলেন। কুবলাই খান ছিলেন একই

www.pathagar.com

কালে চীনের সম্রাট ও মঙ্গোলদের নেতা। তাঁর আমলে যে ইতালির বণিক ও পরিব্রাজক মার্কো পোলো নির্বিঘ্নে কৃষ্ণসাগর থেকে পিকিং পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন এবং সেখান থেকে নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছিলেন, এ থেকে বোঝা যায় যে বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কুবলাই খান সক্ষম হয়েছিলেন।

কুবলাই খানের আমলে চীনের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিরও বিকাশ সাধিত হয়েছিল। তাং যুগের সম্রাট তাইৎসুং (Tai Tsung) কে চীনের নাট্যশিল্পের আদি পৃষ্ঠপোষক রূপে গণ্য করা হয় এবং কথাটা সঠিকও বটে। তথাপি, এ কথাও সত্যি যে, কুবলাই খানের ইউয়ান বা মঙ্গোল রাজবংশের আমলেই চীনে নাটক একটি শিল্পরূপ হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মঙ্গোল আমলে চীনে উপন্যাসেরও প্রচলন ঘটেছিল, যদিও চীনের গুণীজনরা উপন্যাসকে উৎকৃষ্ট শিল্পরূপ বলে গণ্য করতেন না।

মঙ্গোল রাজবংশের অবসান

কুবলাই খানের মৃত্যুর পর ইউয়ান তথা মঙ্গোল রাজবংশের শক্তির অবসান ঘটে। কুবলাই খানের পরবর্তী মঙ্গোল শাসকরা ছিলেন দুর্বল ও অক্ষম। তা ছাড়া চীন দেশে চৈনিকরা ছিল মঙ্গোলদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি এবং বিদেশী মঙ্গোলদের তাঁরা অপছন্দও করত। অবশেষে ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে একজন বিদ্রোহী চীনা নেতা চীন থেকে মঙ্গোল রাজবংশকে উৎখাত করে সেখানে মিং রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মিং রাজবংশ (১৩৬৮-১৬৪৪ খৃঃ)

চৌদ্দ শতকে মঙ্গোল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে চীনের জনগণের দীর্ঘদিনের অসন্তোষের প্রকাশ ঘটতে শুরু করে। চীনের মানুষ কখনই ভুলতে পারেনি যে, বর্বর মঙ্গোল জাতি সুসভ্য চীন জাতিকে পদানত করে রেখেছিল। চীনের জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব জাগ্রত হওয়ার পর একজন সাবেক বৌদ্ধ পুরোহিত বিদ্রোহে নেতৃত্বদান করেন এবং ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে পিকিং দখল করে মঙ্গোল শাসনের অবসান ঘটান। এই সাবেক পুরোহিতই মিং বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীনে মিং রাজবংশের শাসন স্থায়ী হয়েছিল।

চীনে যখন মিং রাজত্বের একশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, ইউরোপে তখন মধ্যযুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটছে। চীনের সম্রাট ও জনগণ যখন নিজেদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়েই মগ্ন ছিল তখন ইউরোপের মানুষ এশিয়ার জলপথ আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রচেষ্টার ফলেই স্পেনের রাজার পক্ষ হয়ে কলম্বাস ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের জলপথ খুঁজতে গিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন এবং ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার করেন। কালক্রমে পর্তুগিজরা চীনেও গিয়ে পৌঁছেছিল।

মিং আমলে চীন বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির সংস্পর্শে আসে। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে একটি পর্তুগিজ জাহাজ ক্যান্টন বন্দরে পৌঁছে। চীনে এর আগে শত শত বছর ধরে পারসিক ও আরব বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। চীন প্রথমে পর্তুগিজদেরও ঐ রকম সুযোগ ও অধিকার প্রদান করেছিল। কিন্তু পর্তুগিজরা বাণিজ্য করার পরিবর্তে লুটতরাজ ও দাস সংগ্রহে মন দেয়। তখন চীনের উপকূলে পর্তুগিজদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। কিছুকাল পরে ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের ক্যান্টন খাঁড়ির ভিতরের ম্যাকাও উপদ্বীপে ব্যবসা করার অধিকার দেয়া হয়।

www.pathagar.com

১৫৫২ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইউরোপের জেসুইট পাদ্রিরা চীনে গমন করেন। এঁরা অনেক প্রভাবশালী চৈনিককে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। ষোল শতকের শেষ ভাগে জাপান কোরিয়া ও চীনে আক্রমণের আয়োজন করে। তখন কোরিয়া ছিল চীনের অধীনস্থ রাজ্য। জাপানের সেনাবাহিনী কোরিয়াতে অবতরণ করে এবং কোরীয় ও চীনা সেনাবাহিনীকে অনেকগুলো যুদ্ধে পরাজিত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোরীয়রা নৌযুদ্ধে জাপানি নৌবাহিনীকে পরাস্ত করে এবং জাপানি আক্রমণকারীরা জাপানে ফিরে যায়।

চীন এরপর অন্য এক দিক থেকে আক্রান্ত হয়। সতের শতকে বর্বর মাঞ্চু জাতি উত্তর দিক থেকে চীনকে আক্রমণ করে। তারা চীনের প্রাচীর ভেদ করে অগ্রসর হয়। এদিকে চীনের অভ্যন্তরে তখন মিং শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীরা সম্রাটের বাহিনীকে পরাস্ত করে পিকিং দখল করে নেয়। কিন্তু এ নতুন বিদ্রোহী নেতা মাঞ্চুদের আক্রমণের মুখে টিকতে পারে না। এভাবে ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে চীনে নতুন রাজবংশ—মাঞ্চু রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঞ্চু রাজবংশ ১৯১১ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

মিং আমলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

মিং যুগে সাহিত্য ও শিল্পকর্মের বিকাশ ঘটেছিল। এ যুগে প্রাচীন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থার পুনঃ প্রচলন ঘটেছিল। প্রতি তিন বছর অন্তর সর্বজনীন ভিত্তিতে এ পরীক্ষা নেয়া হত। কিন্তু এ পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল এই যে, এ শিক্ষা পদ্ধতিতে চীনের প্রাচীন রীতিনীতি, ঐতিহ্য এবং প্রাচীন দর্শন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হলেও, এ শিক্ষাব্যবস্থায় চীনে প্রাচীন ও স্থবির চিন্তাই সংরক্ষিত হয়েছিল। ফলে, নতুন চিন্তার বিকাশ এ যুগে চীনে ঘটতে পারেনি।

মিং যুগের কারিগররা দক্ষতার সাথে অনেক পণ্য নির্মাণ করেছে কিন্তু তারা আগের আমলের তুলনায় বিশেষ মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে পারে নি। তবে মিং যুগের নির্মিত নীলাভ সাদা রঙ বিশিষ্ট এবং ডিমের খোসার মত পাতলা অতি অপরূপ চীনামাটির পাত্র বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

মিং যুগের প্রথম দিকে ১৪০৩ থেকে ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পিকিং-এর 'নিষিদ্ধ নগরী' তৈরি হয়েছিল। এ 'নিষিদ্ধ নগরীতে' বহু সংখ্যক বিশাল চত্বর এবং কারুকার্য শোভিত রাজ প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল।

মঙ্গোলদের ইতিহাস

মঙ্গোলরা ছিল এশিয়ার একটি পশুপালক যাযাবর জাতি। মাঞ্চুরিয়া ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এরা বাস করত। তের শতকে এরা নিজেদের বাসভূমি থেকে বের হয়ে পঙ্গপালের মতো দলে দলে সভ্য দেশগুলোকে আক্রমণ করতে শুরু করে। যাযাবরদের এ ধরনের বিস্ফোরণ ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের এক প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন সময়ে হিক্সস, ক্যাসাইট, শক, হুন প্রভৃতি বর্বর জাতি যে মধ্য এশিয়া থেকে নির্গত হয়ে দলবদ্ধভাবে সভ্য জাতিসমূহকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল সে কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। তের শতকে মঙ্গোলদের বিজয় অভিযান ছিল পশুপালক বর্বর সমাজের শেষ অভিযান। এর পর সমস্ত বর্বর সমাজের কৃষিজীবী ও পশুপালক

www.pathagar.com

মানুষরা সভ্য যুগের সামন্ত সমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

মঙ্গোলরা প্রথমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে। বাল্যকালে চেঙ্গিস খান তেমুজিন নামে পরিচিত ছিলেন। তেমুজিনের জন্ম হয়েছিল ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ৫০-৫১ বছর বয়সে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খান মঙ্গোলদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি এক দুর্ধর্ষ ঘোড় সওয়ার বাহিনী গড়ে তোলেন এবং একের পর এক দেশ জয় করতে শুরু করেন। চেঙ্গিস খান ভয়ঙ্কর নৃশংস সেনানায়ক ছিলেন বটে কিন্তু তিনি দক্ষ সেনাপতিও ছিলেন। বিভিন্ন দেশ জয় করার সাথে সাথে তিনি ঐসব দেশের কারিগর, বণিক, ডাক্তার, পণ্ডিত, সৈনিক ও সব ধরনের কর্মকুশলী লোকদের নিজবাহিনীতে ও রাজকার্যে নিয়োগ করতেন। এভাবে মঙ্গোলদের সেনাবাহিনী যেমন বৃদ্ধি পেতে লাগল তেমনিভাবে পৃথিবী সম্পর্কে তাদের জ্ঞানও বাড়তে লাগল। কালক্রমে চেঙ্গিস খানের পুত্র, পৌত্র এবং অনেক অনুচরও রণনিপুণ সেনাপতিতে পরিণত হয়েছিলেন।

মঙ্গোলরা ১২১১ থেকে ১২১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোরিয়া এবং উত্তর চীন আক্রমণ করে ও পিকিং দখল করে। ১২১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মঙ্গোলরা তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্য এশিয়ার সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে নেয়। ১২১৯ থেকে ১২২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মঙ্গোলরা মধ্য এশিয়ার শক্তিশালী রাজ্য খারিজমকে জয় করে নেয় এবং সমরকন্দ ও বোখরা শহর দুটোকে তছনছ করে দেয়। ১২২১ থেকে ১২২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চেঙ্গিস খানের সুদক্ষ সেনাপতি সুবাতাই ইউরোপ আক্রমণ করেন। তিনি কৃষ্ণসাগরের উত্তর দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে কিয়েভ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সুবাতাইকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সেনাপতিরূপে গণ্য করা হয়।

১২২৭ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খানের মৃত্যু ঘটলে সমস্ত মঙ্গোল সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতিরা কারাকোরাম অঞ্চলে সমবেত হয়ে চেঙ্গিস খানের তৃতীয় পুত্র ওগোদাইকে মঙ্গোলদের নেতা নির্বাচিত করেন। ওগোদাই ১২২৯ থেকে ১২৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মঙ্গোলদের নেতা ছিলেন। চেঙ্গিস খানের দ্বিতীয় পুত্র জাগাতাইকে মধ্য এশিয়ার রাজ্যসমূহ প্রদান করা হয়। চেঙ্গিস খানের বড় ছেলে জুজি ইতিপূর্বেই মারা গিয়েছিলেন কিন্তু জুজির পুত্র বাতুকে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তবর্তী ক্রমবর্ধমান অঞ্চলকে প্রদান করা হয়।

বাতু এবং সুবাতাইকে মঙ্গোল গোষ্ঠীপতিরা ইউরোপকে জয় করার নির্দেশ দেয়। ইউরোপ জয়ের অভিযান ১২৩৯ থেকে ১২৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তারপর ওগোদাই-এর মৃত্যুর ফলে ঐ অভিযানে ছেদ পড়ে। ১২৩৭-৩৮ সালে মঙ্গোল বাহিনী ভোলগা নদী অতিক্রম করে। এরপর তারা রাশিয়া জয় করে নেয় ও মস্কোকে পুড়িয়ে দেয়। ১২৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনটি মঙ্গোল বাহিনী তিন দিক দিয়ে ইউরোপে অভিযান চালায়। সেনাপতি কাইফু বাল্টিক সাগরের তীর দিয়ে পোল্যান্ড ও প্রশিয়ার দিকে ধাবিত হন, তারপর দক্ষিণ বোহেমিয়ার দিকে অগ্রসর হন। বাতু এবং সুবাতাই কার্পেথিয়ান পর্বতের গিরিপথ ভেদ করে অগ্রসর হয়ে বুদাপেস্তের সামনে হাঙ্গেরীয় বাহিনীকে ধ্বংস করেন। সেনাপতি কাদান কৃষ্ণ সাগরের উপকূল ধরে এবং দানিয়ুব নদীর তীর দিয়ে অগ্রসর হয়ে বুদাপেস্তের দিকে অগ্রসর হন। ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি কাদান তাঁর মঙ্গোল বাহিনী নিয়ে বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করেন এবং অড্রিয়াটিক সাগরের তীরে উপস্থিত হন। এসময়ে ওগোদাইয়ের মৃত্যু ঘটার ফলে সকলে ইউরোপ অভিযান অসমাপ্ত রেখে নতুন মঙ্গোল নেতা নির্বাচনের জন্য কারাকোরাম অঞ্চলে ফিরে যান। মঙ্গোলরা অপরাজিত অবস্থাতেই ফিরে এসেছিল।

ওগোদাই-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুয়ুক মঙ্গোলদের নেতা নির্বাচিত হন। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে কুয়ুকের মৃত্যু হলে চেঙ্গিস খানের চতুর্থ পুত্র তুলে-র বড় ছেলে মংগু খান মঙ্গোলদের নেতা হন।

www.pathagar.com

মংগু খান তাঁর কনিষ্ঠতম ভ্রাতা (চেঙ্গিস খানের নাতি) হালাকু খানকে আব্বাসীয় খলিফার রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান বাগদাদকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন এবং অজস্র নর-নারীকে হত্যা করেন। ১২৫৫ থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মঙ্গোলরা পারস্য, এশিয়ামাইনর এবং আরবের উত্তর অংশ অধিকার করে নেয়। কিন্তু ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মিশরের সুলতান মঙ্গোলবাহিনীর অগ্রগতিকে রোধ করেন। এই প্রথম মঙ্গোল সেনাবাহিনী পরাজয়ের স্বাদ লাভ করে।

১২৫৭ থেকে ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মংগু খান ও তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা কুবলাই খান চীন অধিকার করেন। ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে মংগু খানের মৃত্যু হলে কুবলাই খান মঙ্গোলদের নেতা হন। কিন্তু একই সাথে তিনি চীনের সম্রাট হিসাবে 'স্বর্গের সন্তান' উপাধিও গ্রহণ করেন। চেঙ্গিস খানের পৌত্র এই কুবলাই খান ছিলেন মঙ্গোলদের শেষ নেতা এবং চীনের ইতিহাসের ইউয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে কুবলাই খান চীনের সম্রাট হয়েছিলেন। ইউয়ান রাজবংশ ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। চীন সম্রাট হিসাবে কুবলাই খান ইন্দোচীন, বর্মা প্রভৃতি দেশ জয় করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করেও জাপান এবং ইন্দোচীন জয় করতে সক্ষম হন নি।

মধ্য এশিয়ায় হালাকু খান যে বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এবং বোখারা, সমরকন্দ থেকে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল।

খান বাতু'র মঙ্গোল বাহিনী রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চলে, উরাল পর্বতমালা ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থান করতে থাকে এবং দীর্ঘকাল রাশিয়াকে পদানত করে রাখে। ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দের পর রাশিয়া কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু এই অঞ্চলের মঙ্গোল বাহিনীকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

চেঙ্গিস খান এবং তার মঙ্গোল বাহিনী চরম নিষ্ঠুরতা এবং নৃশংসতার সাথে সভ্যদেশসমূহকে ধ্বংস ও পদানত করেছিলেন। তবে, ঐতিহাসিকভাবে সভ্য জাতিসমূহের বিরুদ্ধে বর্বর জনগোষ্ঠীর অভিযানের আশঙ্কা ও বিপদ মঙ্গোলদের বিজয় অভিযানের পর চিরকালের মতো লোপ পেয়েছিল। ইতিপূর্বে জার্মান ও নর্মান বর্বর জনগোষ্ঠী যেমন ইউরোপের সামন্ত সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, তেমনিভাবে মঙ্গোলরাও কালক্রমে এশিয়ার বিভিন্ন সামন্ত সমাজে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এর পর আর কোন বর্বর জনগোষ্ঠী এশিয়া বা ইউরোপে ছিল না।

মঙ্গোলদের অত্যাচার ও নৃশংসতার কথা মনে রেখেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, তের শতকে এশিয়ায় স্থাপিত বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্য চীনা ও ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সংযোগ স্থাপন করে—মানব ইতিহাসের বিকাশের ক্ষেত্রে যে যোগাযোগের তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। এ নতুন মঙ্গোল সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়ায় এক শতাব্দী স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। এসময়ে চীন ও ইউরোপের মধ্যে বিরামহীনভাবে বাণিজ্য চলত। উটের ক্যারাভান অনবরতই মূল্যবান পণ্যসামগ্রী নিয়ে চীন ও ইউরোপের মধ্যে যাতায়াত করত। এর ফলে চীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও কারিগরি আবিষ্কার ইউরোপে গিয়ে পৌঁছেছিল। এরকম একটা আবিষ্কার হল বারুদ। সম্ভবত হরফের ছাঁচ দিয়ে ছাপার প্রক্রিয়াও চীন বা কোরিয়া থেকে এ সময় ইউরোপে গিয়ে পৌঁছে ছিল (যদিও এ বিষয়ে পণ্ডিতরা এখনও একমত নন)। মঙ্গোল সাম্রাজ্যের মাধ্যমে প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তের-চৌদ্দ শতকে স্থাপিত হয়েছিল, ইউরোপে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটানোর ক্ষেত্রে ঐ যোগাযোগের বিশেষ অবদান ছিল।

www.pathagar.com

ইসলামের ইতিহাস

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন এবং আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর হজরত আবু বকর (রাঃ) ইসলামের প্রথম খলিফা হন। খলিফা বলতে বোঝায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর উত্তরাধিকারী এবং মুসলিম জগতের শাসক। এর পর যথাক্রমে হজরত ওমর (রাঃ), হজরত ওসমান (রাঃ) ও হজরত আলী (রাঃ) খলিফা হন।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আরব দেশে কোন রাজ্য বা রাষ্ট্র ছিল না। আরব দেশের মানুষরা তখন গোত্র এবং উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফারা আরবের বাইরে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ নেন। প্রথম চার খলিফার আমলে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পারস্য, মিশর প্রভৃতি স্থান ইসলামের শাসনভুক্ত হয়। প্রথম চার খলিফার আমলকে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' বলা হয়।

প্রথম চার খলিফা (৬৩২-৬৬১ খৃঃ)

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর মৃত্যুকালে কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান নি। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। মদিনাবাসী, কোরেশ বংশ, উমাইয়া গোত্র প্রভৃতি বিভিন্ন তরফ থেকে খলিফা নির্বাচিত হওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়। অবশেষে হজরত আবুবকর (রাঃ) সর্বসম্মতভাবে খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা আবুবকর (রাঃ) ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন এবং সিরিয়ার অনেকখানি অংশ অধিকার করেন। তিনি পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করেন এবং পারস্য সাম্রাজ্যের হীরা প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। হজরত আবুবকর ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি হজরত ওমরকে (রাঃ) পরবর্তী খলিফা রূপে মনোনীত করেন।

হজরত ওমর (রাঃ) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হন। হজরত ওমর ইসলামী সাম্রাজ্যের আরও বিস্তার সাধন করেন। তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের বৃহৎ অংশ অধিকার করেন। অবশ্য চূড়ান্তভাবে পারস্য বিজয় সমাপ্ত হয়েছিল পরবর্তী খলিফা হজরত ওসমানের (রাঃ) সময়ে (৬৫২ খ্রিস্টাব্দে)। হজরত ওমর (রাঃ) পশ্চিম দিকেও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন। তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে পরাজিত করে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ফিনিশিয়া অধিকার করেন। হজরত ওমর (রাঃ) বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যভুক্ত মিশরও জয় করেছিলেন।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রাঃ) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর আমলে মধ্য এশিয়ার অনেক অঞ্চল এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীর ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত অঞ্চল মুসলমানদের আয়ত্তাধীন হয়। ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে একদল বিদ্রোহী হজরত ওসমানকে (রাঃ) হত্যা করে।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রাঃ) ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হন। তাঁর আমলে হজরত ওসমানের (রাঃ) হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়েছিল। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে হজরত আলী (রাঃ) সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন।

উমাইয়া বংশ (৬৬১–৭৫০ খৃঃ)

হজরত আলীর (রাঃ) মৃত্যুর পর মোয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান পঞ্চম খলিফা হন। এর পর থেকে ইসলামের ইতিহাসে বংশগত খেলাফতের সূচনা হয়। এর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ইসলামের প্রথম

www.pathagar.com

চারজন খলিফা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মোয়াবিয়া যে বংশানুক্রমিক খেলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন তা উমাইয়া বংশ নামে পরিচিত। উমাইয়াদের আমলে এশিয়ামাইনর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং ভারতবর্ষের একাংশ পর্যন্ত ইসলামের অধিকার বিস্তৃত হয়। এ বংশের খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। উমাইয়াদের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সিরিয়ার দামাস্কাস নগরে।

আব্বাসীয় বংশ (৭৫০–১২৫৮ খৃঃ)

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া বংশের স্থলে নতুন আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয় আমলে ইরাকের বাগদাদ শহরে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। তবে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেন আব্বাসীয় শাসনের অধিকার থেকে বেরিয়ে যায় এবং সেখানে উমাইয়া বংশের শাসন অব্যাহত থাকে। আবার ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মিশরেও ফাতেমি নামে নতুন বংশের শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। অন্যান্য স্থানে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসীয় বংশের শাসন প্রচলিত ছিল।

খলিফা হারুন অর রশীদ (রাজত্বকাল–৭৮৬–৮০৯খৃঃ) ছিলেন আব্বাসী বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত খলিফা। আব্বাসীয় আমলে ইসলামী সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছিল।

বুয়াহিদ বংশ (৯৪৫–১০৫৫ খৃঃ)

বুয়াহিদরা কখনও খলিফা হতে পারেননি, তাঁরা ছিলেন আমীর। কিন্তু আব্বাসীয় খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।

আব্বাসীয় খলিফা আলমুতাসিম (রাজত্বকাল ৮৩৩-৮৪২খৃঃ) ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে একটি তুর্কি বাহিনী গঠন করেছিলেন। এ তুর্কিবাহিনী ক্রমে ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আবু মুস্তাকাফি বিল্লাহ তুর্কি সৈন্যদের উৎপাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য বুয়াহিদ বংশীয় আমীর আহম্মদকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। বুয়াহিদরা ছিলেন প্রাচীন পারসিক বংশীয়। বুয়াহিদরা এসে তুর্কি বাহিনীকে বিতাড়িত করলেন বটে কিন্তু তারপর নিজেরাই খুব ক্ষমতাবান হয়ে উঠলেন। বুয়াহিদরা প্রথমে ছিলেন আমীর। আমীর আহম্মদ তুর্কি সৈন্যদের বিতাড়িত করলে খলিফা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মুইজুদ্দৌলা উপাধি প্রদান করেন। ক্রমে মুইজুদ্দৌলা এত ক্ষমতার অধিকারী হন যে, নিজেই সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন এবং মুদ্রায়ও নিজের নাম অঙ্কিত করেন। এমন কি তিনি খোৎবায়ও খলিফার নামের সাথে নিজের নাম যোগ করেন।

বুয়াহিদ সুলতানদের মধ্যে আইজুদ্দৌলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বহু হাসপাতাল ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাস্তাঘাট, পুল প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তিনি খেলাফত অধিকারের মানসে তৎকালীন খলিফার কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং শাহানশাহ উপাধি ধারণ করেছিলেন।

বুয়াহিদদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে আব্বাসীয় খলিফা সেলজুক বংশীয় তুর্কিদের সাহায্য কামনা করেন। সেলজুক তুর্কিরা শেষ বুয়াহিদ আমীর মালিক রহিমকে ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ থেকে বিতাড়িত করেন। এ ভাবে বুয়াহিদ বংশের পতন ঘটে। এর পর অবশ্য সেলজুকরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল।

বুয়াহিদগণ শতাধিক বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। বুয়াহিদ আমীরগণ শাসক হিসেবে এবং জ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক মাসুদি, দার্শনিক আবু নাসর ফারাবি, বিজ্ঞানী আবদুর রহমান এবং আবুল ওয়াফা প্রমুখ এ যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। বুয়াহিদ আমীর শারফুদ্দৌলা একটি মানমন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। অপর একজন বুয়াহিদ শাসক বাগদাদে একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

www.pathagar.com

গজনবী বংশ

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তুর্কিদের বিশাল সাম্রাজ্য চীনের উত্তর সীমা থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত সমগ্র মধ্য এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে এ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দুটো খণ্ডে পরিণত হয়। এক অংশের নাম হয় উত্তর তুর্কি, অপর অংশের নাম হয় পশ্চিম তুর্কি। তুর্কিরা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। নবম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফারা শক্তিহীন হয়ে পড়লে বিভিন্ন তুর্কি গোষ্ঠীরা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য স্থাপন করে। এদের মধ্যে গজনবী ও সেলজুকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গজনবী বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সবুক্তগীন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনী শহরে। তাঁর ছেলে মাহমুদ ছিলেন এ বংশের সবচেয়ে পরাক্রমশালী সুলতান এবং মধ্য এশিয়ায় ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। সুলতান মাহমুদ খোরাসান রাজ্য এবং পারস্যের অর্ধেকাংশ অধিকার করেছিলেন। তিনি বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। সুলতান মাহমুদ জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহাপণ্ডিত আলবেরুনী এবং মহাকবি ফেরদৌসী তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। মাহমুদ অবশ্য তাঁর রাজশক্তিকে সুসংহত করতে পারেননি। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই (১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে) সেলজুক তুর্কিরা গজনবীদের উৎখাত করে।

সেলজুক তুর্কি বংশ (১০৩৭–১১৯৪ খৃঃ)

গজনীর সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনবী বংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেলজুক তুর্কিরা শক্তিমান হয়ে ওঠে। ঘুজ বংশীয় তুর্কিদের থেকে সেলজুকদের উদ্ভব হয়েছিল। বংশের আদি নেতা সেলজুকদের নাম অনুসারেই এ বংশের নামকরণ হয়েছে। তবে, সেলজুকের পৌত্র তুঘ্রিল বেগ ছিলেন এ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে তুঘ্রিল বেগ গজনী সাম্রাজ্য এবং ইরাকের অনেকখানি অংশ অধিকার করেন। সেলজুক তুর্কিরা ছিল সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান।

১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের খলিফা আলকায়েম বুয়াহিদ আমীরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তুঘ্রিল বেগের সাহায্য কামনা করেন। তুঘ্রিল বেগ বুয়াহিদ আমীরকে বাগদাদ থেকে বিতাড়িত করে খলিফাকে তার কবলমুক্ত করেন। কিন্তু বুয়াহিদদের বিতাড়িত করে সেলজুকরা নিজেরাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খলিফা তুঘ্রিল বেগকে সুলতান উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেলজুকরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দাঁড়ায়। ১০৬০ খ্রিস্টাব্দে তুঘ্রিল বেগ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে কাপাডোসিয়া ও ফ্রিজিয়া অধিকার করে নেন।

তুঘ্রিল বেগের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আল্প আরস্লান সেলজুক সুলতান হন। আরস্লান আর্মেনিয়া অধিকার করেন এবং বাইজেন্টাইন সম্রাট ৩য় রোমানাসকে যুদ্ধে পরাজিত করে প্রায় সমগ্র এশিয়ামাইনরের অধিপতি হন।

আল্প আরস্লানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ সেলজুক সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালিক শাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ সেলজুক সুলতানরূপে গণ্য করা হয়। তাঁর সময়ে সেলজুক সাম্রাজ্য পশ্চিমে এশিয়ামাইনর থেকে পূর্বে কাশগড় পর্যন্ত এবং উত্তরে জর্জিয়া থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মালিক শাহের রাজত্বকালেই সেলজুক তুর্কিরা জেরুজালেম অধিকার করেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ ঘটনাকে উপলক্ষ করেই প্রথম ক্রুসেডের সূত্রপাত হয়েছিল।

সুলতান মালিক শাহ বহু জনহিতকর কাজ করেন এবং বিদ্যালয়, সরাইখানা, রাস্তাঘাট, পুল প্রভৃতি নির্মাণ করেন। মালিক শাহের সুযোগ্য মন্ত্রী ছিলেন নিজামুল মুলক। নিজামুল মূলকের উদ্যোগের ফলেই নিশাপুরে একটি জ্যোতির্বিদ সম্মেলন আহ্বান করা হয়। তাঁর পরামর্শ অনুসারেই প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও কবি ওমর খৈয়ামের উপর পঞ্জিকা সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। নিজামুল মূলকের উদ্যোগে বাগদাদে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইমাম গাজ্জালি এ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

www.pathagar.com

১০৯২ খ্রিস্টাব্দে মালিক শাহের মৃত্যু হয়। এরপর সেলজুকদের মধ্যে গৃহবিবাদ দেখা দেয় এবং বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেলজুক রাজ্য উদিত হয়। এর পর ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেলজুকগণ কোনক্রমে ক্ষমতায় টিকে ছিল। তারপরও অবশ্য সেলজুক গোষ্ঠী একেবারে লোপ পায় নি। ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল নেতা চেঙ্গিস খান সেলজুকদের পরাজিত করেন। অবশেষে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে অপর মঙ্গোল নেতা হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করে সেলজুকদের বিতাড়িত করলে ইতিহাসের অঙ্গন থেকে সেলজুক তুর্কিদের নাম মুছে যায়।

মিশরের ফাতেমীয় বংশ (৯৬৯-১১৭১)

আব্বাসীয় খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফাতেমীয় বংশ দশম শতাব্দীতে মিশর অধিকার করে সেখানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কন্যা ফাতেমার নাম অনুসারে এ বংশের নামকরণ হয়েছিল। ফাতেমীয় বংশের শাসন ৯৬৯ খৃঃ থেকে ১১৭১ খৃঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ফাতেমীয় বংশ ছিল শিয়া পন্থী। এঁরা মিশরে পৃথক খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখানে বাগদাদের খলিফার পরিবর্তে শিয়া ফাতেমীয় খলিফার নামে খোৎবা পাঠ করা হত।

ফাতেমীয়দের আমলেই কায়রোতে সুবিখ্যাত আল আজহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মিশরের আইয়ুবী বংশ (১১৭৪-১২৫০)

গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে মিশরে আইয়ুবী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সালাহউদ্দিন প্রথমে মিশরের ফাতেমীয় খলিফার সেনাপতি ও মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সালাহউদ্দিন ছিলেন সুন্নী মতাবলম্বী এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল মিশরে শিয়া ফাতেমীয় খিলাফতের স্থলে আব্বাসীয় সুন্নী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। ফাতেমীয়দের মন্ত্রী থাকাকালেই সালাহউদ্দিন প্রভূত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। এ অবস্থায় ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে মিশরের ফাতেমীয় খলিফা আজীদ মৃত্যুবরণ করলে সালাহউদ্দিন তাঁর স্থলে নতুন কোন শিয়া খলিফাকে অভিষিক্ত না করে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা আল মুসতাজিরের নামে খোৎবা পাঠের রীতি প্রবর্তন করেন। আব্বাসীয় খলিফা এর পর সালাহউদ্দিনকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। সুলতান সালাহউদ্দিন মিশর, ইয়েমেন, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সুলতান গাজী সালাহউদ্দিন তৃতীয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে সালাহউদ্দিনের মৃত্যু হয়। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুবী বংশ লুপ্ত হয়। আইয়ুবী আমলের শেষ দিকে মিশরে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খাল্লিকান-এর আবির্ভাব ঘটেছিল।

মিশরের মামলুক বংশ (১২৫০-১৫১৭ খৃঃ)

আইয়ুবী বংশের পরে মোটামুটি ১২৫০ খৃঃ থেকে ১৫১৭ খৃঃ পর্যন্ত মিশরে মামলুক বা দাস বংশীয় সুলতানরা রাজত্ব করেন। সেনাবাহিনী ও রাজ দরবারে নিযুক্ত মুক্ত দাসদের থেকেই এ আমলের সুলতান নির্বাচিত হতেন বলে এঁদের মামলুক বলা হয়। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কিরা মিশর অধিকার করলে মামলুক শাসনের অবসান ঘটে।

স্পেনে মুসলিম রাজ্য

রোমান যুগে স্পেন ছিল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চম শতকে বর্বরদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার পর ভিসিগথরা স্পেনে বাস স্থাপন করেছিল। রোমান যুগে স্পেন ছিল সমৃদ্ধ

www.pathagar.com

ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী। ভিসিগথদের আমলে স্পেনের কেন্দ্রীভূত নগর সভ্যতা ভেঙে পড়ে এবং দেশটি দুর্বল হয়ে পড়ে। স্পেনের অধিবাসীরা কালক্রমে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

সপ্তম শতকে মুসলিম সাম্রাজ্য উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি তারেক জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে প্রবেশ করেন ও স্পেন অধিকার করেন। বস্তুত তারিকের নাম অনুসারেই স্পেনের দক্ষিণ প্রান্তের পর্বতটির নাম হয়েছে জাবাল-উৎ তারিক বা জিব্রাল্টার (আরবিতে জাবাল মানে পর্বত)। মুসলমানরা স্পেন অধিকার করার পর তার উত্তরের কিছুটা পার্বত্য অঞ্চল মাত্র স্পেনীয় খ্রিস্টানদের অধিকারে থাকে।

মুসলিম স্পেন প্রথম অবস্থায় দামাস্কাসের উমাইয়া খেলাফতের অধীনে ছিল। কিন্তু ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে নতুন আব্বাসীয় খেলাফতের প্রবর্তন হওয়ার পর ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেন আব্বাসীয় শাসনের অধিকার থেকে বেরিয়ে যায়। এর পর থেকে স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রচলিত ছিল। মুসলিম স্পেনের রাজধানী ছিল কর্ডোভা।

স্পেনে মুসলিম সভ্যতা দশম শতকে অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এ যুগে স্পেনের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। এ সময়ে স্পেনে গম উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, গম ভাঙানোর জন্য পানি কলের প্রচলন হয় এবং ধান, আখ প্রভৃতি নতুন ফসলের প্রচলন করা হয়। এছাড়া আঙ্গুর, জলপাই প্রভৃতি ফলের চাষ এবং জলপাইয়ের তেল উৎপাদনও এ সময় বৃদ্ধি পায়। মুসলিম স্পেনে শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল। স্পেনের লিনেন ও রেশম সারা ইউরোপে খ্যাতি অর্জন করে। স্পেনের তৈরি কাচের জিনিস, অস্ত্রশস্ত্র, চামড়ার জিনিস, পর্দার কাপড় প্রভৃতি ছিল ইউরোপের সেরা বস্তু। কথিত আছে দশম শতকে কর্ডোভায় পাঁচ লক্ষ লোক বাস করত এবং সেখানে ৩০০ সাধারণ গোসলখানা ছিল। গোসল খানার বিষয়টা লক্ষণীয়। কারণ বাকি ইউরোপে তখন পর্যন্ত এ জ্ঞান পৌছায়নি যে স্বাস্থ্য এবং শরীর রক্ষার জন্য নিয়মিত গোসল করা প্রয়োজন। কর্ডোভাতে একটা পাঠাগার ছিল যাতে চার লক্ষ বই সংরক্ষিত ছিল। বস্তুত কর্ডোভা ছিল পশ্চিম ইউরোপের জ্ঞানকেন্দ্র স্বরূপ। ইউরোপের খ্রিস্টান পণ্ডিতরা মুসলিম স্পেনে এসে জ্ঞানলাভ করতেন এবং এঁদের মাধ্যমেই আরবদের অনেক বিদ্যা ফ্রান্স ও ইতালিতে গিয়ে পৌছেছিল। ইউরোপ ভূখণ্ডে কর্ডোভাতেই প্রথম বই তৈরির জন্য কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। মুসলিম স্পেনে রসায়ন, ঔষধবিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

১০০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে মুসলিম স্পেনে নানা প্রকার গোলযোগ দেখা দেয়। ১০৩১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে কর্ডোভার খেলাফতের অবসান ঘটে এবং তার জায়গায় ২৩টি পৃথক পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের উদয় ঘটে। মুসলমানদের এ অনৈক্যের কালে স্পেনের খ্রিস্টানরা পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ পায়। স্পেনীয় খ্রিস্টানরা ক্রমে ক্রমে কর্ডোভা ও অন্যান্য অঞ্চল দখল করে নেয়। তের শতকে মুসলমানদের অধিকার স্পেনের দক্ষিণ প্রান্তের গ্রানাডা অঞ্চলের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডাও স্পেনীয় খ্রিস্টানরা অধিকার করে নেয় এবং তার ফলে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

ইসলামী সভ্যতার পরিচয়

বার শতকের আগে পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল ইউরোপের তুলনায় সব দিক দিয়ে উন্নত। মুসলমানরা প্রাচীন গ্রিস, ভারতীয় উপমহাদেশ ও চীনের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেছিলেন ও তার বিকাশ সাধন করেছিলেন। এভাবে সে সময়ে পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায় যা-কিছু আবিষ্কৃত হয়েছিল মুসলমানরা তা আয়ত্ত করেন এবং ইতিহাস, ভূগোল, চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার সাধন করেন। মুসলমানদের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা প্রাচীন কালের অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সন্ধান পেয়েছিল বলেই পরবর্তীকালে ইউরোপ নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

www.pathagar.com

মুসলমানরা পারস্য ও সিরিয়া জয় করার ফলে প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার সহজেই তাঁদের হস্তগত হয়। পারস্যের রাজদরবারে অনেক গ্রিক চিকিৎসক ছিলেন আর সিরিয়াতে ছিল প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতদের রচিত বইয়ের গ্রন্থাগার। সিরিয়াতে গ্রিক দর্শন বিষয়ে সুপণ্ডিত অনেক ব্যক্তিও ছিলেন। আব্বাসীয় শাসনামলে বাগদাদে গ্রিক, ভারতীয়, চীনা বই-পুস্তক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটে। খলিফা হারুন অর রশিদ ও তার উত্তরাধিকারীদের আমলে প্রাচীন প্রাচীন গ্রিক ও ভারতীয় বই-পুস্তক আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এভাবে হিপোক্রেটিস, এরিস্টটল, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, টলেমি, গ্যালেন প্রমুখ গ্রিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের রচনা আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এবং আরবি ও মূল গ্রিক গ্রন্থ নিয়ে বাগদাদে একটা বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়। প্রাচীন ভারতে আবিষ্কৃত শূন্যসহ দশ ভিত্তিক সংখ্যা লেখার পদ্ধতিও মুসলমানরা আয়ত্ত করেছিলেন ও ইউরোপে তার প্রচলন করেছিলেন। সংখ্যা লেখার এ পদ্ধতি এখন সারা পৃথিবীতে প্রচলিত হয়েছে।

মুসলমানরা কেবল প্রাচীন গ্রিক বা অন্যান্য জ্ঞান সংগ্রহই করেন নি, তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন অবদানও রেখেছেন। মধ্যযুগে মুসলমানরা চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছিলেন। মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন আল রাজী (আনুমানিক ৪৬৫–৯২৫খৃঃ)। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ে দুইশ'র বেশি বই লিখেছেন। বসন্ত ও হাম সম্পর্কে তাঁর লেখা মূল্যবান গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়ে ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি বাগদাদে ও অন্যত্র নানা চিকিৎসালয়ের সাথে যুক্ত থেকে প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি 'আল হাউই' নামে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে কুড়ি খণ্ডে সম্পূর্ণ এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থে তিনি সমস্ত রোগ সম্পর্কে গ্রিক, সিরীয়, আরবি, পারসিক ও ভারতীয় চিকিৎসকদের মত উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর নিজের মত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেন। এ গ্রন্থটি ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছিল এবং এর অনেকগুলো সংস্করণ ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

আরেক জন বিজ্ঞানী ইবনে সিনা ছিলেন মধ্যযুগের সেরা চিকিৎসাবিদ। তাঁর রচিত 'কানুন আল হিকমা' গ্রন্থটি মধ্যযুগের ইউরোপে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পড়ানো হত।

ইসলামী বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যারও অনেক অগ্রগতি সাধন করেছিলেন। তাঁরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বিদ্যার সাথে প্রথমে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেই তাঁরা ক্ষান্ত থাকেন নি। বিজ্ঞানী আল হাজেন (৯৬৫–আনুমানিক ১০৩৯ খৃঃ) আলোকবিদ্যা সম্পর্কে অনেক নতুন সূত্র আবিষ্কার করেন। মুসলিম রসায়নবিদরা অনেক নতুন ঔষধ এবং রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করেছিলেন।

মুসলমানরা জ্যোতির্বিদ্যায়ও পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তাঁরা অনেক রকম যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং বড় বড় শহরে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা গণিত শাস্ত্রের বিকাশ সাধন করেন এবং বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতিতে বিশেষ অবদান রাখেন। আল খারিজমি রচিত 'আল জবর' নামক গণিত গ্রন্থের নাম থেকেই ইংরেজি এ্যালজেব্রা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা ভূগোল শাস্ত্রেও নতুন অবদান রেখেছিলেন। মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল এশিয়া থেকে আফ্রিকা ও ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। সাম্রাজ্য শাসন ও ব্যবসার সূত্রে মুসলমানদের ভূগোলের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসলিম ভৌগোলিকরা মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নতুন ও সহজ পথ আবিষ্কার করেন এবং সঠিক মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ইতিহাস রচনার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও মুসলিম পণ্ডিতরা অবদান রাখেন। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (জন্ম ১৩৩২ খৃঃ) ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেন তা আধুনিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গীকেও প্রভাবিত করেছে। দর্শন শাস্ত্রের চর্চায় মুসলিম মনীষীগণ গভীর নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনা ও আবু রুশদ-এর রচনা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের পণ্ডিতদের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন সময় কালকে মধ্যযুগ রূপে গণ্য করা হবে এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা বিশ্ব ইতিহাস ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান কালকে (অর্থাৎ ছয়ের শতকের শুরু বা মধ্যভাগকে) ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন যুগের অবসান কাল রূপে গণ্য করব। গুপ্তোত্তর যুগে ভারতবর্ষে সামন্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন। ভারতীয় ইতিহাসে সামন্ত সমাজ ও অর্থনীতি স্থায়ী হয়েছিল মোগল যুগের অবসান কাল তথা ব্রিটিশদের আগমন কাল পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)। আমরা তাই মোটামুটি ছয়ের শতক থেকে আঠার-উনিশ শতক পর্যন্ত কালকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে গণ্য করব। তবে গ্রন্থ রচনার সুবিধার্থে মোগল যুগের (১৫২৬-১৮৫৭ খৃঃ) ইতিহাসকে 'মানুষের ইতিহাস : আধুনিক যুগ' গ্রন্থে বিবৃত করা হবে—কারণ বিশ্ব পর্যায়ে তখন আধুনিক যুগের আগমন ঘটেছে। এ গ্রন্থে শুধুমাত্র ছয়ের শতক থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ণিত হল।

গুপ্তযুগের পরবর্তীকালের ইতিহাস

গুপ্ত বংশের সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে (৪৫৫-৪৬৭ খৃঃ) হুনরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল, এ কথা 'মানুষের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ' গ্রন্থে বলা হয়েছে। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিকে পুষ্যমিত্র নামক ভারতীয় উপজাতি এবং অপর দিকে বহিরাগত হুন জাতির আক্রমণে ছয়ের শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। অবলুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এ রাজ্যগুলো হল : উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতের একাংশে হুনরাজ্য, সৌরাষ্ট্রের মৈত্রক বংশ, কনৌজের মৌখরী বংশ, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ মালবের গুপ্ত বংশ এবং দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের দুটি রাজ্য।

হুনরাজ্য

হুনদের কথা আগে নানা সূত্রে বলা হয়েছে। মধ্য এশিয়ার এ বর্বর ও যুদ্ধপ্রিয় জাতিটি খ্রিস্টীয় পাঁচ ও ছয়ের শতকে মধ্য এশিয়াতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ছয়ের শতকের প্রথম ভাগে হুননেতা তোরমান পাঞ্জাব থেকে অগ্রসর হয়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে তার অনেকখানি স্থান অধিকার করে। তোরমানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মিহিরকুল ৫১৫ খ্রিস্টাব্দে হুনদের রাজা হন। তাঁর রাজধানী ছিল শকল বা শিয়ালকোট। মিহিরকুল ছিলেন যেমন শক্তিশালী তেমনি নিষ্ঠুর। বৌদ্ধদের উপর তিনি পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়েছিলেন, যদিও প্রথমদিকে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মিহিরকুল মধ্য ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হলে মন্দাশোরের রাজা যশোধর্মনের নিকট পরাজিত হন। ছয়ের শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মিহিরকুল রাজত্ব করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

www.pathagar.com

ছয়ের শতকের শেষ দিকে কনৌজের মৌখরী রাজবংশ এবং থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজবংশের আক্রমণের ফলে হুনশক্তি বিলুপ্ত হয়। হুনরা ক্রমে ভারতীয় সমাজে মিশে যায়। এ হূনদের থেকেই রাজপুতদের উৎপত্তি হয়েছিল বলে পণ্ডিতরা ধারণা করেন।

সৌরাষ্ট্রের মৈত্রক বংশ

পাঁচের শতকের শেষ ভাগে সৌরাষ্ট্রের মৈত্রকগণ ভটার্ক-এর নেতৃত্বে মৈত্রক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এ বংশের প্রথম কয়েকজন রাজা হুনদের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। এ রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল বলভী। রাজত্বকালের ক্রম অনুসারে এরা হলেনঃ ভটার্ক, ধরসেন, দ্রোণ সিংহ, প্রথম ধ্রুবসেন ধরপত্ত, গৃহসেন ও দ্বিতীয় ধরসেন। হুন সাম্রাজ্যের পতনের পর এঁরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় ধরসেনের পুত্র শিলাদিত্য ছিলেন মৈত্রক বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। তিনি বলভী রাজ্যকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৬০৬ থেকে ৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

শিলাদিত্যের পরে যথাক্রমে তৃতীয় ধরসেন, দ্বিতীয় ধ্রুবসেন ও চতুর্থ ধরসেন রাজত্ব করেন। এঁরা ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এ রাজারা থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। দ্বিতীয় ধ্রুবসেন হর্ষবর্ধনের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। চতুর্থ ধরসেনের পর যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শিলাদিত্য রাজত্ব করেন। আটের শতকে আরবদের আক্রমণে বলভী রাজ্য দুর্বল হয়। আরবরা ৭২৫ থেকে ৭৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বলভী আক্রমণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত চালুক্য, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের (এদের কথা পরে বলা হয়েছে) উদয়ের ফলে বলভী রাজ্য বিলুপ্ত হয়।

বলভী রাজ্য ব্যবসাবাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। বলভী নগরী ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। নালন্দার মতো বলভীও ছিল সে যুগের একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং বলভীর শিক্ষা প্রণালীর প্রশংসা করেছেন। ভারতের সব অঞ্চল থেকে অনেক উচ্চ শিক্ষার্থী বলভীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসতেন। শোনা যায়, বলভীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের নানা রাজ্যে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা হত।

মৌখরী বংশ

মৌখরীগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। প্রাচীন কাল থেকেই উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এঁরা বাস করতেন। খ্রিস্টীয় ছয়ের শতকে মৌখরীদের একটি দল গয়ার নিকটে রাজত্ব করতেন। এই মৌখরীদের দুটি শাখার উল্লেখ বিভিন্ন প্রাচীন লিপি ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রথম শাখার রাজারা ছিলেন যথাক্রমে যজ্ঞ বর্মণ, শার্দুল বর্মণ ও অনন্ত বর্মণ। এঁরা সম্ভবত গুপ্ত সম্রাটের অধীনস্থ সামন্ত ছিলেন। মৌখরীদের অপর শাখার রাজারা সম্ভবত স্বাধীন রাজা ছিলেন। মৌখরীদের এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিবর্মণ। তাঁর পরে আদিত্যবর্মণ রাজা হন। এ দুইজন ছয়ের শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করেছেন। আদিত্য বর্মণের পর তাঁর পুত্র ঈশ্বর বর্মণ রাজা হন। তিনি ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করতেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি মালবের রাজা যশোধর্মনকে পরাজিত করেছিলেন। ঈশ্বর বর্মণের পর তাঁর পুত্র ঈশান বর্মণ রাজা হন। তিনিই ছিলেন মৌখরী বংশের সবচেয়ে শক্তিমান রাজা। এঁর রাজত্বকালেই মালবের গুপ্ত বংশের সাথে মৌখরীদের যুদ্ধ হয়।

www.pathagar.com

ঈশান বর্মণের পরে যথাক্রমে সর্ব বর্মণ (৫৭৬-৫৮০খৃঃ), অবন্তি বর্মণ (৫৮০-৬০০ খৃঃ) এবং গ্রহ বর্মণ (৬০০-৬০৬ খৃঃ) রাজা হন।

থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধন গ্রহবর্মণের সাথে নিজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়েছিলেন। এর ফলে মৌখরীদের শত্রু মালবের গুপ্তবংশের সাথে প্রভাকরের তথা থানেশ্বরের শত্রুতার সৃষ্টি হয়। মৌখরী ও থানেশ্বরের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, মালবের গুপ্তরাজ্য দেবগুপ্ত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পর দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক একযোগে মৌখরী রাজ্য আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করেন। এ যুদ্ধে গ্রহবর্মণ নিহত এবং রাজ্যশ্রী বন্দী হন।

মৌখরীরা হুনদের আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিহত করে কিছুকাল পর্যন্ত উত্তর ভারতে রাজনৈতিক শান্তি বজায় রেখেছিল।

মালবের গুপ্তবংশ

মালবের গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল কৃষ্ণগুপ্ত। আনুমানিক ৫১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পরে যথাক্রমে হর্ষগুপ্ত ও জীবগুপ্ত রাজা হন। এ বংশের চতুর্থ রাজা তৃতীয় কুমার গুপ্ত ছিলেন মৌখরী রাজ ঈশান বর্মণের সমসাময়িক। এ দুই রাজবংশের মধ্যে প্রথমে মিত্রতা ছিল। পরে এ দুই বংশের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এ শত্রুতা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল পর্যন্ত (৬০৬–৬৪৭খৃঃ) বজায় ছিল। এক পর্যায়ে গুপ্তরাজা দেবগুপ্ত এবং গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক সম্মিলিতভাবে মৌখরী রাজ্য আক্রমণ করেন ও সেখানকার রাজা গ্রহবর্মণকে হত্যা করেন। আদিত্যসেন ছিলেন মালবের গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে শক্তিমান রাজার অভাব ঘটে। তখন আদিত্যসেন সুযোগ পেয়ে নিজ রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন। তিনি মৌখরী রাজ্যের সাথে নতুন করে মিত্রতা স্থাপন করেন। গৌড়ের সাথেও তাঁর সদ্ভাব বজায় ছিল। তিনি ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। দ্বিতীয় জীবগুপ্ত ছিলেন এ বংশের শেষ রাজা। তিনি আটের শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করতেন বলে জানা গেছে। গৌড় রাজ্যের বিস্তারের ফলেই শেষ পর্যন্ত মালবের গুপ্তবংশের অবসান ঘটেছিল।

বাকাটক বংশ

বাকাটকদের রাজ্য মধ্য-ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। বাকাটক রাজারা আসলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়িক কালেই রাজত্ব করতেন। তিন থেকে ছয়ের শতকের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে যতগুলো রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছিল তার মধ্যে বাকাটক বংশই ছিল সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। বাকাটক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিন্ধ্যশক্তি নামক একজন সাধারণ ব্যক্তি। তাঁর পুত্র প্রথমে প্রবরসেন শক্তিমান রাজা ছিলেন। তিনি নর্মদা নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

প্রবরসেনের পর তাঁর পৌত্র প্রথম রুদ্রসেন রাজা হন। রুদ্রসেনের পুত্র প্রথম পৃথিবীসেন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। পৃথিবীসেনের পুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সাথে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হয়েছিল। রুদ্রসেনের মৃত্যুর পর রানী প্রভাবতী নিজ নাবালক পুত্র দিবাকর সেনকে রাজা করে তাঁর পক্ষ থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

বাকাটকরা এর পর আরো অনেক কাল রাজত্ব করেছিলেন। খ্রিস্টীয় ছয়ের শতকে কলচুরি নামক দক্ষিণ ভারতের অন্য এক রাজবংশের হাতে বাকাটক বংশের অবসান ঘটে।

দক্ষিণ ভারতের শিল্পসাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে বাকাটকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান

www.pathagar.com

রয়েছে। বাকাটক রাজারা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁদের অনেকেই শিবের উপাসক ছিলেন। তবে দ্বিতীয় রুদ্রসেন ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। বাকাটক রাজারা হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে বহু যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রথম প্রবরসেন সাতটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। বাকাটক রাজারা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন।

বাকাটক রাজারা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী ছিলেন। এঁদের অনেকেই নিজেরা গ্রন্থ রচনা করেছেন। রাজা সর্বসেন 'হরিবিজয়' নামে প্রাকৃত ভাষায় একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন! তাঁর রাজধানী শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র ছিল। দ্বিতীয় প্রবর সেন প্রাকৃত ভাষায় 'সেতুবন্ধন' এবং অন্যান্য অনেক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। শোনা যায় মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় প্রবর সেনের রাজসভায় কিছুকাল অবস্থান করেন। অনেকে মনে করেন যে ঐ সময়েই কালিদাস তাঁর বিখ্যাত 'মেঘদূত' কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

বাকাটক রাজারা স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিগোয়ার মন্দিরটি তাঁদের আমলেই নির্মিত হয়েছিল। এ মন্দিরে স্থাপিত গঙ্গা যমুনার মূর্তি ভাস্কর্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। অজন্তার ছয় ও সাত নম্বর বিহার-গুহা এবং উনিশ নম্বর চৈত্য-গুহা বাকাটকদের আমলেই নির্মিত হয়েছিল।

মন্দাশোর রাজ্য : যশোধর্মন

খ্রিস্টীয় ছয়ের শতকের প্রথমার্ধে রাজা যশোধর্মন মধ্যভারতে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মন্দাশোর ছিল ঐ রাজ্যের রাজধানী। যশোধর্মন হুন সম্রাট মিহিরগুলকে পরাজিত করেছিলেন। এ কাজের দ্বারা তিনিও ভারতবর্ষে হুন সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ৫৩০ থেকে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে যশোধর্মন রাজত্ব করতেন বলে অনুমান করা হয়।

বাংলার গৌড় রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে বাংলা অঞ্চলে গৌড় রাজ্যের উদয় হয়েছিল। ঐ সময়ে গৌড় রাজ্য এখনকার ভারতের অন্তর্গত পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলা ও বর্ধমান বিভাগের উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের তথা বাংলা অঞ্চলের প্রথম স্বাধীন রাজা। রাজা শশাঙ্কের পরিচয় ঠিক মতো জানা যায় না। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, শশাঙ্ক গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে একজন বড় সামন্ত বা জমিদার ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে সে সুযোগে ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের কিছুকাল আগেই শশাঙ্ক গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গৌড় রাজ্য পশ্চিমে কনৌজ রাজ্যের সীমা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু মৌখরী রাজাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শশাঙ্কের রাজ্য পশ্চিম দিকে আর বিস্তৃত হতে পারে নি।

এ সময়ে থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সাথে মৌখরী বংশীয় রাজা গ্রহ বর্মণের বিবাহ হওয়ায় এ দুই রাজ্যের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। তখন মালবের গুপ্ত বংশীয় রাজা দেবগুপ্ত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। অতঃপর এ দুই রাজশক্তি একযোগে

www.pathagar.com

গ্রহ বর্মণের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং গ্রহবর্মণকে হত্যা করে তাঁর রানীকে বন্দী করেন। রানী রাজ্যশ্রী ছিলেন থানেশ্বরের তৎকালীন রাজা রাজ্যবর্ধনের ভগ্নী। রাজ্যবর্ধন ভগ্নীকে রক্ষা করার জন্য দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন কিন্তু রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করার আগেই শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হন। হর্ষবর্ধন কামরূপের (বর্তমান আসাম অঞ্চলের) রাজার সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। অতঃপর এ দুই রাজা একযোগে গৌড় আক্রমণ করেন। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকে এককালে আক্রান্ত হয়ে শশাঙ্ক বিব্রত হয়ে পড়েন। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলাফল নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। মনে হয়, হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে চূড়ান্তভাবে দমন করতে পারেননি।

থানেশ্বর রাজ্য : হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য

খ্রিস্টীয় ছয়ের শতকের শেষ ভাগে পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত থানেশ্বরকে কেন্দ্র করে একটা রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল। পুষ্যভূতি বংশের রাজারা এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজার নাম হর্ষবর্ধন। পুষ্যভূতি বংশের প্রাচীনতম যে রাজাদের নাম জানা গেছে তাঁরা হলেন, যথাক্রমে, নরবর্ধন, রাজ্যবর্ধন ও আদিত্যবর্ধন।

এ বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন প্রভাকরবর্ধন। তিনি ৫৮০ থেকে ৬০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে থানেশ্বর রাজ্য এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। প্রভাকরবর্ধন হুন, গুর্জর এবং মালবদের পরাজিত করে নিজের রাজ্য সীমাকে মালব ও গুজরাট পর্যন্ত বর্ধিত করেন। তিনি মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণের সাথে নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন। হুনদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়ে মালবের গুপ্ত বংশীয় রাজা দেবগুপ্ত ও গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক একযোগে কনৌজ আক্রমণ করে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণকে নিহত করেন এবং তাঁর রানী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। এ সংবাদ পেয়ে রাজ্যবর্ধন তাঁর ভগ্নীকে মুক্ত করার জন্য মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবগুপ্তের মিত্র রাজা শশাঙ্কের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হর্ষবর্ধন (রাজত্বকাল ৬০৬–৬৪৭ খৃঃ)

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজাহীন কনৌজের মন্ত্রীদের অনুরোধে মৌখরীরাজ্য তথা কনৌজ রাজ্যের শাসনভারও তিনি গ্রহণ করেন। ৬১২ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্য দুটোকে সংযুক্ত করে তিনি উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য নির্মাণ করেন। নিজের রাজধানীও তিনি থানেশ্বর থেকে কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। এর ফলে কনৌজ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

সিংহাসন আরোহণ করে প্রথমেই হর্ষবর্ধন তার ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হন। শশাঙ্ককে দমন করার উদ্দেশ্যে তিনি কামরূপ-রাজ ভাস্কর বর্মণের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

কামরূপ রাজ্য (বর্তমান আসাম অঞ্চল) ছিল শশাঙ্কের গৌড়রাজ্যের পূর্বদিকে অবস্থিত। হর্ষবর্ধন প্রথমে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন এবং তারপরে কামরূপরাজের সাথে মিলে একযোগে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

এ যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল জানা যায় না। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি নিজ রাজ্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে শশাঙ্কের মৃত্যু হওয়ার পর হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেছিলেন। এর পর শশাঙ্কের রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশও হর্ষবর্ধন জয় করে নিয়েছিলেন। একইকালে কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মণ পূর্বদিক থেকে অগ্রসর হয়ে গৌড় রাজ্যের এক বড় অংশ অধিকার করেছিলেন। ভাস্কর বর্মণ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণও অধিকার করেছিলেন।

হর্ষবর্ধন তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বহু দেশ জয় করেছিলেন। উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তিনি গঞ্জাম অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। গঞ্জামে তিনি মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন।

হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতেও অভিযান চালিয়েছিলেন। ৫৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক বিশাল সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে দক্ষিণ ভারতের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারত বিজয়ের আশা ত্যাগ করেন।

হর্ষবর্ধন পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত সৌরাষ্ট্রের বলভী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে বলভীর রাজা দ্বিতীয় ধ্রুবসেনকে পরাজিত করেন। তবে এ বিজয় সাময়িক বিজয় হয়ে থাকতে পারে। কথিত আছে, ধ্রুবসেন গুর্জররাজা দদ্দ-এর সাহায্য নিয়ে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

হর্ষবর্ধন সিন্ধুদেশ ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু সিন্ধু বা কাশ্মীর তিনি অধিকার করতে পেরেছিলেন বলে জানা যায় না।

হর্ষবর্ধন প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকতে চেষ্টা করতেন। রাজকর্মচারীরা যাতে কর্তব্য পালন করে সে দিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন। হর্ষবর্ধন মন্ত্রীদের সাহায্যে রাজকার্য চালাতেন। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হত। রাজকর্মচারীদের বেতন দেওয়া হত না, তার পরিবর্তে তাঁদের ভূসম্পত্তি প্রদান করা হত।

মৌর্য ও গুপ্তযুগের মতো হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশকে তখন 'ভুক্তি' বলা হত। প্রত্যেক প্রদেশ কয়েকটি 'বিষয়' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। গ্রাম ছিল সবচেয়ে ছোট শাসন বিষয়ক বিভাগ। গ্রামের শাসনভার 'গ্রামিক' নামক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে সরকারের রাজস্ব সংগৃহীত হত প্রধানত জমির খাজনা থেকে। উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজাকে খাজনা হিসাবে প্রদান করতে হত। এ ছাড়া বণিকদেরও পৃথক কর প্রদান করতে হত।

হর্ষবর্ধনের আমলে কঠোর দণ্ডবিধি প্রচলিত ছিল। সাধারণ অপরাধে কারাদণ্ড এবং গুরুতর অপরাধে অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ রকম কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও হর্ষবর্ধনের আমলে গুপ্তযুগের তুলনায় অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হর্ষবর্ধন তাঁর রাজত্বকালের প্রথম পঁচিশ বছর শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি মহাযান পন্থার বৌদ্ধমতের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ হন নি। মনে হয় তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিব ও সূর্যের উপাসক ছিলেন। (হর্ষবর্ধনের পিতা সূর্যের উপাসক ছিলেন বলে কথিত আছে)।

www.pathagar.com

হর্ষবর্ধন স্বয়ং সুপণ্ডিত এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতে আগমন করেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে হর্ষবর্ধনের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। হিউয়েন সাং বলেছেন, হর্ষবর্ধন তাঁর রাজস্বের সিকি ভাগ সাহিত্যসেবীদের জন্য ব্যয় করতেন।

হর্ষবর্ধনের রাজসভায় বহু বিখ্যাত পণ্ডিত অবস্থান করতেন। কবি বাণভট্ট, কবি মৌর্য এবং কবি ভর্তুহরি তাঁর রাজসভায় ছিলেন। হর্ষবর্ধন স্বয়ং 'রত্নাবলী', 'নাগনন্দা' ও প্রিয়দর্শিকা' এ তিন খানি সার্থক নাটক রচনা করেছিলেন।

হর্ষবর্ধনের সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে হর্ষবর্ধন প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন।

হর্ষবর্ধনের পরের যুগের ইতিহাস

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর প্রায় সাথে সাথেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত কনৌজের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। কনৌজের অধিকার নিয়ে তখন উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রাম শুরু হয়। এ সংগ্রামে মূলত কনৌজের প্রতিহার রাজ্য, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজাগণ ও বাংলার পাল বংশীয় রাজাগণ লিপ্ত ছিলেন। এ সংগ্রামে কখনও পাল বংশ, কখনও রাষ্ট্রকূট রাজারা সাময়িক ভাবে কনৌজ অধিকার করতে পারলেও, প্রধানত প্রতিহার বংশীয় রাজারাই বেশির ভাগ সময়ে কনৌজকে নিজেদের অধীনে রাখতে সমর্থ হন। প্রতিহার বংশকে অনেক ঐতিহাসিক গুর্জর-প্রতিহার নামেও অভিহিত করে থাকেন । গুর্জর-প্রতিহাররা রাজপুত বলে কথিত। এদের ইতিহাস নিচে প্রদান করা হল। বাংলায় পালবংশের পরে সেনবংশের রাজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার পালবংশের ইতিহাস এবং তৎপরবর্তী সেনবংশের ইতিহাস নিচে প্রদত্ত হল। রাষ্ট্রকূটদের ইতিহাস দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য

গুর্জর-প্রতিহাররা রাজপুত নামে পরিচিত। রাজপুতরা যদিও নিজেদের ক্ষত্রিয় এবং ভারতীয় বলে দাবি করে থাকেন, আসলে তাঁরা আদিতে ভারতীয় ছিলেন না। পণ্ডিতদের অভিমত হল, রাজপুতরা শক, হুন প্রভৃতি বিদেশাগত জাতির বংশধর। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে কনে, রাজপুতরা হুনদের একটি শাখা তথা শ্বেত হুনদের বংশধর।

খ্রিস্টীয় পাঁচের শতকে হুনরা মধ্য এশিয়াতে যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, উত্তর পশ্চিম ভারতের একাংশ ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হুনদের ঐ সাম্রাজ্য অবশ্য ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। ভারতবর্ষে আগত ঐ হুনদেরই একটি দুর্ধর্ষ দল গুর্জর নামে পরিচিত হয়েছে। তারা গুজরাট ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করতে শুরু করে। এরাই পরে কনৌজে যে রাজ্য স্থাপন করেছিল সেটাই ইতিহাসে গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য নামে খ্যাত হয়েছে। গুর্জররা ছাড়াও পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে যে জাটদের দেখা যায় এবং হিমালয়ের পাদদেশে যে রাজপুতদের দেখা যায় তারাই

www.pathagar.com

হূনদের বংশধর বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। তবে রাজপুতদের শক্তিমত্তার বিশেষ প্রকাশ গুর্জর-প্রতিহার বংশেই লক্ষ্য করা যায়।

ছয়ের শতকে গুর্জরগণ বর্তমান রাজস্থানের দক্ষিণে এবং গুজরাটের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। ঐ রাজবংশ তখনই ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হয়েছিল। কিছুকাল পরে আটের শতকের মধ্যভাগে প্রথম নাগভট নতুন এক গুর্জর-প্রতিহার রাজবংশ স্থাপন করেন। এ রাজবংশের চতুর্থ রাজা বৎসরাজ বীর যোদ্ধারূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি গুর্জর-প্রতিহারদের সব শাখাগুলোকে একত্রিত করে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব'র কাছে পরাজিত হওয়ায় তাঁর অভিযান বন্ধ হয়ে যায়।

বৎসরাজের পর রাজা হন দ্বিতীয় নাগভট্ট। শোনা যায়, উত্তরে সিন্ধু নদ থেকে দক্ষিণে অন্ধ্র এবং পশ্চিমে কর্থিয়াওয়াড় থেকে পূর্বে কলিঙ্গ পর্যন্ত তাঁর শাসন বিস্তৃত হয়েছিল। তখন কনৌজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাংলার বিখ্যাত রাজা ধর্মপালের আশ্রিত রাজা চক্রায়ুধ। দ্বিতীয় নাগভট্ট ধর্মপালের বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং চক্রায়ুধকে সরিয়ে কনৌজে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ সময়ে ভারতবর্ষে কান্যকুব্জ বা কনৌজের মর্যাদা ছিল অসাধারণ।

নাগভট্টের পুত্র রামভদ্র মাত্র বছর দুয়েক রাজত্ব করেছিলেন। তারপর রাজা হন নাগভট্টের পৌত্র মিহির ভোজ বা প্রথম ভোজ। ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে মিহির ভোজ প্রায় পঞ্চাশ বছর গৌরবের সাথে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিহার বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। শোনা যায় তাঁর আমলে প্রতিহার সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পশ্চিমে শতদ্রু নদী থেকে পূর্বে উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এ যুগে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা এবং বাংলার পাল রাজা। কথিত আছে, মিহির ভোজ মুঙ্গেরের কাছে পালরাজার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। তখন পূর্ব ভারতে ও মগধে ধর্মপালের পুত্র দেবপালের রাজ্য ছিল। এ সময়ে সিন্ধুদেশের একাংশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মিহির ভোজের পর তাঁর পুত্র মহেন্দ্রপাল রাজা হন। তারপর রাজা হন দ্বিতীয় ভোজ। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তাঁর ভাই মহীপাল তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ মহীপালকে যুদ্ধে হারিয়ে কনৌজ শহর পর্যন্ত দখল করেন। মহীপাল পরে অন্যের সাহায্য নিয়ে কোনক্রমে নিজ রাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। কিন্তু এরপর থেকে গুর্জর-প্রতিহার রাজ্যের পতন আরম্ভ হয় এবং এগার শতকে ঐ রাজ্য বিলুপ্ত হয়। তারপর মালবের পরমার রাজ্য, বুন্দেল-খণ্ডের চান্দেল্ল রাজ্য, মধ্য ভারতের চেদি রাজ্য, কনৌজের গহড়ওয়াল বা রাঠোর রাজ্য, আজমীরের চৌহান রাজ্য, গুজরাটের চালুক্য বা সোলাঙ্কি রাজ্য—এরাই গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হল। এদের মধ্যে পরমার বংশই সমধিক শক্তিশালী ছিল।

বাংলার পাল সাম্রাজ্য

গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে বাংলা অঞ্চলে প্রায় একশ বছর ধরে ঘোর অশাসন ও অরাজকতা চলতে থাকে। বাংলার ইতিহাসে এ অরাজকতার যুগ 'মাৎস্যন্যায়ের যুগ' নামে পরিচিত। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে বিনা দ্বিধায় খেয়ে ফেলে সে রকম ভাবে বাংলার এ অরাজকতার যুগে শক্তিমানরা শক্তিহীনদের ধনসম্পদ ও স্বাধীনতা হরণ করত—এ কারণেই ঐ যুগকে মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলা হয়।

www.pathagar.com

৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হলে শশাঙ্কের এক পুত্র, মানবদেব গৌড় রাজ্যকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলবতী হয়নি।

গোপাল

বাংলার অরাজক অবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্য থেকে গোপাল নামক এক সামন্ত জমিদারকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ গোপালই বাংলার পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। গোপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি ৭৫০ থেকে ৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (মতান্তরে, ৭৫৬ থেকে ৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) রাজত্ব করেছিলেন। গোপাল সমগ্র বাংলাদেশকে নিজের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হন।

ধর্মপাল (আ, ৭৭০-৮১০ খৃঃ বা ৭৮১-৮২১ খৃঃ)

গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল (৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বা ৭৮১ খ্রিস্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্মপাল যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতিতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ক্ষুদ্র পালরাজ্যকে বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারত জয় করার চেষ্টা করেন। ফলে উত্তর ভারতের আধিপত্য নিয়ে বাংলার পাল বংশ, পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার বংশ এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ধর্মপাল সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে গুর্জর প্রতিহারদের রাজা বৎসরারাজ তাঁকে পরাজিত করেন। কিন্তু বৎস রাজ স্বয়ং রাষ্ট্রকূট রাজ ধ্রুবর হাতে পরাজিত হলে, সে সুযোগে ধর্মপাল পুনরায় উত্তর ভারত জয় করতে অগ্রসর হন। ধর্মপাল মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করার পর আরো পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে ধ্রুব তাঁকে বাধা দেন। ধর্মপাল যুদ্ধে পরাজিত হন কিন্তু ধ্রুব বাংলার দিকে অগ্রসর না হয়ে দাক্ষিণাত্যে নিজ রাজ্যে ফিরে যান। তখন ধর্মপাল পুনরায় পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে কনৌজ জয় করেন এবং সেখানকার সিংহাসনে নিজ মনোনীত রাজা চক্রায়ুধকে স্থাপন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে গুর্জর-প্রতিহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট কনৌজ অধিকার করেন এবং বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে মুঙ্গেরের নিকট ধর্মপালকে পরাজিত করেন। পাল রাজ্যের এই বিপদের সময়ে অকস্মাৎ রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দ এসে নাগভট্টকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। নাগভট্ট নিজ রাজ্যরক্ষার জন্য ফিরে যান। পাল সাম্রাজ্য এ ভাবে বিপদ থেকে রক্ষা পায়। এরপর তৃতীয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে নিজ রাজ্যে ফিরে যান এবং ধর্মপাল অবাধে উত্তর ভারতে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। বাংলাদেশ ও বিহার ধর্মপালের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। রাষ্ট্রকূট রাজারা অবশ্য দাবি করেন যে, ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন।

দেবপাল (৮১০-৮৫০ খৃঃ ৮২১-৮৬১ খৃঃ)

ধর্মপালের পুত্র দেবপালকে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে গণ্য করা হয়। দেবপাল উড়িষ্যা ও আসাম জয় করেছিলেন। আসাম তাঁর করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং উড়িষ্যাকে পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উত্তর ভারতের রাজারা সম্ভবত পাল রাজাদের আধিপত্য স্বীকার করতেন। পাল রাজারা তাঁদের নিকট থেকে কর পেতেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের গৌরব ক্রমে লোপ পেতে থাকে। দেবপালের পরে যথাক্রমে বিগ্রহপাল, নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল সিংহাসনে

www.pathagar.com

আরোহণ করেন। এঁরা সকলেই–দুর্বলচেতা রাজা ছিলেন। এ সময়ে কম্বোজ নামে এক জাতি পাল রাজ্য আক্রমণ করেছিল। পাল বংশের অষ্টম রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল ছিল ৯৬০ থেকে ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ (মতান্তরে ৯৬৯—৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ)। ঐ সময়ে পাল সাম্রাজ্য অবনতির চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

পাল বংশের নবম রাজা প্রথম মহীপাল কম্বোজ জাতিকে বিতাড়িত করে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব ও প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে মহীপাল সমগ্র মগধ জয় করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। মহীপাল ৯৮৮ থেকে ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (মতান্তরে ৯৯৫ থেকে ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) রাজত্ব করেছিলেন।

মহীপালের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের চোল রাজা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন (১০২৩ খৃঃ)। চোল বাহিনী পরে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যায়। মহীপালের রাজত্বকালের শেষ ভাগে চেদি রাজ গাঙ্গেয়দেব তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। মহীপালের রাজত্বকালেই গজনীর মুসলিম রাজশক্তি ভারতবর্ষে অভিযান চালাতে শুরু করেছিল। পরে তের শতকে দিল্লীর মুসলিম সুলতানরা বাংলা জয় করেছিলেন।

প্রথম মহীপালের মৃত্যুর পর পাল বংশ আবার ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। প্রথম মহীপালের পর যথাক্রমে নয়পাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হন। নয়পালের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১০৩৮ থেকে ১০৫৪ খৃঃ মতান্তরে ১০৪৩ থেকে ১০৫৮খৃঃ) কলচুরি রাজ কর্ণ বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে (আঃ ১০৪৭ থেকে ১০৭০ খৃঃ) মতান্তরে (১০৫৮ থেকে ১০৭৫ খৃঃ) দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজারা বাংলাদেশ আক্রমণ করে ছিলেন। এ সময়েই পালরাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। তৃতীয় বিগ্রহ পালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হন। মহীপালের রাজত্বকালে (আঃ ১০৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে) বাংলার পাল রাজ্যে চাষী কৈবর্তদের এক বিদ্রোহ ঘটে। এ বিদ্রোহ কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে খ্যাত হয়েছে। রাজা মহীপাল বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। বিদ্রোহীদের নায়ক দিব্য উত্তর বাংলায় বা বরেন্দ্র ভূমিতে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। দিব্য দক্ষ শাসক দিলেন। কৈবর্ত বংশের মোট তিনজন রাজা পঁচিশ বা ত্রিশ বছর ধরে (১০৭১ থেকে ১১০০ খৃঃ) উত্তর বঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। দিব্যের মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই রুদোক এবং রুদোকের মৃত্যুর পরে রুদোকের ছেলে ভীম বরেন্দ্র ভূমির রাজা হয়েছিলেন।

এদিকে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দ্বিতীয় শূরপাল কিছুকাল মগধের পালরাজ্যে রাজত্ব করেন। শূরপালের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রামপাল ১০৭৭ বা ১০৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। রামপালও প্রথমে মগধেই রাজত্ব করতেন। রামপালই উত্তর বঙ্গের কৈবর্ত রাজা ভীমকে পরাজিত করে উত্তর বঙ্গকে পুনরুদ্ধার করেন অর্থাৎ পাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

রামপালই ছিলেন পাল বংশের পরাক্রান্ত রাজা। রামপাল ১০৭৭ থেকে ১১৩০ বা ১০৮২ থেকে ১১২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

রামপালের পর যথাক্রমে কুমার পাল (আঃ ১১৩০ থেকে ১১৪০ খৃঃ মতান্তরে ১১২৪–১১২৯ খৃঃ), তৃতীয় গোপাল (আঃ ১১৪০ থেকে ১১৪৩ বা ১১৪৪ খৃঃ মতান্তরে ১১২৯–১১৪৩ খৃঃ) এবং মদনপাল (আঃ ১১৪৩/১১৪৪ থেকে ১১৬১খৃঃ) রাজত্ব করেন। মদনপালই সম্ভবত শেষ পাল সম্রাট। ইতিমধ্যে সেন রাজবংশের রাজা বিজয় সেন বাংলাদেশ অধিকার করেন। পালরাজা মদনপালের কর্তৃত্ব মগধে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশে আর পাল রাজাদের কোনো অধিকার বজায় থাকে না। মদনপালের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যে মগধ থেকেও পাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সেন রাজাদের শাসন

পাল বংশের পর বাংলাদেশে সেন বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেন রাজবংশের মানুষরা আগে প্রাচীন কর্ণাট দেশের অর্থাৎ আধুনিক কালের দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন, সেন রাজারা প্রথমে পাল রাজাদের অধীনে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। সেন বংশের প্রথম যে ব্যক্তির নাম জানা যায় তিনি হলেন সামন্ত সেন। তবে সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনই ছিলেন সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু হেমন্ত সেনও সম্ভবত পালদের অধীনস্থ একজন বড় সামন্তই ছিলেন।

হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয়সেন ছিলেন সেন বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। পাল শাসন ধ্বংস হওয়ার পর বাংলার রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল এবং বাংলাদেশ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বিজয় সেন সেই খণ্ড রাজ্যগুলো জয় করে বাংলায় এক অখণ্ড রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিজয় সেন ১০৯৬ থেকে ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

বিজয় সেনের পর তাঁর ছেলে বল্লাল সেন রাজা হন। তিনি ১১৫৮ থেকে ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ (মতান্তরে ১১৬০ থেকে ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বল্লাল সেন একজন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি বাংলার হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ —এ তিন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। বল্লাল সেনের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বল্লাল সেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৭৯ বা ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। লক্ষ্মণ সেনের আমলেই ১২০৪ অথবা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করেন এবং বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের মুখে লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে আসেন। ১২০৫ বা ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হয়। এর কিছুকাল পরে, ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই, সেন রাজ বংশের অবসান ঘটে।

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস

দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস উত্তর ভারতের ইতিহাস থেকে কিছুটা পৃথক এবং স্বতন্ত্র। উত্তর ভারতের ইতিহাস প্রভাবিত হয়েছে উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে আগত নতুন নতুন বিজয়ী জাতিসমূহের কার্যকলাপ দ্বারা। অপরপক্ষে দক্ষিণ ভারত মূলত একটি উপদ্বীপ বলে, প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক কালে বহির্বিশ্বের সাথে সমুদ্রপথে দাক্ষিণাত্যের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়া, রোম, আরবদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের সাথে দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অবশ্য, দাক্ষিণাত্য ভারতীয় উপমহাদেশেরই অংশ এবং উত্তর ভারতের ইতিহাস দ্বারাই দক্ষিণ ভারত মূলত প্রভাবিত হয়েছে। তবে দক্ষিণ ভারত বিন্ধ্য-সাতপুরা-পর্বত দ্বারা উত্তর ভারত থেকে অংশত বিচ্ছিন্ন বলে, দক্ষিণ ভারত সর্বদাই উত্তর ভারতের ইতিহাস দ্বারা বিলম্বে প্রভাবিত হয়েছে। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে যে সকল রাজশক্তি বিদ্যমান ছিল তাদের বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

www.pathagar.com

বাদামির চালুক্য বংশের ইতিহাস

চালুক্য বংশের উদয় ঘটে খ্রিস্টীয় ছয়ের শতকে। এ বংশের উত্থানের সময় থেকেই প্রকৃত পক্ষে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের শুরু হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন। চালুক্যরা উত্তর ভারত থেকে আগত রাজপুত জাতি বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে চালুক্যরা গুর্জর জাতির এক শাখা। আবার অনেকে তাঁদের স্থানীয় কোনো গোষ্ঠীর লোক বলে মনে করেন। বাদামির চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা প্রথম পুলকেশী। এঁরা বাতাপি বা বাদামির চালুক্য বংশ নামে পরিচিত। বাতাপি ছিল বর্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটি রাজ্য।

প্রথম পুলকেশীর পর রাজা হন তাঁর পুত্র কীর্তিবর্মা। ইনিই ছিলেন চালুক্য প্রাধান্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলের সমস্ত স্থান তিনি জয় করেছিলেন। দক্ষিণ দিকে তিনি চোল, পাণ্ড্য, চের প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলো জয় করেছিলেন; উত্তর দিকে তিনি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলে মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের কিছু অংশ তিনি অধিকার করেছিলেন। তিনি মগধ, কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেছিলেন বলে শোনা যায়।

কীর্তিবর্মার পর তাঁর ভাই মঙ্গলেশ সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কীর্তিবর্মার পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে নিহত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন বাদামির চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন, যার ফলে হর্ষবর্ধন আর দক্ষিণ ভারতের দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারেননি। দ্বিতীয় পুলকেশী দাক্ষিণাত্যের পল্লবদের পরাজিত করে বেঙ্গী অঞ্চল দখল করেছিলেন। তাঁর আমলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য মালভূমি চালুক্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর সাথে তিনি দূত বিনিময় করেছিলেন বলে শোনা যায়। এশিয়ার একজন পরাক্রান্ত রাজা হিসাবে দ্বিতীয় পুলকেশী ঐ সময়ে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত (সম্ভবত ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে) তিনি পল্লবদের নিকট পরাজিত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। এর পর চালুক্য শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন চালুক্যদের এক শাখা রাজ্যের পূর্ব দিকে সরে যায়। এঁরা পূর্ব চালুক্য নামে পরিচিত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর পরবর্তী রাজাদের মধ্যে প্রথম বিক্রমাদিত্য এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লেখযোগ্য। আটের শতকের মধ্যভাগে রাষ্ট্রকুটদের নিকট পরাজিত হওয়ায় চালুক্য রাজত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

বাদামি বা বাতাপির চালুক্য রাজারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা বৈদিক ধর্মের অনুসরণে অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞ করতেন। চালুক্য আমলে ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতির অশেষ উন্নতি হয়েছিল। হাতি গুহা এবং অজন্তা গুহায় অঙ্কিত দেওয়াল চিত্র এখন পর্যন্ত চালুক্যদের শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় বহন করছে। ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চালুক্যগণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তাঁরা প্রায় দুই শতাব্দী ধরে আরব সাগরের তীরস্থ বন্দরগুলোর সাথে একচেটিয়াভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করেছিলেন।

পল্লবদের ইতিহাস

খ্রিস্টীয় ছয়ের শতকে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী নগরীকে কেন্দ্র করে পল্লব রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল বলে মনে হয়। ছয়ের শতকের শেষভাগে রাজা সিংহবাহু বা সিংহবিষ্ণু সিংহাসন অধিকার

www.pathagar.com

করেন। তিনি চোল রাজ্য জয় করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের আরো কয়েকটি রাজ্যও তিনি জয় করেছিলেন।

সিংহবাহুর পরে রাজা হন তাঁর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মা। বাদামির চালুক্যদের সাথে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ৬০৯ বা ৬১০ খ্রিস্টাব্দে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট মহেন্দ্রবর্মা পরাজিত হন। পুলকেশী পল্লব রাজ্যের উত্তরাংশ তথা বেঙ্গী দখল করে নিজের ভাইকে ঐ অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন।

রাজা প্রথম মহেন্দ্রবর্মা শিল্প-সংস্কৃতি ও ধর্মকর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে ত্রিচিনপলী, চিঙ্গেলপুট এবং আর্কট অঞ্চলে পাহাড় কেটে অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। তিনি একটি শহর এবং একটি জলাশয় নির্মাণ করেছিলেন। জলাশয়টির নাম ছিল 'মহেন্দ্রবাপী'। প্রথম জীবনে তিনি জৈন ছিলেন, পরে তিনি শৈব ধর্ম গ্রহণ করেন।

মহেন্দ্রবর্মার পরে রাজা হন তাঁর পুত্র নরসিংহ বর্মা। চালুক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি তাদের সাময়িকভাবে পরাজিত করেছিলেন। নরসিংহ বর্মার আমলে দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছিল। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পল্লব রাজ্যে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ মঠ, জৈন মন্দির এবং হিন্দু মন্দির ছিল। নরসিংহ বর্মার আমলে মহাবলিপুরম-এর পাথর থেকে খোদাই করা 'সপ্তরথ' নামক মন্দিরগুলো তৈরি করা হয়েছিল।

নরসিংহ বর্মার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্র রাজা হন। তারপর রাজা হন প্রথম পরমেশ্বর বর্মা। পূর্বোক্ত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য এই পল্লবরাজ এই পরমেশ্বর বর্মাকেই পরাজিত করেছিলেন।

পরবর্তী পল্লবরাজ ছিলেন দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মা। এই রাজা স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁর আমলেই কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির এবং মহাবলিপুরম-এর সমুদ্র উপকূলস্থিত মন্দিরগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। এঁর রাজত্বকালেই চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেছিলেন। এর পর কালক্রমে চোল রাজাদের হাতে পরাজিত হওয়ার ফলে পল্লবদের ক্ষমতার অবসান ঘটে। অপরাজিত বর্মা ছিলেন পল্লব বংশের শেষ রাজা।

শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পল্লবরা ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে তাঁরাই প্রথম এক পরাক্রমশালী রাজ্য সংগঠিত করেছিলেন।

শিল্পক্ষেত্রে পল্লবদের অবদান সারা পৃথিবীর জন্য এক মহাবিস্ময়রূপে বিরাজ করছে। পল্লবদের রচিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় তাদের নির্মিত মন্দিরসমূহে। বড় বড় পাহাড় কেটে অপূর্ব কৌশলে এক একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। আবার কোনো কোনো মন্দির নির্মিত হয়েছিল এক এক খণ্ড বিশাল আকৃতির পাথর থেকে। কাঞ্চীর ত্রিপুরান্তকেশ্বর ও ঐরাবতেশ্বর-এর মন্দির এবং মহাবলিপুরম-এর মুক্তেশ্বর ও কৈলাস নাথের মন্দির পল্লবদের অপরূপ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পরিচয় বহন করছে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করেও কতগুলো মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এ সকল মন্দিরের নাম ছিল দ্রৌপদী রথ, অর্জ্জুন রথ, ভীম রথ প্রভৃতি। এক একটি বিশাল আকারের অখণ্ড পাথর থেকে খোদাই করে এক একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। মন্দিরের গায়ে দেবদেবী, নরনারী, জীবজন্তুর ছবি এবং মহাভারতের নানা কাহিনীর চিত্ররূপ খোদাই করা হয়েছিল। মহাবলিপুরম-এর মন্দিরসমূহের অনুকরণে যব-দ্বীপের (তথা জাভার) মন্দিরগুলোও নির্মিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

পল্লব রাজারা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। পল্লবরা সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাঞ্চী সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। 'কিরাতার্জুনীয়ম'-এর লেখক ভারবী রাজা সিংহবাহুর সভাকবি ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত দণ্ডিন ঐ যুগেরই একজন কীর্তিমান পণ্ডিত।

পল্লব রাজারা সাধারণভাবে ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী ছিলেন। তবে অন্য ধর্মের প্রতি তাঁরা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতেন।

কল্যাণীর চালুক্য বংশ

দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে কল্যাণীর চালুক্য রাজ্য গঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজা কাক-কে পরাজিত করে দ্বিতীয় তৈল এ রাজ্য স্থাপন করেন। তৈল ছিলেন বাদামির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বংশধর। তৈলের পরে সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ও জয়সিংহ ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয়সিংহ রাজা ভোজ-এর সমসাময়িক ছিলেন।

এর পর রাজা হন সোমেশ্বর। তিনি কল্যাণী নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি কয়েক বারে চোলদের নিকট পরাজয় বরণ করেন। সোমেশ্বরের পর দ্বিতীয় সোমেশ্বর এবং তারপর ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য রাজা হন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'চালুক্য বিক্রমাদিত্য অব্দের' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিচারব্যবস্থা, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ছিল আনুমানিক ১০৭৬ থেকে ১১২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পরে তৃতীয় তৈল, চতুর্থ সোমেশ্বর ও অন্যান্য রাজারা রাজত্ব করেন। ঐ সময়ে কলচুরি বংশের নেতা বিজ্জল কল্যাণীর সিংহাসন দখল করেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের ইতিহাস

রাষ্ট্রকূট রাজারা যাদব বংশীয় সাত্যকির বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, রাষ্ট্রকূটরা কর্ণাটকের কৃষক সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দন্তিবর্মা। তিনি সম্ভবত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সমসাময়িক ছিলেন। দন্তিবর্মা কলিঙ্গ, কোশল, কাঞ্চী, মালব ও লাট জয় করেছিলেন। তিনি চালুক্যদের পরাজিত করে মহারাষ্ট্র জয় করেছিলেন।

দন্তিবর্মার পর তাঁর চাচা কৃষ্ণরাজ ৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চালুক্যদের অবশিষ্ট রাজ্যগুলো জয় করে নেন। কৃষ্ণরাজ ইলোরায় যে কৈলাসনাথের মন্দির নির্মাণ করেছেন তার শিল্প কৌশল ও স্থাপত্যরীতি অতি অপূর্ব। ৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রাজত্বকালের অবসান ঘটে।

কৃষ্ণরাজের পর তাঁর পুত্র গোবিন্দ বা দ্বিতীয় গোবিন্দ রাজা হন। তারপর গোবিন্দকে অপসারিত করে তাঁর ভাই ধ্রুব সিংহাসন অধিকার করেন। ধ্রুব ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্বকালের মধ্যেই গুর্জর-প্রতিহারদের রাজা বৎস রাজকে পরাজিত করেছিলেন। কাঞ্চীর পল্লবদের এবং বাংলার ধর্মপালকেও তিনি পরাজিত করেছিলেন।

ধ্রুব'র পর রাজা হন তাঁর পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ। তৃতীয় গোবিন্দ প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং রাষ্ট্রকূট রাজবংশকে তিনি ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ রাজবংশে পরিণত করেছিলেন। তাঁর রাজ্য উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত ও মালব থেকে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৃতীয় গোবিন্দের পরে রাজা হন তাঁর পুত্র অমোঘবর্ষ।

www.pathagar.com

অমোঘবর্ষকে রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজারূপে গণ্য করা হয়। গুর্জর-প্রতিহারদের রাজা প্রথম ভোজ দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে অমোঘবর্ষই তাঁকে প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর আমলেই ভৃগুকচ্ছ বা ভরুচ বন্দর রাষ্ট্রকূট রাজ্যের প্রধানতম বন্দরে পরিণত হয়েছিল।

অমোঘবর্ষ সাহিত্য, শিল্পকলা ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দর্শন, সাহিত্য ও গণিত বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল। সুলেমান নামক একজন আরব বণিক ও পর্যটক অমোঘবর্ষকে তৎকালীন পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ রাজার মধ্যে একজন বলে বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে অন্য তিনজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বাগদাদের খলিফা, বাইজেন্টাইন সম্রাট ও চীনের সম্রাট।

অমোঘবর্ষ দীর্ঘ ৬৩ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তী রাজা ছিলেন তৃতীয় ইন্দ্র। তিনি গুর্জরদের রাজা মহীপালকে পরাজিত করেছিলেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ ও তৃতীয় অমোঘবর্ষ। এরা ছিলেন দুর্বল ও অকর্মণ্য। রাষ্ট্রকূট রাজ্যের শেষ প্রতাপশালী রাজা ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ। কল্যাণীর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈল শেষ রাষ্ট্রকূটরাজ রাজা কাক-কে সিংহাসনচ্যুত করলে রাষ্ট্রকূট রাজশক্তির বিলোপ ঘটে—একথা আগেই বলা হয়েছে।

সুদূর দাক্ষিণাত্যের তামিল রাজ্যসমূহের ইতিহাস

চোল রাজ্য

খ্রিস্টপূর্ব তিনের শতকে সুদূর দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্য স্বাধীন রাজ্য রূপে বিদ্যমান ছিল বলে মনে হয়, কারণ সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে এর উল্লেখ আছে। প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও তামিল রচনায়ও চোল রাজ্যের নৌ-বাণিজ্য বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

চোল রাজ্যের প্রথম যে রাজা সম্পর্কে জানা গেছে তাঁর নাম কারিবেল। সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে তিনি রাজত্ব করতেন। তিনি সিংহল জয় করেছিলেন বলে শোনা যায়। সিংহল থেকে শ্রমিক এনে তাদের সাহায্যে তিনি কাবেরী নদীর তীরে একটি বাঁধ এবং কাবেরী পত্তনম নামের নগর নির্মাণ করেছিলেন।

খ্রিস্টীয় তিনের শতক থেকে আটের শতক পর্যন্ত চোল রাজ্য পল্লবদের অধীনে চলে গিয়েছিল। নয়ের শতকে বিজয়ালয় নামক চোলদের একজন রাজা চোল রাজ্যকে পুনরায় স্বাধীন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র আদিত্য চোল রাজ্যকে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন করেন। আদিত্যের পুত্র প্রথম পরান্তক ৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় থেকে চোল রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা গেছে।

প্রথম পরান্তক বড় যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী মাদুরা অধিকার করেন। তিনি সিংহল রাজ্যও আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী রাজারা দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন। কিছুকাল পরে ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজরাজ নামের একজন প্রতাপশালী রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাজরাজ ছিলেন চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ৯৮৫ থেকে ১০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি চের ও পাণ্ড্য রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। নিজস্ব নৌবাহিনীর সাহায্যে তিনি

www.pathagar.com

সিংহলের একাংশ, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি জয় করেছিলেন। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি কর্মে তাঁর অনুরাগ ছিল। তাঁর আমলে নির্মিত তাঞ্জোরের বিখ্যাত শিবমন্দির তাঁর স্থাপত্য প্রীতির নিদর্শনরূপে বিরাজ করছে। রাজরাজ শিবের উপাসক ছিলেন কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি তিনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতেন।

রাজরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোলদেব ১০১২ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ব দিকের সমুদ্রে বিশাল নৌবাহিনী প্রেরণ করে তিনি বর্মার পেগু এবং ভারত মহাসাগরের আন্দামান, নিকোবর প্রভৃতি দ্বীপ অধিকার করেছিলেন। বাংলার পাল বংশের রাজা প্রথম মহীপালকে রাজেন্দ্র চোলদেব যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজাধিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করে চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি চালুক্যদের রাজা সোমেশ্বরের নিকট পরাজিত হন ও প্রাণ হারান। তাঁর পর অধিরাজেন্দ্র চোলদের রাজা হন। তাঁর অত্যাচারমূলক শাসনে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। অধিরাজেন্দ্র ছিলেন শৈব ধর্মে বিশ্বাসী। তাঁর আমলে বৈষ্ণব দর্শনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত চোল রাজ্যের শ্রীরঙ্গম অঞ্চলে বাস করতেন। কিন্তু পরমত অসহিষ্ণু অধিরাজেন্দ্রের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে রামানুজ চোল রাজ্য ত্যাগ করে মহীশূর রাজ্যে গমন করেন।

অধিরাজেন্দ্রের পরবর্তী রাজারা দুর্বলচেতা ছিলেন। ১৩১০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সুলতানের সেনাপতি ও প্রতিনিধি মালিক কাফুর চোল রাজ্যের বিলোপ সাধন করেন।

চোল রাজ্যে উত্তম শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সমগ্র চোল রাজ্য ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলি ক্রমান্বয়ে বিভাগ, জেলা ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের শাসন পরিচালনা করত। প্রজারা জমির উৎপন্ন সম্পদের ছয় ভাগের একভাগ খাজনা হিসেবে দিত। কৃষিকাজের সহায়তা করার জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল।

চোল রাজারা দেশ জয়ের জন্য এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে বিশাল নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ, মালয় ও ইন্দোনেশিয়া এবং পশ্চিম দিকে মালদ্বীপ ও আফ্রিকা পর্যন্ত চোলদের বাণিজ্য ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছিল। ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য শিল্পেও চোলরা বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিল।

পাণ্ড্য রাজাদের ইতিহাস

হিউয়েন সাঙ, যখন দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন তখন পাণ্ডরাজ্য সম্ভবত পল্লব রাজাদের অধীনে ছিল। তারপর পাণ্ড্য রাজা গণ পল্লব, চোল এবং সিংহল রাজ্যের সাথে বার বার যুদ্ধ করেছেন। এগার ও বার শতকে পাণ্ড্যরাজ্য চোলশক্তির বশ্যতা স্বীকার করেছিল। তের শতকে পাণ্ড্যরাজ্য পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন হয়। তের শতকের শেষভাগে ইতালির পর্যটক মার্কো পোলো পাণ্ড্যরাজ্যে গিয়েছিলেন—একবার ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে, আরেকবার ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে। মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে জানা যায় পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী কায়াল একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ১৩১০ খ্রিস্টাব্দে যখন মালিক কাফুর তামিল শক্তির পতন ঘটান তখন পাণ্ড্যরাজ্যেরও পতন ঘটে।

চের রাজ্যের ইতিহাস

সম্রাট অশোকের আমলে চের বা কেরলপুত্র রাজ্য একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। মধ্যযুগে এ রাজ্যটি চোল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

www.pathagar.com

ভারতে মুসলিম শাসন

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পর থেকেই ইসলাম ধর্ম ও আরব তথা মুসলিম রাজশক্তি আরব দেশ থেকে চারদিকে বিস্তৃত হতে শুরু করে। খ্রিস্টীয় আটের শতকের শুরুতেই মুসলমানদের রাজ্য পশ্চিমে স্পেন থেকে শুরু করে পূর্বদিকে তৎকালীন ভারতের সিন্ধুদেশের নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ঐ সময়ে সিন্ধুদেশে রাজত্ব করছিলেন রাজা দাহির। তখন ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

হাজ্জাজ-এর নির্দেশে সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাশেম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুরাজ্য জয় করেন। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে মুসলিম অধিকার আর বেশি বিস্তার লাভ করতে পারেনি। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তখনও গুর্জর-প্রতিহার, চালুক্য প্রভৃতি শক্তিশালী রাজ্য বিদ্যমান ছিল।

সিন্ধুদেশে যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল আরবদের রাজত্ব। আরবদের এ বিজয় ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটালেও এ প্রক্রিয়ার আর বিকাশ ঘটেনি। ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধনে আরবরা সফল হয়নি। আসলে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্বের বিস্তার ঘটিয়েছিল পরবর্তীকালে তুর্কি মুসলমানরা। তুর্কিরা শুধুমাত্র ভারতীয় রাজাদের রাজ্য জয় করেই সন্তুষ্ট থাকেনি। বার শতকে তুর্কি বীর মোহাম্মদ ঘুরী সিন্ধু দেশের আরব রাজ্যগুলোকেও জয় করে নিয়েছিলেন।

ভারতে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারে আরবদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে আরবদের সিন্ধু জয়ের ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ ঘটনার দরুনই ভারতবর্ষ ও আরব জগতের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আরবদের মধ্যস্থতাতেই ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞান ইউরোপে গিয়ে পৌঁছেছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যেও এ সময় থেকেই ভারতীয় বণিকদের স্থানচ্যুত করে আরব বণিকরা ঐ স্থান অধিকার করেছিল।

গজনীর সুলতানদের ভারত আক্রমণ

আরবরা সিন্ধু জয় করার পর পৌনে তিন শ বছর পর্যন্ত ভারতে মুসলিম অধিকার আর বেশি বিস্তার লাভ করেনি। তারপর ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের গজনী রাজ্যের রাজা বা আমীর সবুক্তগীন উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যকে আক্রমণ করেন।

৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের গজনীতে আলপ্তিগীন নামে একজন তুর্কি মুসলমান যোদ্ধা একটি রাজ্য স্থাপন করেন। এ রাজ্য গজনী রাজ্য নামে পরিচিত হয়েছে। আলপ্তিগীন মারা যাওয়ার পর কয়েকজন গুরুত্বহীন সুলতান গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর গজনীর আমীর হন আলপ্তিগীনের জামাতা সবুক্তগীন। উত্তর পশ্চিম ভারতে তখন শাহি বংশের রাজা জয়পাল রাজত্ব করতেন। জয়পালের রাজ্য আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সবুক্তগীন জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন এবং যুদ্ধবন্দী নিয়ে গজনীতে ফিরে যান। ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে সবুক্তগীন আবার জয়পালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। জয়পাল শাহি রাজ্যের যে অংশ আফগানিস্তানে অবস্থিত ছিল তা সবুক্তগীনকে প্রদান করেন। ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সবুক্তগীনের মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

সুলতান মাহমুদ

সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজেকে আমীরের পরিবর্তে স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা করেন। এর আগে পর্যন্ত গজনীর আমীররা নিজেদেরকে সামানিদ বংশের সম্রাটদের অনুগত আমীর বলে ঘোষণা করতেন। সুলতান মাহমুদ বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। কথিত আছে যে ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুলতান মাহমুদ মোট সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন।

১০০০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন ও প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। ঐ বছরই আবার জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করেন। পরে প্রভূত পরিমাণ মুক্তিপণ নিয়ে জয়পালকে মুক্তি প্রদান করা হয়। ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় অভিযানে তিনি 'ভীর' নামক শহর জয় করেন। চতুর্থ অভিযানে তিনি মুলতান জয় করার উদ্যোগ নেন। মুলতানের রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এ সময় কাশগড়ের রাজা গজনী আক্রমণ করলে সুলতান মাহমুদ দ্রুত গজনীতে ফিরে গিয়ে তাঁকে পরাজিত করেন।

১০০৮ সালে সুলতান মাহমুদ আবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এবার তিনি পাঞ্জাব অঞ্চলের আনন্দপালের রাজ্য আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে সুলতান মাহমুদের প্রচুর সৈন্য প্রাণ হারায় কিন্তু আকস্মিকভাবে তিনি জয়লাভে সমর্থ হন। যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি কাংড়া দুর্গ অধিকার করেন এবং সেখানে বহুযুগ ধরে সঞ্চিত প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লুণ্ঠন করে গজনী নিয়ে যান। কথিত আছে, কাংড়া দুর্গ থেকে সুলতান মাহমুদ সাত লক্ষ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা), সাতশ মণ সোনা ও রুপার পাত, দুইশ মণ সোনা, কুড়ি মণ মণিমুক্তা নিয়ে গিয়েছিলেন।

দশম অভিযানে (১০১৪ খৃঃ) সুলতান মাহমুদ থানেশ্বর আক্রমণ করে সেখানকার মন্দিরের ধনরত্ন নিয়ে যান। ১২তম অভিযানে (১০১৮ খৃঃ) তিনি কনৌজ ও মথুরার ধন-সম্পদ নিয়ে যান। মথুরার দশ হাজার ছোটবড় মন্দিরের ধনরত্ন তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৬তম অভিয়ানে (১০২৫-২৬ খৃঃ) সুলতান মাহমুদ বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করে দুইকোটি স্বর্ণ-মুদ্রা এবং প্রচুর পরিমাণ মণিমুক্তা নিয়ে যান। তাঁর ১৭তম তথা শেষ ভারত অভিযানে (১০২৭ খৃঃ) তিনি জাঠদের পরাজিত করেন। তারপর ফিরে গিয়ে গজনীতে অবস্থান করেন। তিন বছর পর ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুসলমানদের ভারত জয়

ঘুর বংশ

ভারতে তুর্কি শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন ঘুর বংশীয় শাসক মোহাম্মদ ঘুরী। গজনী ও হিরাটের মাঝামাঝি স্থানে ঘুর রাজ্য অবস্থিত ছিল। সুলতান মাহমুদ বারবার ভারত আক্রমণ করে যে পরিমাণ ধনরত্ন নিয়ে প্রস্থান করেন তা দেখে পরবর্তী আফগান রাজা বা গজনীর রাজারা যে ভারতবর্ষ দখল করাকে বিশেষ লোভনীয় কাজ বলে বিবেচনা করবেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

www.pathagar.com

১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে গজনী ঘুর বংশের শাসনাধীনে আসে। ঘুরের সুলতান গিয়াসউদ্দিন মোহাম্মদ তাঁর ভাই মুইজদ্দিন মোহাম্মদ বিন সাম বা মোহাম্মদ ঘুরীকে গজনীর শাসক নিযুক্ত করেন। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি যে প্রতিবারেই জয়লাভ করেছেন তা নয়। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুলতানের ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের দমন করেন। কিন্তু দুইবছর পর গুজরাট আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি রাজা ভীমের হাতে পরাজিত হন। ১১৯০ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে রাজপুত রাজা পৃথ্বিরাজের নিকট পরাজিত হন। পৃথ্বিরাজের সাথে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন অন্যান্য হিন্দু রাজাগণ। অবশ্য জয়চাঁদ নামে অন্য এক শক্তিমান রাজপুত রাজা ব্যক্তিগত শত্রুতার দরুন পৃথ্বিরাজের দলে যোগ দেন নি।

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরী পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন! পৃথ্বিরাজ নিহত হন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ যুদ্ধে ভারতবর্ষের স্থানীয় রাজারা পরাজিত হওয়ার ফলে নবাগত মুসলমান বিজয়ীদের অধিকার প্রায় দিল্লীর নিকট পর্যন্ত প্রসারিত হল। উত্তর পশ্চিম ভারতের বহু সুরক্ষিত দুর্গ মোহাম্মদ ঘুরীর হস্তগত হল। আজমীর রাজ্য ঘুরীর বশ্যতা স্বীকার করল। অতঃপর মোহাম্মদ ঘুরী কুতুবউদ্দিন নামক তাঁর এক অনুচরকে ভারতের বিজিত অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে স্বয়ং নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিন দিল্লী জয় করলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে গোয়ালিয়ার, কনৌজ প্রভৃতি দখল করে তিনি মুসলিম অধিকৃত রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করলেন। কুতুবউদ্দিন তাঁর এক অনুচর ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজিকে বিহার ও বাংলা জয় করার জন্য পাঠালেন।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ঘুর-এর সুলতান ও মোহাম্মদ ঘুরীর ভাই গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে মোহাম্মদ ঘুরী ঘুর গজনী ও দিল্লীর সুলতান হন। অল্পদিনের মধ্যেই মধ্য এশিয়ার খরিজম রাজ্যের শাহের নিকট মোহাম্মদ ঘুরী পরাজিত হন। সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ ঘুরীর ভারতীয় সাম্রাজ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিল। মোহাম্মদ ঘুরী তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষে এসে নিষ্ঠুর হাতে ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। পরের বছর, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে, ভারতবর্ষ থেকে নিজের মূল রাজধানীতে ফেরার পথে গুপ্ত ঘাতকের হাতে তিনি প্রাণ হারান।

ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সাথে সুলতান মাহমুদ এবং মোহাম্মদ ঘুরীর নাম যুক্ত রয়েছে। কিন্তু সুলতান মাহমুদ-এর তুলনায় মোহাম্মদ ঘুরীর খ্যাতির প্রসার ততখানি ঘটেনি! তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতে মুসলিম শাসনের স্থায়ী ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ ঘুরীর অবদানই বেশি।

www.pathagar.com

তুর্কো-আফগান সুলতানদের যুগ (১২০৬-১৫২৬ খৃঃ)

দাস বংশ (১২০৬-১২৯০ খৃঃ)

মোহাম্মদ ঘুরী জীবিত থাকতেই তাঁর অনুচর কুতুবউদ্দিন দিল্লী জয় করেছিলেন এ কথা আগেই বলা হয়েছে। মোহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর আফগানিস্তান ও ভারতে বিস্তৃত তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য তিনজন সেনাপতি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। একজন গজনী অঞ্চল করায়ত্ত করেন, অপর জন মুলতানের শাসনভার গ্রহণ করেন। আর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন কুতুবউদ্দিন। কুতুবউদ্দিন 'সুলতান' উপাধি ধারণ করে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন। এভাবেই দিল্লীর 'সুলতানী' শাসনের ইতিহাস শুরু হয়।এ সময়েই গজনীর তুর্কি শাসনের অধীনতা থেকে ভারতের মুসলিম অধিকৃত অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কুতুবউদ্দিন ও তাঁর পরবর্তী দুইজন সুলতান প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে এ আমলের অর্থাৎ ১২৯০ খৃঃ পর্যন্ত সময়ের সুলতানদের 'দাস বংশ' বলা হয়।

কুতুবউদ্দিন

কুতুবউদ্দিনের পুরো নাম কুতুবউদ্দিন আইবক। প্রথম জীবনে তিনি মোহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস ছিলেন। সেকালে অবশ্য অনেক ক্রীতদাসই যোগ্যতা প্রদর্শন করলে উচ্চ পদ ও মর্যাদার অধিকারী হতেন। দিল্লীকেন্দ্রিক সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ভারতের ইতিহাসে কুতুবউদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।

কুতুবউদ্দিনের পর আরাম শাহ (রাজত্বকাল ১২১০-১২১১ খৃঃ) দিল্লীর সুলতান হন। শোনা যায়, তিনি কুতুবউদ্দিনের পোষ্যপুত্র ছিলেন। কিন্তু আরামশাহ অযোগ্য শাসক ছিলেন। তাই দিল্লীর আমীররা কুতুবউদ্দিনের জামাতা ইলতুৎমিসকে দিল্লীর সুলতান করেন (১০১১খৃঃ)।

ইলতুৎমিস (রাজত্বকাল ১২১১-১২৩৬ খৃঃ)

শামসউদ্দিন ইলতুৎমিস জাতিতে তুর্কি ছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান। ইলতুৎমিস প্রতিভাশালী এবং রণনিপুণ শাসক ছিলেন। তাঁর আমলে মুলতান, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চল স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। মোহাম্মদ ঘুরীর যে উত্তরাধিকারী (তাজউদ্দিন ইলদিজ) গজনী অঞ্চলের শাসক হয়েছিলেন। তিনি ঘুরীর ভারতীয় সাম্রাজ্য জয় করার পরিকল্পনা করেন। এ সময়ে খারিজম্ বা খিবার শাহ্ গজনী অধিকার করলে তাজউদ্দিন ভারতবর্ষে আশ্রয় নেন এবং পাঞ্জাব ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করেন। ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস তাজউদ্দিনকে পরাজিত ও বন্দী করেন। এর ফলে গজনীর সাথে দিল্লীর সংযোগ ও সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ও চিরকালের জন্য ছিন্ন হল।

এদিকে খারিজম-এর শাহ্ জালালউদ্দিন নিজেই মঙ্গোল নেতা চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণের ফলে রাজ্যচ্যুত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। চেঙ্গিস খাঁ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে সিন্ধু পর্যন্ত চলে আসেন। বিপদ আশঙ্কা করে ইলতুৎমিস জালালউদ্দিনের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে আশ্রয়দান করতে অস্বীকার

www.pathagar.com

করলেন। তখন শাহ জালালউদ্দিন সিন্ধুদেশের বহু এলাকা ধ্বংস করে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ত্যাগ করে পারস্যে চলে যান। মঙ্গোলরাও তখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। এ ভাবে মঙ্গোল আক্রমণের হাত থেকে ভারতবর্ষ রক্ষা পেল।

ইলতুৎমিস সুলতান এবং বাংলাদেশে পুনরায় দিল্লীর কর্তৃত্ব আরোপ করেন। পূর্ববর্তী সুলতান আরাম শাহের আমলে গোয়ালিওর স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। ইলতুৎমিস ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিওরকে পুনরায় দিল্লীর শাসনাধীনে নিয়ে আসেন।

সুলতানা রাজিয়া

ইলতুৎমিসের পুত্ররা অকর্মণ্য ছিলেন বলে তিনি নিজের জীবিত কালেই কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করেছিলেন। ইলতুৎমিসের এ সিদ্ধান্তে বিচলিত হয়ে, স্ত্রীলোকের শাসন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, দিল্লীর অভিজাত শ্রেণী ইলতুৎমিসের মৃত্যু হওয়া মাত্র তাঁর পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসনে বসান। এ সুলতানের কুশাসনে সকলে অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে। তখন দিল্লীর অভিজাত শ্রেণী রুকন উদ্দিনকে অপসারিত করে রাজিয়াকে ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসান।

সুলতানা রাজিয়া অত্যন্ত দক্ষ শাসক ছিলেন। রাজিয়ার শক্তি, সাহস ও কূটকৌশলের সাহায্যে অনেকগুলি বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সকল অভিজাতগণ একযোগে বিদ্রোহ করার ফলে সুলতানা রাজিয়া পরাজিত হলেন। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ও তাঁর স্বামী দস্যুদের হাতে নিহত হন।

দিল্লীর সিংহাসনে সমগ্র মুসলমান শাসন কালে একমাত্র সুলতানা রাজিয়া ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করতে পারেননি। এদিক থেকে তিনি ছিলেন ভারতের ইতিহাসে এক বিরল ব্যতিক্রম। তৎকালীন সমাজের প্রতিকূল মনোভাবের জন্য সুলতানা রাজিয়া বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। কিন্তু ঐ অল্পকালের মধ্যেই তিনি সততা, ন্যায়বিচার ও দক্ষ শাসনের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পিতা ইলতুৎমিসের শাসনকার্যেও সাহায্য করতেন। সুলতানা রাজিয়া যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি পুরুষের পোশাক পরিধান করে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। সুলতানা রাজিয়া বিদ্বান ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

মুইজউদ্দিন বাহরাম ও আলাউদ্দিন মাহমুদ শাহ

সুলতানা রাজিয়ার পরে তাঁর ভাই মুইজউদ্দিন বাহরাম ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হন। দিল্লীর আমীররা তাঁকে সুলতান করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে মঙ্গোল বাহিনী ১২৪১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করে পাঞ্জাব অধিকার করে। ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী অভিজাতদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারপর সুলতান হন আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ (১২৪২ খৃঃ)। ইনি ছিলেন ইলতুৎমিসের পৌত্রের পুত্র। এঁর আমলে ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলরা পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল কিন্তু এবার তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করল।

আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ ক্রমে অত্যাচারী ও অকর্মণ্য শাসকে পরিণত হলে আমীরগণ তাঁকে সরিয়ে ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

নাসিরউদ্দিন মাহমুদ

নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ১২৪৬ থেকে ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু ও সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ফকির দরবেশের মতো জীবন যাপন করতেন। তিনি শাসনকার্যে অপারগ ছিলেন বলে তাঁর মন্ত্রী উলুঘ খাঁ ওরফে গিয়াসউদ্দিন বলবন দায়িত্ব পালন করতেন।

www.pathagar.com

গিয়াসউদ্দিন বলবন

নাসিরউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান হন। প্রথম জীবনে তিনি একজন ক্রীতদাস ছিলেন। নিজ যোগ্যতার বলে তিনি নাসিরউদ্দিনের মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি নাসিরউদ্দিনের সাথে নিজ কন্যার বিবাহ প্রদান করেছিলেন। এ কারণে তিনি সুলতান নাসিরউদ্দিনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবন সুলতান হয়ে এক বিশাল সামরিকবাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন নানা স্থানে দস্যুদের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল। গিয়াসউদ্দিন বলবন দৃঢ় হাতে এ সব দস্যুদলকে দমন ও নির্মূল করেন। ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলরা ভারত আক্রমণ করলে বলবনের দুই পুত্র মোহাম্মদ ও বুগরা খাঁ ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। ঐ সময়ে বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে বলবন তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে নিজের দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলরা পুনরায় ভারত আক্রমণ করলে তাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে বলবনের বড় ছেলে মোহাম্মদ নিহত হন। পুত্রশোকে অধীর হয়ে বলবন ঐ বছরই (১২৮৭ খৃঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

কায়কোবাদ : (রাজত্বকাল ১২৮৭-১২৯০ খৃঃ)

প্রকৃতপক্ষে কায়কোবাদ ইছিলেন দাসবংশের শেষ সুলতান, যদিও তারপর কায়কোবাদের শিশুপুত্রকে অল্পদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে বসান হয়েছিল। কায়কোবাদ ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবনের পৌত্র। বলবনের মৃত্যুর পর দিল্লীর আমীরগণ কায়কোবাদকে ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কায়কোবাদের পিতা এবং বলবনের একমাত্র জীবিত পুত্র বুগরা খাঁ তখন বাংলাদেশের শাসনকর্তা। পুত্র দিল্লীর সুলতান হলেও বুগরা খাঁ তাতে অসন্তোষ প্রকাশ বা তার বিরোধিতা করেননি।

কায়কোবাদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। শাসক হিসাবে তিনি নিতান্তই অক্ষম ছিলেন। ফলে তিনি অন্য এক আমীরের হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। কায়কোবাদের শাসনকালে মঙ্গোলগণ পাঞ্জাব আক্রমণ করলে সেনাপতি মালিক মোহাম্মদ বক্‌বক্‌ তাদের পরাজিত করেন।

কায়কোবাদের আমলে দিল্লীর রাজদরবারে ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা এত বেড়ে গিয়েছিল যে কায়কোবাদের পিতা পুত্রের অনাচার ও অক্ষমতায় বিরক্ত হয়ে দিল্লীর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হন। অবশ্য, মাঝপথে পিতাপুত্রের মিলন হল। কায়কোবাদ বাংলাকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে মেনে নিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই কায়কোবাদ অসুখে পঙ্গু হয়ে পড়েন। দিল্লীর অভিজাতরা তখন তাঁর শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসান। এ অবস্থায় সেনাপতি জালালউদ্দিন ফিরুজ খলজী কায়কোবাদকে গোপনে হত্যা করান। কায়কোবাদের শিশু পুত্রকেও তিনি হত্যা করেন। তারপর জালালউদ্দিন ফিরুজ খলজী ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। জালালউদ্দিন ফিরুজ খলজী দাস বংশের অবসান ঘটিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে খলজী বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

খলজী বংশ : (১২৯০-১৩২০ খৃঃ)

খলজীদের আদি পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির লোক। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে খলজী

www.pathagar.com

বংশ মূলত তুর্কি সম্প্রদায়ের লোক কিন্তু দীর্ঘদিন আফগানিস্তানে বাস করে তাঁরা আফগান বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন।

দাস বংশের সুলতান কায়কোবাদ এবং তাঁর শিশুপুত্র দাসবংশের শেষ সুলতান শামসউদ্দিন কাইয়ুমকে হত্যা করে সেনাপতি জালালউদ্দিন ফিরুজ খলজী ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এভাবে দিল্লীর সিংহাসন খলজী বংশের হাতে চলে যায়। জালালউদ্দিন খলজী প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হতে পারতেন, তবে মোটের উপর তিনি শান্তিপ্রিয় ও ধর্মভীরু ছিলেন। জালালউদ্দিনের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধ। ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল নেতা হালাকু খানের পৌত্র আবদুল্লা দেড় লক্ষ সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। জালালউদ্দিনের হাতে মঙ্গোলরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। পরে শান্তি স্থাপিত হলে চেঙ্গিস খাঁর এক পৌত্র উলঘু খান তাঁর অনুচরগণসহ ভারতবর্ষে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেন। জালালউদ্দিন তাঁদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং উলঘু খানের সাথে নিজ কন্যার বিবাহ প্রদান করেন।

১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে জালালউদ্দিন তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা গুরশাস্প্ তথা আলাউদ্দিন খলজীর হাতে নিহত হন।

তুঘলক বংশ : (১৩২০–১৪১৩ খৃঃ)

খলজী বংশের অবসানের ফলে দিল্লীর সুলতানী শাসন ব্যবস্থায় এক সঙ্কট দেখা দেয়। তখন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নামক পাঞ্জাবের এক আঞ্চলিক শাসক ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন বলে রাজ দরবারের অভিজাত ও ক্ষমতাশালী তুর্কি সম্প্রদায় তাঁকে সমর্থন করেছিল।

গিয়াসউদ্দিন ধর্মভীরু ও সরল ব্যক্তি ছিলেন। কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি সেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি রাস্তাঘাট থেকে চোর ডাকাতের উৎপাত বন্ধ করেন। সরকারি ডাক চলাচলের জন্য তিনি ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক ডাক হরকরার মাধ্যমে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। তিনি উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের একভাগ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করতেন। তিনি সামরিকবাহিনীকে সুসংগঠিত করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে তাঁর পুত্র জুনা খাঁ তথা মোহাম্মদ বিন তুঘলক দাক্ষিণাত্যের কাকতীয় বংশের রাজা দ্বিতীয় প্রতাপ রুদ্রদেবকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন। এ সময়ে মঙ্গোলরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে গিয়াসউদ্দিনের এক সেনাপতি মঙ্গোলদের পরাজিত করেন।

এসময়ে বাংলাদেশের শাসক পরিবারে তথা শামসউদ্দিন ফিরুজের পুত্রদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হলে, তাঁদের একাংশের আমন্ত্রণে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক স্বয়ং বাংলায় এসে বিরুদ্ধ দলকে পরাজিত করেন এবং নিজের পছন্দমত ব্যক্তিকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এভাবে বাংলাদেশ পুনরায় দিল্লীর শাসনাধীনে এসেছিল।

বাংলা থেকে দিল্লীতে ফেরার পথে, দিল্লীর নিকটে একটি সংবর্ধনা তোরণ ভেঙে পড়ায় গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু ঘটে (১৩২৫ খৃঃ)। শোনা যায়, গিয়াসউদ্দিনের পুত্র মোহাম্মদ বিন তুঘলকের ষড়যন্ত্রের ফলেই তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটেছিল।

মোহাম্মদ বিন তুঘলক (শাসনকাল ১৩২৫–১৩৫১ খৃঃ)

মোহাম্মদ বিন তুঘলক মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের একজন অনন্য সাধারণ সুলতান ছিলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কবিও গণিতবিদ ছিলেন। তিনি অসাধারণ মৌলিক প্রতিভা, প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং অটল সঙ্কল্পের অধিকারী ছিলেন। তিনি উদার প্রকৃতির এবং সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দয়ার সাগর ছিলেন বলে জানা যায়, আবার নিষ্ঠুর রূপেও তিনি চিত্রিত

www.pathagar.com

হয়েছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, শুধুমাত্র বিচক্ষণতার অভাবের দরুন তার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বিপুল জ্ঞানরাশি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। বস্তুত তিনি বহু অযৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সকলের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

মোহাম্মদ বিন তুঘলুক ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথমেই তিনি দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের কর বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। মাত্রাতিরিক্ত কর দিয়ে কৃষকরা নিঃস্ব হয়ে পড়ল, অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কর আদায়ের জন্য যথেষ্ট অত্যাচারও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।এক পর্যায়ে কৃষকরা বিদ্রোহ করে। তখন ভয়াবহ অত্যাচারের মাধ্যমে মোহাম্মদ বিন তুঘলকের কর্মচারীরা ঐ বিদ্রোহ দমন করেছিল।

১২২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি নগরে স্থানান্তরিত করলেন। দেবগিরির নতুন নাম দেওয়া হল দৌলতাবাদ। মঙ্গোলদের বিরামহীন আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই হয়তো রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তুঘলক একটা অদ্ভুত কাজ করেছিলেন। শুধু শাসনকার্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানান্তরিত করলেই যেখানে সহজেই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারত সেক্ষেত্রে তিনি নির্দেশ দিলেন যে দিল্লীর প্রতিটি ব্যক্তিকে দেবগিরি যেতে হবে। কিছুকাল পরেই অবশ্য তুঘলক আবার সব লোককে নিয়ে দিল্লী ফিরে এলেন। এ ধরনের কাজের জন্য তুঘলকের আমল উদ্ভট কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রবাদে স্থান পেয়েছে।

তুঘলকের শাসনকালে মঙ্গোল নেতা আলাউদ্দিন তরমাশিরীন খাঁ ভারত আক্রমণ করেছিলেন। তরমাশিরীন খাঁ সম্ভবত তুঘলকের সেনাবাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে ভারত ত্যাগ করেন। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে তুঘলক তাঁকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে বিদায় করেছিলেন।

মোহাম্মদ বিন তুঘলুক একবার খোরাসান, ইরাক,পারস্য প্রভৃতি অঞ্চল জয় করার উদ্দেশ্যে তিন লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠর করে এক বছর ধরে ঐ বাহিনীকে পোষণ করেন। পরে অবশ্য তিনি ঐ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। তুঘলুক হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কুর্মাচল প্রদেশ জয় করার জন্য অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ অভিযান সফল হয়নি।

মোহাম্মদ বিন তুঘলুক বিদেশ বিজয়ের বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে যেমন অর্থের অপচয় করেছিলেন, তেমনি শাসনকার্যে অপরিমিত অর্থ ব্যয় এবং মুক্ত হস্তে দান করে তিনি রাজকোষ শূন্য করে ফেলেছিলেন। অর্থের অভাব দূর করার জন্য তিনি চীন দেশের অনুকরণে নিজ রাজ্যে তামায় নোটের প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই জাল তামার নোটে বাজার ছেয়ে গেল এবং বিদেশী বণিকরা তামার নোট নিতে সম্মত হল না। তখন তুঘলক বাধ্য হয়ে সোনার মুদ্রার বিনিময়ে যাবতীয় তামার নোট বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিলেন।

মোহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসননীতি ছিল উদার এবং ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি স্বয়ং নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের প্রজার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতেন। বিচার বিষয়েও তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি স্বয়ংছিলেন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা। কাজীদের বিচার পদ্ধতির দিকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন।

মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে নানা স্থানে বিদ্রোহ ঘটেছিল। তিনি অনেকগুলি বিদ্রোহকে কঠোরভাবে দমন করেন। বাংলাদেশের সোনারগাঁওয়েও বিদ্রোহ ঘটেছিল। এরই পরিণতিতে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ নিজেকে লক্ষণাবতীর স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা করেন এবং সোনারগাঁওকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ বিদ্রোহ দমন করা তুঘলকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যায়ে সিন্ধুতে এক বিদ্রোহ দমন করতে গেলে সেখানে মোহাম্মদ বিন তুঘলক অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন (১৩৫১ খৃঃ)।

মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে সাময়িকভাবে সিংহাসন শূন্য হয়ে পড়ে। তখন রাজ দরবারের অভিজাতদের অনুরোধে মৃত সুলতানের চাচাতো ভাই ফিরুজ শাহ তুঘলক সুলতান হতে সম্মত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৬ বছর।

www.pathagar.com

দিল্লীর সুলতান হওয়ার পর ফিরুজ শাহ তুঘলক বাংলাদেশকে দিল্লীর শাসনাধীনে নেওয়ার জন্য সসৈন্যেবাংলা অভিমুখে রওনা হলেন। বাংলাদেশে ইতিপূর্বে মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলেই শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নিজেকে স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা করেছিলেন। দিল্লীর সুলতানের অভিযানের খবর পেয়ে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সুরক্ষিত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফিরুজ শাহ তুঘলক একডালা দুর্গ জয় করতে না পেয়ে তখনকার মত দিল্লী ফিরে যান। পরে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর ফিরুজ তুঘলক পুনরায় বাংলা জয় করার জন্য সৈন্য নিয়ে অভিযান চালালেন। বাংলার সুলতান তখন ইলিয়াস শাহের পুত্র সেকান্দার শাহ। আবারও বাংলার সুলতান দুর্গ এক ডালায় আশ্রয় নিলেন। ফিরুজ তুঘলক দীর্ঘকাল একডালা দুর্গ অবরোধ করে রইলেন। শেষ পর্যন্ত ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেকান্দার শাহের সাথে সন্ধি স্থাপন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন। এরপর প্রায় দুইশ বছর ধরে বাংলার সুলতান গণ স্বাধীনভাবে বাংলার রাজত্ব করেছিলেন।

ফিরুজ তুঘলক বাংলাদেশ অধিকার করতে না পারলেও বাংলাদেশ থেকে ফেরার পথে তিনি উড়িষ্যা জয় করে তাকে করদ রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের নগরকোট রাজ্য অধিকার করেন। ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের নগরকোট রাজ্য অধিকার করেন। ১৩৬১–৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিন্ধুদেশ জয় করেন। মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে সিন্ধুদেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। ফিরুজ শাহ তুঘলক তাকে আবার দিল্লীর অধিকারভুক্ত করেন। ফিরুজ শাহের আমলে গুজরাট, এটাবার প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ হয়। তিনি সে সকল বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফিরুজ শাহ তুঘলকের মৃত্যু হয়।

ফিরুজ শাহ তুঘলক শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে এবং কৃষি, শিল্প ও রাজস্বের ক্ষেত্রে নানা প্রকার সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি প্রাচীন অভিজাতদের পুনরায় ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। এতে সাময়িকভাবে সুফল পাওয়া গেলেও, নতুন ক্ষমতা পেয়ে অভিজাত জায়গিরদাররা কেন্দ্রীয় শাসনকে দুর্বল করে তুলেছিল। ফিরুজ তুঘলক আগের সুলতানরা প্রজাদের যে ঋণ দিয়েছিলেন তার দায় থেকে জনসাধারণকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর উপর প্রজাদের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফিরুজ শাহ কৃষির উন্নতির জন্য খাল খনন ও পানি সেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক নগর, হাসপাতাল, সরাইখানা ও প্রায় বার শ নতুন উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন। ফিরুজ শাহ ৩৬টি কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এসকল কারখানায় মানুষ ও পশুর খাদ্য এবং নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্মিত হত। এক একটি কারখানার দায়িত্ব এক একজন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল।

ফিরুজ শাহ বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তীদের আমলে সামান্য অপরাধে অঙ্গচ্ছেদ, মুণ্ডচ্ছেদ প্রভৃতি কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। তিনি বহু নিষ্ঠুর ও অবমানবিক শাস্তির বিধির বিলোপ সাধন করেন ও বিচার ব্যবস্থাকে মানবিক ও উদার করেছিলেন। দরিদ্রদের র জন্য তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ফিরুজ শাহ ক্রীতদাস খুব পছন্দ করতেন। তাঁর আমলে দিল্লীতে ক্রীতদাসের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর অধীনস্থ সামন্তরা সর্বদা তাঁকে ক্রীতদাস উপহার দিয়ে তার বিনিময়ে কৌশলে নানা প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতেন। ঐ আমলে দেশে প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার ক্রীতদাস ছিল।

ফিরুজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র (বড় ছেলে ফতা খাঁর পুত্র) গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করে তাঁর চাচাতো ভাই (ফিরুজতুঘলকের দ্বিতীয় পুত্র জাফর খাঁর ছেলে) আবু বকর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই আবু বকরকে অপসারিত করে তৃতীয় পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ সিংহাসন দখল করেন (১৩৯০ খৃঃ)। অসুস্থতার দরুন ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন সিকন্দর শাহ সুলতান হন। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে সিকন্দর শাহের মৃত্যু হয়। তখন মোহাম্মদ শাহের কনিষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই ছিলেন তুঘলক বংশের শেষ সুলতান। অবশ্য, দিল্লীর অভিজাতগণ নুসরত শাহ নামে ফিরুজ তুঘলকের অপর এক পৌত্রকে সুলতান বলে ঘোষণা করেছিলেন। এর ফলে কিছুকাল দিল্লীতে একই সাথে দুই সুলতানের শাসন চলেছিল।

www.pathagar.com

তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণ

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের আমলে যাযাবর নেতা তৈমুর লং ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (১৩৯৮ খৃঃ)। তৈমুর লং ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে সমরকন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। (১৩৯৮ খৃঃ)। তৈমুর লং ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে সমরকন্দে জন্মগ্রহণ। তেত্রিশ বছর বয়সেই তিনি চাঘতাই তুর্কীদের নেতা হন। অসাধারণ রণ-নৈপুণ্যের গুণে তিনি অল্পকালের মধ্যেই চারপাশের দেশগুলো জয় করেন। তারপর উত্তর ও পূর্ব দিকের দেশগুলোতে অভিযান চালান। ১৩৮১ থেকে ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি আফগানিস্তান জয় করেন ১৩৮৬–৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি আজারবাইজান ও পারস্য জয় করেন। ১৩৯১ থেকে ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চলের মঙ্গোলবাহিনীকে আক্রমণ করেন। অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার সাথে তৈমুর লং তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ সম্পন্ন করেন। মধ্য এশিয়া জয় করার পর তৈমুর ভারতের দিকে নজর দেন।

১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুরের পৌত্র পীর মোহাম্মদ ভারত আক্রমণ করে মুলতান দখল করেন। ঐ বছরই তৈমুর লং এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করেন এবং সিন্ধু, ঝিলাম প্রভৃতি নদী অতিক্রম করে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। পথে যত শহর ও গ্রাম পড়ল সব কিছু ধ্বংস করতে করতে তৈমুর দিল্লীর নিকটে এসে পৌছান। দিল্লীর প্রবেশ মুখেই তিনি একলক্ষ মানুষকে হত্যা করেন। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ তৈমুরকে নামমাত্র বাধা প্রদান করে গুজরাটে পলায়ন করেন দিল্লীকে প্রবেশ করে তৈমুর লক্ষ লক্ষ নাগরিকের প্রাণনাশ করেন। কয়েকদিন ধরে ঐ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চলেছিল তারপর দিল্লী ও অন্যান্য স্থান থেকে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে এবং অসংখ্য বন্দী সংগ্রহ করে তৈমুর নিজের রাজধানী সমরখন্দে ফিরে যান। তৈমুরের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের ফলে ভারতবর্ষে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। তৈমুর এর পরেও পশ্চিম এশিয়ায় তুরস্ক, জর্জিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান ও লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে যান। ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়েছিল। তৈমুরের এক বংশধর বাবর আরো সোয়া দুইশ বছর পরে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

তৈমুর লং ভারত ত্যাগ করার পর পূর্বোক্ত নুসরত শাহ ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি দিল্লী ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন পলাতক সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তুঘলক বংশের অবসান ঘটে।

সুলতান নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর ফলে শুধু যে তুঘলক বংশের শাসনের অবসান ঘটল তাই নয়, একই সাথে ভারতে দুই শতাধিক বছর স্থায়ী কেন্দ্রীয় তুর্কি শাসনেরও অবসান ঘটল। নাসিরউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর ঐ মুহূর্তে আর কেউ সুলতান হননি। কেবল, দৌলত খাঁ নামক এক ব্যক্তি ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে অভিজাতদের নেতা হিসাবে দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পর বৎসর ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং-এর ভারতীয় শাসনকর্তা খিজির খাঁ দিল্লী আক্রমণ করেন। খিজির খাঁ ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে এক নতুন সুলতানী বংশ স্থাপন করেন। এ নতুন রাজবংশের নাম দেওয়া হয়েছে সৈয়দ বংশ। দিল্লীর সিংহাসনে সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে দুই শতাধিক বছর স্থায়ী (১২০৬ থেকে ১৪১৪ খৃঃ) তুর্কি সুলতানের শাসনের সমাপ্তি ঘটল। আগেই বলা হয়েছে, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরীর ভারতস্থ প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লীতে সুলতানী রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। ঐ সময় থেকে যে তিনটি রাজবংশ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শাসন কায়েম রেখেছিলেন (যথা, দাসবংশ, খলজী

www.pathagar.com

বংশ ও তুঘলুক বংশ) তাদের প্রত্যেকটি ছিল তুর্কি বংশোদ্ভুত। কিন্তু সৈয়দ বংশের সুলতানরা নিজেদের সৈয়দ তথা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বংশোদ্ভূত বলে দাবি করতেন। সৈয়দ বংশের শাসন বিলুপ্ত হওয়ার পর দিল্লীতে আফগান বংশোদ্ভুত লোদী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই বলা হয় যে তুঘলক বংশের অবসানের সাথে সাথে দিল্লীকেন্দ্রিক তুর্কি শাসনের অবসান ঘটেছিল।

সৈয়দ বংশ (১৪১৪–১৪৫০ খৃঃ)

খিজির খাঁ ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'সৈয়দ বংশ' নামে পরিচিত কারণ তিনি নিজেকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বংশোদ্ভুত বলে দাবী করতেন।

কিন্তু এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত হতে পারেননি। খিজির খাঁ নিজেকে তৈমুর লং-এর ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা বলে পরিচয় দিতেন। খিজির খাঁ মাত্র সাত বছর (১৪১৪-১৪২১ খৃঃ) রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর আমলে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য দিল্লীর নিকটবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে সীমিত ছিল।

খিজির খাঁর মৃত্যুর পর মোবারক শাহ ১৪২১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজদরবারের অভিজাতদের চক্রান্তের শিকার হয়ে মোবারক শাহ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাণ হারান। এরপর অভিজাত সম্প্রদায় খিজির খাঁর পৌত্র মোহাম্মদ শাহকে সিংহাসনে বসান।

মোহাম্মদ শাহ ১৪৩৪ থেকে ১৪৪৫ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ফলে দিল্লীর অভিজাতবর্গ তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন। মালবের শাসনকর্তা তখন দিল্লী অধিকার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখন লাহোরের শাসনকর্তা বজলুল খান লোদী দিল্লীর সুলতানকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু তারপর তিনি নিজেই দিল্লীর শাসনভার অধিকার করার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ শাহের মৃত্যু ঘটলে তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন আলম শাহকে দিল্লীর অভিজাতরা সিংহাসনে বসান।

আলাউদ্দিন আলম শাহ অযোগ্য সুলতান ছিলেন। তিনি অল্পকাল অর্থাৎ ১৪৪৫ থেকে ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর বহলুল খান লোদীর হাতে সিংহাসনের ভার অর্পণ করে দিল্লী ত্যাগ করেন। এভাবে দিল্লীর সৈয়দ বংশের অবসান ঘটল। এরপর দিল্লীর সুলতানী শাসন আফগান লোদীবংশের করায়ত্ত হল।

লোদীবংশ (১৪৫১–১৫২৬ খৃঃ)

বহলুল খাঁ লোদী ছিলেন লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন আফগান জাতির লোদী থেকে উদ্ভুত। বহলুল লোদী যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন দিল্লীর সুলতানদের ক্ষমতা ও রাজত্বের পরিধি দুইই যথেষ্ট পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়েছে। বহলুল লোদীর চেষ্টায় দিল্লীর সুলতানী শাসনের শক্তি ও মর্যাদা কিছুটা ফিরে এসেছিল। বহলুল লোদী ১৪৫১ থেকে ১৪৮৯ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

বহলুল খাঁ লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ লোদী সুলতান হন। তিনি তিরহুত বিহার জয় করে সুলতানী রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেন। বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সাথে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। সিকান্দার শাহ১৪৮৯ থেকে ১৫১৭ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭–১৫২৬ খৃঃ)

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার শাহ লোদীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ইব্রাহিম লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইব্রাহিম লোদী অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করলে অনেকেই তাঁর প্রতি বিরূপ

www.pathagar.com

হয়ে ওঠেন। ইব্রাহিম লোদীর দুই আত্মীয়কে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করার উদ্দেশ্যে কাবুলের আমীর বাবর-এর নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। বাবর ছিলেন তৈমুর লং-এর বংশধর। মায়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন চেঙ্গিস খানের উত্তর পুরুষ। ভারতবর্ষ আক্রমণের সুযোগ তিনি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করলেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর নিকটে পানিপথের প্রান্তরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত করেন। এ যুদ্ধ ইতিহাসে 'পানিপথের প্রথম যুদ্ধ' নামে খ্যাত হয়েছে। ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় এবং বাবরের বিজয়ের মাধ্যমে দিল্লীর তিন শতাধিক বছর স্থায়ী সুলতানী শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটল এবং ভারতে মোগল শাসনের সূত্রপাত ঘটল (১৫২৬ খৃঃ)।

ভারতবর্ষে মোগল শাসন (১৫২৬-১৮৫৮ খৃঃ)

সন তারিখের হিসাবে ভারতবর্ষে ১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল শাসন বজায় ছিল। ভারতের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মোগল যুগকে (১৫২৬-১৮৫৮ খৃঃ) মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন। কিন্তু ইউরোপে তখন ধনতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটেছে। মোগল যুগেই ভারতবর্ষে পর্তুগিজ, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিসমূহ উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করেছিল। তাই বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ—এ সময়কালটা আধুনিক যুগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। বিশ্ব ইতিহাসের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা সুবিধাজনক বলে,মোগল যুগের বিস্তৃত ইতিহাস আমরা 'মানুষের ইতিহাস : আধুনিক যুগ' গ্রন্থে বিবৃত করতে চাই। তবে, পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করার মানসে বর্তমান খণ্ডে সংক্ষেপে ভারতে মোগল যুগের ইতিহাস বিবৃত হল।

বাবর

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবর। বাবরকে মঙ্গোল বা মোগল রূপে গন্য করা হলেও তাঁর দেহে তুর্কি রক্তেরই আধিক্য ছিল এবং তিনি তুর্কি ভাষাতেই কথা বলতেন।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে বাবর দিল্লী ও আগ্রা শহর দুটি অধিকার করেন। এ দুটি নগরই পরে মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে বাবর শক্তিশালী রাজপুতদের পরাজিত করে উত্তর ভারতে মোগল শাসনের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবর যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে উত্তর আফগানিস্থান থেকে পূর্বে বাংলার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

হুমায়ূন

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ূন সম্রাট হন। কিন্তু ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঠান বীর শের শাহ হুমায়ূনকে বিতাড়িত করে নিজে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতিভাবান সম্রাট শের শাহ অল্পকালের মধ্যে উত্তর ভারতে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন কিন্তু ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে এক দুর্ঘটনায় শের শাহের অকালমৃত্যু ঘটে। এরপর কিছুকাল পর্যন্ত শের শাহের উত্তরাধিকারীরা দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হন। তারপর হুমায়ূন ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিকার করেন। এতকাল তিনি আফগানিস্তানে ছিলেন।

www.pathagar.com

আকবর

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে এক দুর্ঘটনায় হুমায়ূনের মৃত্যু ঘটে। তখন তাঁর পুত্র আকবর মাত্র ১৩ বছর বয়সে দিল্লীর সম্রাট হন। আকবরের অভিভাবক রূপে বৈরাম খাঁ শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর ও বৈরাম খাঁ মিলিতভাবে পাঠান সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করেন। এরপর দিল্লীর সিংহাসনে মোগলদের স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করে মোগল সাম্রাজ্যের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন।

সম্রাট আকবর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সমগ্র উত্তর ভারত ও মধ্যভারতে মোগল আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন এবং দক্ষিণ ভারতের দিকেও অগ্রসর হন। সম্রাট আকবর প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি সাম্রাজ্যের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন। আকবরের আমলে বাংলায় মোগলদের আংশিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

জাহাঙ্গীর

আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর দিল্লির সম্রাট হন। তিনি ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেই সারা বাংলায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শাহজাহান

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহজাহান ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হন। তিনি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর পত্নী সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগমের কবরের উপর যে অপূর্ব স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন তা 'তাজমহল' নামে এখনও সারা বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত হয়ে আছে। শাহজাহান মৃত্যুর পূর্বেই ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের মৃত্যু হয়েছিল। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে বার্নিয়ার, টেভার্নিয়ার, পিটার মান্ডি, মানুচ্চি প্রমুখ ইউরোপীয় পর্যটক ও বণিক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সম্রাট শাহজাহানই প্রথম ইংরেজদেরকে একটি বাণিজ্যিক কুঠি নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কুঠিকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

আওরঙ্গজেব

আওরঙ্গজেব ছিলেন শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র। কিন্তু তিনিই ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র বাহাদুর শাহ ছিলেন শেষ পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট—তিনি ১৭০৭ থেকে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ১৭৫০ সালের মধ্যেই মোগল শক্তির পতন ঘটেছিল।

ব্রিটিশদের আগমন ও মোগল শাসনের অবসান

ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ ব্রিটিশ 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'কে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করার সনদ প্রদান করেছিলেন। ইংরেজরা ভারতবর্ষের বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করেছিল। আঠার শতকে যখন মোগল শাসন ভেঙে পড়ে তখন ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের কোম্পানিগুলো ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারের জন্য লড়াই শুরু করে। এ লড়াইয়ে ইংরেজরা ফরাসিদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বাংলার

www.pathagar.com

শাসন ক্ষমতাও দখল করে। ক্রমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি রূপে কাজ করতে থাকে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে। তখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই হয়ে দাঁড়ায় ভারতবর্ষের শাসক। অবশেষে ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক মহাবিপ্লব দেখা দেয়। এ বিপ্লবের শুরু হয়েছিল ইংরেজ সেনা বাহিনীর অন্তর্গত ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহের মাধ্যমে কিন্তু ক্রমে ঐ বিপ্লবে সারা ভারতের জনগণ অংশ গ্রহণ করেছিল। এ বিপ্লব '১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ' বা '১৮৫৭-র ভারতীয় মহাবিপ্লব' নামে খ্যাত হয়েছে। ইংরেজরা এ বিপ্লব দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। এ বিপ্লব দমিত হওয়ার পর ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটে এবং ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা হয়। ইংরেজ শাসকরা শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুরশাহ্কে বর্মায় নির্বাসিত করেছিলেন। বর্মাতে নির্বাসিত অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। ১৮৫৭ সালে রানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী হওয়ার ফলে এদেশে 'কোম্পানির রাজত্ব' অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের অবসান ঘটে এবং ভারতবর্ষে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হয়।

অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন

আমরা পূর্বেই দেখেছি একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে এশিয়ামাইনর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিরাট অংশে সেলজুক তুর্কি সুলতানদের অধীনে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। কিন্তু ক্রুসেডের পরে এই সাম্রাজ্য কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তুর্কি আমীর বা স্থানীয় শাসনকর্তারাই এক-একটি রাজ্যের প্রভু রূপে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এরকম একজন আমীর ছিলেন আমীর তুঘরুল। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতেএশিয়া মাইনরের বিরাট অংশে নিজের রাজ্য গড়ে তোলেন। আমীর তুঘরুলের মৃত্যুর পর (১২৮৮) তাঁর ছেলে ওসমান তাঁর অধীনস্থ তুর্কিদের একটি শক্তিশালী সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেন। ওসমানের নামে এই নতুন তুর্কিজাতি অটোমান তুর্কি (ওসমান Osman-ওস্মান, Othman—অটোমান তুর্কি OttomanTurks) নামে পরিচিত হল।

একটি সুসংঘবদ্ধ দুধর্ষ সেনাবাহিনীর অধিকর্তা ওসমান ক্রমশ উত্তর দিকে একের পর এক বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে তাঁর রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে চললেন। তৎকালীন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দুর্বল শাসকগণ এ অভিযান প্রতিহত করতে শুধু অক্ষমই হলেন না, সার্বিয়াও বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কখনও কখনও তারা অটোমান তুর্কিদের শরণাপন্ন হলেন। ফলে নিজেরাই তাঁরা এক অর্থে তুর্কিদের নিজের রাজ্যে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিলেন এভাবে একে একে অটোমান তুর্কিরা বলকান উপদ্বীপের দেশগুলির দিকে হাত বাড়ান। প্রথমে বুলগেরিয়া দখল করা হল তারপরে এল সার্বিয়ার পালা। ১৩৮৯ সালে কসোভার যুদ্ধে সার্বিয়ার রাজা যুদ্ধে মারা যান। যুদ্ধ শিবিরে তুর্কির সুলতানও একজন আঁততায়ীর হাতে নিহত হন। কিন্তু সত্ত্বেও সার্বিয়া তুর্কিদের দখলে চলে গেল।

www.pathagar.com

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে অটোমান তুর্কিরা পূর্বদিকে পারস্যের সিরাজ নগরী পর্যন্ত অধিকার করে নেয় এবং উত্তর দিকে কনস্টান্টিনোপল ব্যতীত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রায় পুরো অংশ হস্তগত করে। এখন তাদের অভিযান চলল কনস্টান্টিনোপল দখল করার উদ্দেশ্যে। এদিকে পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরীর রাজ্য সিগিসমুন্ড তুর্কিদের ভয়ে ভীত হয়ে সকল খ্রিস্টান রাজাদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।

রোমের পোপের নেতৃত্বে নতুন করে ক্রুসেডের অভিযান শুরু হল মুসলিম তুর্কিদের বিরুদ্ধে। এক বিশাল সেনাবাহিনী চলল দানিয়ুব নদীর তীর ধরে নিকোপলিস অভিমুখে। পথে যত গ্রাম ও জনপদ পড়ল সবগুলো তারা ধ্বংস করতে করতে অগ্রসর হল।

নিকোপলিস এর চার মাইল দক্ষিণে দুটি বিবদমান সেনাবাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হল। যুদ্ধে খ্রিস্টানদের মিলিত বাহিনী তুর্কিদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তুর্কি সুলতান বায়েজিদের ইচ্ছা ছিল আরও অগ্রসর হয়ে জার্মানি ও ইতালি দখল করার। তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাটকে নির্দেশ দিলেন কনস্টান্টিনোপল ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করার পূর্বেই তাঁকে যেতে হল পূর্বদিকে তৈমুর লঙের সৈন্যবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য। এঙ্গোরার যুদ্ধে বায়েজিদের সেনা বাহিনী মঙ্গোলদের হাতে পরাজিত হল। সুলতান নিজেও মঙ্গোলদের হাতে বন্দী এবং পরে নিহত হন।

সাময়িকভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের অগ্রাভিযানে বাধা পড়ল। অধীনস্থ আমীরদের বিদ্রোহের ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু অচিরেই এই বিপদ কাটিয়ে উঠল অটোমান তুর্কিরা। ১৪৪৪ সালে দ্বিতীয় বার হাঙ্গেরির রাজা হাঙ্গেরীয়, পোল, বুলগেরীয় ও সার্বীয়দের নিয়ে একটি সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তুললেন তুর্কিদের বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। জেনোয়া ও ভেনিসের বণিকদল এবং স্বয়ং পোপও অভিযানে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন। ভার্নার যুদ্ধে তুর্কি সেনাবাহিনী সম্মিলিত ইউরোপীয়বাহিনীকে পরাজিত করল। এর চার বছর পরে কসোভার দ্বিতীয় যুদ্ধে খ্রিস্টানবাহিনী তুর্কিবাহিনীর হাতে পুনরায় পরাজিত হল।

অবশেষে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কনস্টান্টিনোপাল নগরী অবরোধ করলেন। দুর্বল বাইজেন্টাইন সম্রাট মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি করলেন। জেনোয়া ও ভেনিসের বনিকগণ এবং পোপ কর্তৃক প্রেরিত একটি ক্ষুদ্র সেনাদল বাইজেন্টাইন বাহিনীর সাথে যোগ দিল খ্রিস্টান জগৎকে রক্ষা করার জন্য। তুর্কিদের ছিল এশিয়া ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোলন্দাজবাহিনী। দিনের পর দিন তারা কনস্টান্টিনোপলের দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা প্রাচীরের উপর গোলাবর্ষণ করে চলল। চতুর্দিক দিয়ে পরিবেষ্টিত কনস্টান্টিনোপলের সেনাবাহিনীর সংখ্যাও দিন দিন কমতে লাগল। অবশেষে অবরোধের ৫৩ দিন পরে বাইজেন্টাইন সম্রাট একাদশ কনস্টানটাইন (সর্বশেষ পূর্ব রোমান সম্রাট) ও তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বিজয়ী তুর্কিবাহিনী কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করল। তুর্কি সৈন্যরা তিন দিন ধরে কনস্টান্টিনোপল লুট ও ধ্বংস করল। প্রায় ৬০ হাজার নাগরিককে বন্দী করে ক্রীতদাস বানান হল। কনস্টান্টিনোপলের নতুন নামকরণ করা হল ইস্তাম্বুল। অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের রাজধানী হল এই ইস্তাম্বুল। এভাবে প্রায় এক হাজার বছর স্থায়ী প্রাচীন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের চির অবসান ঘটল।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের অবসান

ইউরোপের ইতিহাসে কনস্টান্টিনোপলের পতন একটি যুগান্তকারী ঘটনা রূপেই চিহ্নিত। এর দ্বারা শুধুমাত্র এশিয়ামাইনর ও বল্কান উপদ্বীপে খ্রিস্টানদের স্থলে মুসলিমদের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হল না, পরবর্তী দুই শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা জুড়ে তুর্কিদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার দরুন আরববণিকদের সাথে ইউরোপীয় বণিকদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। সেই সাথে বন্ধ হল ভারতবর্ষ, চীন ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে বিলাসবহুল পণ্য সম্ভারের আগমন। কিন্তু ইউরোপীয় সামন্ত প্রভু ও সদ্য অধিকার প্রাপ্ত দেশীয় রাজন্যবর্গের জন্য এসব বিলাসদ্রব্যের চাহিদা এত প্রবল ছিল যে প্রধানত সে জন্যই অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা বিপুল লাভের সম্ভাবনায় মরিয়া হয়ে উঠল প্রাচ্যের দেশগুলিতে গমনের নতুন জলপথ আবিষ্কারের সন্ধানে। ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের বণিকরা যারা এতদিন ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে ইতালীয় বণিকদের সমৃদ্ধি অবলোকন করত তাদের সামনে উপস্থিত হল বিশাল সুযোগ। আর সে সুযোগ সবচেয়ে বেশি পেল পর্তুগাল ও স্পেন। কারণ এরা ছিল আটলান্টিক মহাসাগরীয় দেশ। পুর্তগাল চেষ্টা করল আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষে আসার, স্পেন অভিযান করল পশ্চিম দিকে। উদ্দেশ্য একই—গোলাকার পৃথিবী পরিক্রমণ করে ভারতবর্ষ বা চীনে পৌছান। এভাবেই কলম্বাস একদিন আবিষ্কার করলেন নতুন মহাদেশ আমেরিকা। আর ভাস্কো ডা গামা পৌছে গেলেন ভারতবর্ষে নুতন আবিষ্কৃত জলপথ দিয়ে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক অভিযান ইউরোপের জনগণের এতকালের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দিয়ে প্রমাণ করল পৃথিবী তাদের ক্ষুদ্র ম্যানরেই আবদ্ধ নয়—পৃথিবী অনেক বড়। অন্য দিকে বিভিন্ন দেশ দখল করে সারা পৃথিবী থেকে ধনসম্পদ জড়ো করে ইউরোপ তার প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করল এবং ভবিষ্যতের ধনতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করল।

তুর্কি সেনাদের হাত থেকে যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি কোনরকমে প্রাণ নিয়ে কনস্টান্টিনোপল থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সাথে করে কোনো ধনসম্পদ আনতে পারেননি বটে, কিন্তু বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ কিছু গ্রিক রোমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন ইতালিতে। ইতালিতে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ। ইতালির শিক্ষিত জনগণকে এঁরাই পরিচিত করেছিলেন গ্রিক ও রোমান ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের সাথে। প্রধানত এঁদের চেষ্টাতেই সেখানে সৃষ্টি হয় জ্ঞানের জন্য এক বিপুল উদ্দীপনার। হাজার বছর পূর্বের হারিয়ে যাওয়া গ্রেকো রোমান ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য যে বিপুল উৎসাহের জোয়ারএসেছিল ইতালিতে তাকেই বলা হয় নব জাগরণ বা রেনেসাঁ। এ নব জাগরণ শুধু অতীতকে ফিরিয়ে আনা নয়, এ নব জাগরণ এক হাজার বছরের অন্ধকার সময়স্যাকে কাটিয়ে আলোয় উত্তরণ।

দান্তে, পেত্রার্ক, বোকাচিও'র সাহিত্য, রাফায়েল, দা ভিঞ্চি ও মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্পকলা এবং কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ভেসালিয়াস, হার্ভের আবিষ্কৃত নতুন বিজ্ঞান ইউরোপকে দেখিয়েছে নুতন পথ, নুতন আলো। সে আলোর পথ ধরেই এগিয়ে গেছে পৃথিবী, পদার্পণ করেছে নতুন যুগে। সে যুগ আধুনিক যুগ।

www.pathagar.com

মানবসমাজ এক ও অখণ্ড। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং মানব সমাজের ইতিহাসও অখণ্ড ও অবিভাজ্য।

আধুনিক মানবসমাজের উৎপত্তি হয়েছিল একটা মাত্র উৎস থেকে। আদিম শিকারী মানুষ যে সমাজ সংগঠন এবং বস্তুগত ও ভাবগত সংস্কৃতি সৃজন করেছিল তার অনেক উপাদান আজকের পৃথিবীর সব কটি জাতির ও সমাজের মূলভিত্তিরূপে কাজ করছে। মানব সমাজ অবিভাজ্য একথা যেমন সত্য, মানব সমাজ খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন এ কথাও সমান সত্য। পৃথিবীর সব মানুষ মূলত এক হলেও তারা বিভিন্ন দেশ ও জাতিসত্তার অন্তর্গত।

মানুষের ইতিহাস মূলত ভিন্ন ভিন্ন জাতির খণ্ডিত ইতিহাসের যোগসমষ্টি।

'মানুষের ইতিহাস' গ্রন্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস লিখিত হয়েছে। সাধারণভাবে যাকে পৃথিবীর ইতিহাস বা সভ্যতাবলীর ইতিহাস নামে অভিহিত করা হয়, এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাই।

মানুষের ইতিহাস বা মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস এমন একটা বিষয় যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে জানা বিশেষভাবে আবশ্যক। বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত জ্ঞান লাভের প্রয়োজনে মাত্র নয়, সমসাময়িক বিশ্বে নিজের এবং স্বদেশের অবস্থান জানার জন্য, স্বদেশ বা সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য মানুষের ইতিহাস অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

বাংলা ভাষায় রচিত এ গ্রন্থে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, সূত্রানুগ সহ তথ্য ও তত্ত্ব সর্বাধুনিক এবং আকর্ষণীয়। প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ ছাড়াও অজস্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে সহজবোধ্য ও সুশৃঙ্খলভাবে বর্তমান গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বক্তব্যকে স্পষ্ট ও দৃশ্যমান করে তোলার জন্য বহুসংখ্যক ছবি ও মানচিত্র এ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। বইয়ের ভাষা ও যুক্তি-বিশ্লেষণে প্রাঞ্জলতার কারণে এবং বইটির বিষয়বস্তুর বিচারে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট এবং সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত গ্রন্থাগারে বইটির অন্তর্ভুক্তির আবশ্যিকতা অপরিসীম।

প্রচ্ছদ আবদুল মুকতাদির

www.pathagar.com

www.pathagar.com